pdf By Syed Mostafa Sakib

জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)

(TEACHER OF THE UNIVERSE)
"MUHAMMAD"

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, বি. এস-সি. বি. সি. এস
(ইন্‌জিনিয়ারিং-টেলিকম্‌); টি, ই, এন্ড ডব্লু, এস, এ, বি, কে (টোকিও);
এ, ও, টি, এস, (জাপান); প্রেসিডেন্ট পুরস্কার-প্রাপ্ত,
'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে', 'বিজ্ঞান না কোরআন'
'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ' (দঃ), 'সিরিজ, রহস্যে
ভরা বিছমিল্লাহ, মানব জাতির মুক্তির পথ,
সর্ব ধর্মে বেহেশত দোজখ' প্রভৃতি
আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু
গ্রন্থের প্রণেতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মম প্রকাশ

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০০৭
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০০
প্রচ্ছদ ঃ রফিক উল্যাহ

মম প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে এ. জেড. এম. তৌহিদ কর্তৃক
প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস জীবন কম্পিউটারস ৩৮/২খ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য ১৩০ টাকা
ISBN : 984-8418-12-1

pdf By Syed Mostafa Sakib

উৎসর্গ

যাঁর প্রেমে আমি পাগল, যাঁর বাণীতে আমি
মুগ্ধ, যাঁর ইশারায় আমি চঞ্চল—সেই মহান
সৃষ্টি, সারা বিশ্বের কল্যাণ, জগতের আলো,
মানব জাতির পথ-প্রদর্শক, পয়গম্বরগণের-নেতা,
রাসুলে করিম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামেই
এ ক্ষুদ্র বইখানি উৎসর্গ করলাম।

নুরল ইসলাম
লেখক

মুনাজাত

হে আল্লাহ! এক দুর্গম পথে পা বাড়ালাম।
জানি না, এ পথ অতিক্রম করতে পারব কিনা।
তোমার প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জগদ্‌গুরুর
আসনে বসাবার এক অদ্ভুত বাসনা আমার
হৃদয়ে জাগল। জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই তবুও
বোকার মত ধরলাম এ কলম। তোমার কাছেই
সাহায্য চাই, তোমার কাছেই জ্ঞান চাই,
তোমার কাছেই লেখনী-শক্তি ও বৈজ্ঞানিক
কৌশল চাই। আমিন।

নু. ই. (লেখক)

ভাসে কার ছবি

আমার মনে আজ ভাসে কার ছবি?
সে যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী।
কুল মখ্‌লুক জুড়ে ধ্বনি উঠে কার?
আকাশে বাতাসে বাণী ছোটে কার?
সাহারার মরুভূমি কার পায়ে দিল চুমী
কার মাথে ছায়া দিতে মেঘে ঢাকে রবি?
সে যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী।
সত্যের বাণী নিয়ে হাতে
কে এল এই দুনিয়াতে
কার ডাকে জ্বিন ও ইনসান
সাড়া দিল সবই।
সে যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী।
আকাশের চাঁদ কার ইশারায়
খণ্ডিত হয়ে পড়িল ধরায়?
কার পরশে মুক্তি পেল
বিশ্বের যত পাপী?
সে যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী।
এতিম-দুঃখী, বাদশা-ফকির
অন্ধ-আতুর, অনাথ-বধির
কার আঁখিতে আপন ব'লে
রইল না কেউ বাকি?
সে যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর নবী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

অনন্ত এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন সুগভীর রহস্যঘন তেমনি অসীম অতলান্ত। কবি এ বিস্ময়কর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সত্যি বলেছেন ঃ

দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সিন্ধু হিন্দোলিছে এপার ওপার
নাই—নাই—নাই—কোথা পার।

এ পারের খবর তিনিই শুধু জানেন, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, জগতের সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুলআ'লামিন, দুর্জ্ঞেয় রহস্যঘেরা বিশাল মখলুকের সকল তত্ত্বের সন্ধান একমাত্র তাঁর কাছেই পরিজ্ঞাত। আর এই সৃষ্টিতত্ত্বের হয়ত বা সহস্র-সহস্রাংশের অণুকণারও সহস্র-শতাংশ উপলব্ধি করেন তাঁরা, যাঁরা বিশেষ অনুগৃহীত, অনুগত, শুদ্ধদিল সেবক। তাঁর এই লীলায়িত বিচিত্র বিপুল সৃষ্টিলোকের রহস্য-তোরণ তাঁদের কাছেই কিঞ্চিত উন্মোচিত হয়।

সৃষ্টির আদিম উষায় বিচ্ছুরিত আলোক ঝলমল যে রূপের ঐশ্বর্য বিচিত্র-জীবন সমারোহে জেগে উঠলো আর আদি পিতা হযরত আদম সফিউল্লা আলাইহে সালামের অন্তর্চেতনার উন্মেষ ঘটলো তা মহান আল্লাহ রাব্বুলআলামিনের মহান ইচ্ছা ও অনুরাগ রঞ্জিত নূরে মুহাম্মদী ভিন্ন আর কিছু নয়!

সেই নূরে মুহাম্মদীর তথা আল্লাহ-পাকের সুমহান বিজ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই বেহেশতের বাগানে সজ্জিত বিভিন্ন তরুশ্রেণীর নাম বলে দিয়ে ফেরেশতাদেরকে বিস্ময় বিমূঢ় করেছিলেন হযরত আদম সফিউল্লাহ।

সৃষ্টির সেই দূরাগত সুবেহ-সাদেক থেকে যাঁর এসমে মোবারক জরীয় হরফে লওহে-মহফুজে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাঁকে আলোকপ্রাপ্ত, অনুগৃহীত, মনোনীত ও পরম সম্মানিত করেছেন আল্লাহ-পাক স্বয়ং এবং পরবর্তীকালে সর্বমানুষের নবীরূপে প্রতিষ্ঠাকল্পে 'গারে হেরার' রুহুল কুদ্দুস হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফতে নিজ নূরে তাজাল্লীর অপরূপ আলোক-সম্পাতে সর্ব কলুষমুক্ত, সর্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় করে পবিত্র কাবাগৃহ থেকে বেহেশতি বোরাক সওয়ারে রহস্য রাজ্যের সিংহদ্বার দিয়ে উত্তীর্ণ ক'রে তাঁর অনন্ত সৃষ্টির কুদরতী রঙমহলার প্রতিটি কক্ষে বিচরণ করবার সৌভাগ্য দান করেছিলেন ও দোজাহানের সর্বস্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত করে সারা সৃষ্টির গুরুট্রেনিং দান সমাপ্ত করেছিলেন যাঁর—তিনি খোদ খোদাতায়ালার সবিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত মহানস্বত্ত্বা সাইয়েদুল কাওনাইন নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মুজতুবা (দঃ)। এই মহানবী সাইয়েদুল মুরছালিনকেই আমার একান্ত স্নেহ-ভাজন অনুজপ্রতিম বিজ্ঞানী মুহাম্মদ নুরল ইসলাম সাহেব 'জগদ্‌গুরু' আখ্যায় বিভূষিত করেছেন।

যুগে যুগে প্রেরিত জগতের সর্বকালের মহাপুরুষগণের তুলনামূলক আলোচনায় ও তাঁদের অমূল্য অভিমতের নিরিখে, বিচার বিশ্লেষণে, দুনিয়ার সকল ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা ও স্বীকৃতির আলোকে তিনি মহানবীকে 'জগদ্‌গুরুর' আসনে সমাসীন করেছেন। ইহা তাঁর এক শান্তিময় সুমহান আবিষ্কার, শাশ্বত সত্যের নয়া উদ্ভাবন। তাঁর এই মহাবিষ্কার ব্যক্তিজীবনের প্রকৌশলী জনাব নুরল ইসলাম সাহেবকে শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, মহাবিজ্ঞানীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চিরন্তন মহাসত্যেরই তিনি আবিষ্কারক।

যুগে যুগে যখন মোহান্ধ মানব বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে অজ্ঞতায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তখন তাদের আলোর পথ দেখাতে প্রয়োজন হয় এই মহান আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের। পাপবিদ্ধ নিখিল বেদনার্ত মানুষের অসহায় কান্নার রোল স্পর্শ করে এই সত্যসাধক আবিষ্কারকের সংবেদনশীল অন্তরাত্মা, আর বিশ্বমানবের মুক্তি সাধনায় উন্মুখ ক'রে তোলে তাঁকে। এই আত্মভোলা ধ্যানমগ্ন সাধকই যুগ সংস্কারক- 'খাইরুল উম্মতে রাসুল।'

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বময় এই সংগ্রাম-সংঘাতে বিধ্বস্ত জামানায় বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, কবি ও দার্শনিক নুরল ইসলাম সাহেব নিঃসন্দেহে অন্যতম ইসলামিক চিন্তাবিদ। সত্য আবিষ্কারের এই অন্তর্লীন সাধনায় তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, চির বিজয়ী, মহাসম্মানী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতা, ধর্মনেতা, জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক, মানব জীবন ও জগতের সর্বসাধনার সার্থক সাধক, সাইয়েদুল কাওনাইন ধ্যানগুরু, জ্ঞানগুরু, শুদ্ধদিল তাপসশ্রেষ্ঠ মাহবুবে রাব্বুল মাশরেকায়নে ওয়াল মাগরেবাইনে রাসুলে খোদা হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) 'জগদ্‌গুরুর' আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সাধনা তাঁর অমর, অক্ষয় ও জাতির জন্য চির গৌরবময় আবিষ্কার।

কি ভাবের প্রাঞ্জলতায়, ভাষার কারুশিল্পে, কি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও তথ্য পরিবেশনে, প্রাতঃস্মরণীয় বিভিন্ন মহামানব ও ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনায় সুসামঞ্জস্য, সুসংবদ্ধ ইসলামিক চিন্তাধারার বিন্যাসে, মহানবীর আদর্শায়িত জীবন ও চরিত্র চিত্রায়নে তিনি যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বের বুকে তা চিরভাস্বর ও চিরপ্রশংসনীয় হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্য ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় ইহা এক অনন্য সংযোজন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমি বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে 'জগদ্‌গুরু' গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি ও এই সত্য দীপ্ত সাধকের সুখদ-সার্থক দীর্ঘজীবন, অক্ষয় সাধনশক্তি বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ-পাকের কাছে প্রার্থনা করি।

লেখকের অনন্য অবদান 'বিজ্ঞান না কোরআন?' 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' "বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ' ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, 'ঝঙ্কার', 'তরঙ্গ', 'জাপানে যা দেখলাম'- গ্রন্থসমূহ জাতীয় জীবনের এক শান্তির সওগাত, প্রেরণার উৎস ও জ্ঞানের অনন্য উপকরণ। বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় ইতিমধ্যেই তা সারা বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অসত্যের মাথায় পদাঘাত করে চিরসত্যের যে বাণী তিনি প্রমাণ করে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছেন—তার স্বীকৃতি মেলে বিবিসি, লণ্ডন ও বিশ্বখবর থেকে।

এই মহাগ্রন্থের ভূমিকা লেখবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করছি। আর মহানবীর প্রেম-দিওয়ানা লেখকের আত্মার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে জগদ্‌গুরু রাসুলে করিম হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জ্ঞান ও দীক্ষা দীপ্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার উদগ্র বাসনা পোষণ করি। এর সাথে মহাবিচারের দিনে 'জগদ্‌গুরু' শেষ নবীর সাফায়তের আরজু নিয়ে শেষ করছি গৌরবময় এ গ্রন্থের অবতরণিকায় আমার অকিঞ্চিতকর আয়োজন।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার অব্যাহত হোক এদিক থেকে আমি মহামান্য বাংলাদেশ সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমিন। খোদা হাফেজ।

তারিখ-২১শে মে
ইং ১৯৮১ সন

মুহাম্মদ আবদুর রহমান আব্বাসী
কবিশেখর, কাব্যরত্ন, এম. এ. ডবল
(বাংলা-ইংরাজী), ডিপ-ইন-এড,
এল-এল-বি, প্রধান অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, সিরাজদ্দৌলা
সরকারি কলেজ, নাটোর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচনা

কে ছোট, কে বড়, কে জ্ঞানী, কে মহাজ্ঞানী, কে গুরু, কে গুরুর গুরু এ কথা বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু লিখতে বসেছি **'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'**। এটা আমার মনেরই একটা খেয়াল। এ খেয়ালের পিছনে কি রহস্য ছিল সেটা পাঠকবৃন্দের নিকট ব্যক্ত ক'রেই আসল বিষয়বস্তুতে হাত দিচ্ছি।

গত দু'বছর থেকে বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) বইটি লিখছিলাম। এর বিষয়-বস্তু সংগ্রহে হিমসিম খেয়ে উঠলাম। প্রয়োজনীয় উপাদান না পেয়ে শেষে কোরআন ও হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের মাঝেই আমাকে মনোনিবেশ করতে হলো। দেখলাম হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে—

"এবং আমি তোমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য দয়া ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।" [সূরা আম্বিয়া]

"তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত নহ।"

[সূরা রা'দ]

কোরআনের এরূপ বহু মূল্যবান বাণী ছাড়াও হাদিস তত্ত্বে দেখলাম রাসুল নিজেই তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর মহাবাণীতে—

"আমি সমস্ত বিশ্বজগতের নবীরূপে প্রেরিত ও মনোনীত হইয়াছি।" [তঃ হক্কানী]

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেক বিষয় আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইল এবং আমি উহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম।" [মিশকাত]

এরূপ অসংখ্য বাণীর মধ্যে আমি নিজকে হারিয়ে ফেললাম। মনে করলাম হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) শুধু বৈজ্ঞানিকরূপে আখ্যায়িত করলেই চলবে না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে তুলে ধরে তাঁকে 'জগদ্‌গুরু' বলেও আখ্যায়িত করতে হবে। নইলে আমার কর্তব্য যেমন শেষ হবে না, এ মহামনীষীর পূর্ণ পরিচয়ও তেমনি দেওয়া হবে না। জানি, মহাসাগরের স্বরূপ নির্ধারণ করবার সাধ্য কারো নেই। মহাকাশে অগণিত সৃষ্টির হিসাব দেবার জ্ঞানও কারো নেই। তবুও মানুষ আজীবনকাল ধরে চেষ্টা করে আসছে-যে চেষ্টার কোন বিরাম নেই। যতটুকু সফলতা লাভ করেছে ততটুকুর মধ্যেই পেয়েছে বিরাট রহস্য ও অপার আনন্দ। এতটুকু ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি লিখতে বসেছি এ ক্ষুদ্র বইখানি। সারা জগৎ যাঁর কাছে ঋণী, জগতের মনীষীরা যাঁকে শিক্ষাগুরু বলে এক বাক্যে মেনে নেয়, সাধু-ভক্ত যাঁর কাছে মাথা নত করে, বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাঁর আদেশ, উপদেশ শিরোধার্য বলে মনে করে– তাঁকে লক্ষ্য করেই এমন কঠিন বিষয়টির উপর হাত বাড়ালাম। কুযুক্তির অবতারণা করে নিছক তুলনা-উপমা দিয়ে লেখবার প্রয়াস আমার নেই। ধর্মতত্ত্বের মূল সার নিয়ে ও মহামনীষীদের জীবনচরিত আলোচনা করে সামান্য যতটুকু জ্ঞান আহরণ করেছি তারই উপর নির্ভর করে যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে লিখতে বসেছি এ 'জগদ্‌গুরু'। দেখাতে চাই যে, পণ্ডিতের শীর্ষে যে মহাপণ্ডিত, জ্ঞানীর শীর্ষে যে মহাজ্ঞানী, নবীর শীর্ষে যে মহানবী, বৈজ্ঞানিকের শীর্ষে যে মহাবৈজ্ঞানিক এ জগৎকে আলোকিত করেছেন তিনিই 'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'।

প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষই ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। তাঁরা আল্লাহর কাছে যেমন প্রিয়, মানব সম্প্রদায়ের কাছেও তেমনি আদরণীয়। কাউকে উপেক্ষা করবার, কাউকে অমান্য করবার, কাউকে অশ্রদ্ধা করবার মত দুঃসাহস আমি অর্জন করি নি। ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখেই আমি তাদের কাছে মাথা নত করি। কেননা লক্ষ লক্ষ মূঢ় মানবকে যাঁরা আলোর পথ দেখালেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন– অসাধারণ। তাই যে কোন ধর্মাবলম্বীর কাছেই তাঁরা বরণীয়। মুসলমান এ কথা নির্বিবাদেই স্বীকার করে– 'লা-নুফাররেকো বাইনা আহাদেম মেররছুলিহি" (অর্থাৎ পয়গম্বরদের মধ্যে আমি কাউকেই কোন পার্থক্যজ্ঞান করি না)। কোরআনের এ মূল্যবান বাণীটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রেখেও আমি আলোচনায় রত হব।

একজনের গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার অর্থ এ নয় যে অন্যকে ছোট করা। তবে উপমা ও তুলনা প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করা যায় তখন স্বভাবতঃই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। মধুকে আরোগ্যের দৃঢ় উপাদান বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনের নিমিত্ত সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ। মধুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণই মধুকে এত উন্নত করেছে। তাই বলে গুড়, চিনি বা স্যাকারিনের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয় নি। সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে গণ্ডার, হাতি ও বাঘের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আকাশের চাঁদ তার নিজস্ব আলোর প্রভাবেই প্রেমিক-মন আলোকিত করে। দিগন্তের সূর্য তার নিজস্ব কিরণচ্ছটাতেই এ বিশ্বকে সতেজ রাখে।

শূন্যকে (জিরো) রেফারেন্স হিসেবে না ধরলে যেমন এক, দুই, তিন, চার গণনা করা সম্ভব নয় এবং এক হ'তে দুই, দুই হতে তিন এবং তিন হ'তে চার যে বড়– এটা প্রমাণ করার যেমন কোন কৌশলই নেই, তেমনি যে কোন তুলনা-মূলক আলোচনাতেও একটা মাপকাঠির ভিত্তি না নিয়ে অগ্রসর হবার কোন পন্থা নেই। তাই বলে এ মাপকাঠি ও রেফারেন্স পয়েন্ট-এর যে মূল্য নেই এ কথা বলা চলে না। কনিষ্ঠ অঙ্গুলী না থাকলে যেমন অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর স্বরূপ বিকাশ করা যেত না, তেমনি যুগ যুগের মনীষী ও ধর্মযাজকদের আবির্ভাব না হলেও মহামনীষী ও পয়গম্বর নেতাকে চিহ্নিত করা যেত না। যবা, বেলী, যুঁই না থাকলে যেমন গোলাপের সৌন্দর্য বুঝা যেত না তেমনি পূর্বে প্রেরিত নবীদের আগমন না ঘটলেও হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ত না। সৃষ্টি পার্থক্যই সৃষ্টিকে এত সুন্দর করেছে। কালোর চেয়ে কালো, সুন্দরের চেয়ে সুন্দর, গুণের চেয়েও মহাগুণী, আলোর উপরে আলো এ ত আল্লাহরই সৃষ্টি বৈচিত্র্য! তাই মানবের উপর মহামানব, নবীর উপরে মহানবী, গুরুর উপরে মহাগুরু অর্থাৎ 'জগদ্‌গুরু' লিখতে দোষ কি? এ ছাড়া আল্লাহ নিজেও ত বলেছেন–

"এবং নিশ্চয় আমি নবীগণের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।"

(সূরা বনি ইসরাইল–আয়াত ৫৫)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'হলে এখন নিঃসন্দেহেই আমরা দ্বিধা, সংকোচ ও সংকীর্ণতার মনোভাব পরিহার করে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারি ও দেখাতে পারি কে সত্যি 'জগদ্‌গুরু' বলে আখ্যায়িত হবার উপযুক্ত। এ আলোচনাতে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কেননা ডাঙ্গায় বসে মহাসাগরের তলদেশ থেকে মুক্তা-প্রবাল কুড়াবার প্রয়াস যেমন নিছক কল্পনাপ্রসূত, আমার অপরিপক্ক জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে এ মহামানবের জীবন-আদর্শ তুলে ধরে 'জগদ্‌গুরু' প্রমাণ করার প্রয়াসও হয়ত তেমনি অসম্পূর্ণ হবে সন্দেহ নেই। জোনাকী তার মৃদু ও ক্ষীণ আলো নিয়ে যেমন পথ চলে, আমিও তেমনি হীন বিবেক ও সীমিত চিন্তাধারা নিয়ে কলম ধরলাম। প্রেমের রাজ্যে ক্ষুদ্র জোনাকি যেমন তার আসন পেতে প্রেমিক মন উজালা করে, তদ্রূপ প্রেম-পাগল মানব-রাজ্যে যদি এ সামান্য লেখাটুকু কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে তবেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

বইটির চতুর্থ সংস্করণ দিতে মনস্থ করলাম। এ প্রসঙ্গে আমি আমার পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করি সহৃদয়বান পাঠকবৃন্দকে যারা জগদ্‌গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাকে দূর-দূরান্ত থেকে উপহার ও আশীষ বাণী পাঠাচ্ছেন এবং হৃদয় নিংড়ানো অভিবাদন জানিয়ে ধন্য করেছেন। জগদ্‌গুরুর মহান আদর্শে ও ভাবস্বপ্নে যিনি আমার মর্ম-সহচর, যিনি এই পবিত্র গ্রন্থখানির অঙ্গ-বিন্যাস, কারুশিল্প ও সামগ্রিক মূল্যবোধের একান্ত সমঝদার, সেই অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুর রহমান আব্বাসী (এম. এ. ডবল), কবিশেখরকে এ গ্রন্থ সূচনায় গৌরবের সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। আরও স্মরণ করছি আমার প্রেরণাদাতা, এ লেখার প্রিয় ও প্রাণবান পাঠক যিনি গর্বের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন– বই পুস্তক দিয়ে এ লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন– সেই জ্ঞানপিপাসু, আমার পরম শ্রদ্ধেয় চিন্তাশীল পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক মৌলানা হাসান আলী (দিঘাপতিয়া হাইস্কুল, নাটোর) সাহেবকে। সর্বশেষে সগৌরবে স্মরণ করছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার এ দুর্গম পথ-যাত্রার সার্থক সহযাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যিনি ভিন্ন দেশ ভারত থেকে আশীষ বাণীসহ তাঁর রচিত মহামূল্যবান পাঁচখানি পুস্তক যা' সত্য প্রতিষ্ঠায় ও বিশ্বনবীর জীবনাদর্শে বিস্ময়কররূপে খ্যাতিলাভ করেছে তা' উপহার স্বরূপ আমাকে প্রেরণ করে সেই মহান ব্যক্তিসত্ত্বা, অমর সাহিত্যিক, দার্শনিক ও জ্ঞান তাপস জনাব আবেদ আলী, বি. এ. অনার্স, এম. এ. বি. টি– সাহেবকে। এঁদের সাধনা ফলবতী হোক, **'জগদ্‌গুরুর'** পাশে সসম্মানে তাঁরা আসন লাভ করুক, মহান আল্লাহর কাছে একান্তভাবে তাই কমনা করি। আমিন। খোদা হাফেজ।

নু, ই, [লেখক]

সূচিপাতা

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	বংশ পরিচয় ------ ------	১৩
২।	আমি কে? ------ ------	১৫
	শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে ঃ	
৩।.	হযরত কী বলেছেন? ------ ------	১৬
	কোরআন ------ ------	৪৪
৪।	**বিশ্বমনীষীরা কী বলেছেন?** ------ ------	৬১
	(ক) ধর্ম নেতাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ------	৬১
	মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন ঃ ------ ------	৭৩
	(খ) শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ------	৮২
৫।	**পয়গম্বরগণের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)------ ------**	৯৩
	(ক) ইব্রাহিম (আঃ) কী বলেছেন? ------ ------	৯৩
	(খ) ঈসা (আঃ) (যীশু) কী বলেছেন? ------ ------	৯৩
	(গ) মুসা (আঃ) কী বলেছেন? ------ ------	৯৪
৬।	**আল্লাহ কী বলেছেন?** ------ ------	৯৫
৭।	কোরআন বলে ঃ ------ ------	১০৬
	(এক পারা হতে ত্রিশ পারা)	
৮।	পরিশিষ্ট ------ ------	১৪২
৯।	উপহার বাণী ------ ------	১৪৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ পড়ুন ঃ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বিশ্বজাহানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকখানি বই ঃ

পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে

যে বইটি পৃথিবীর৭০টি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবিসি (লন্ডন) হতে লেখকের নাম প্রচারিত হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে সপ্তম সংস্করণ বের হয়েছে, বাংলাদেশ আর প্রথম সংস্করণ কলকাতা হতে।

বিজ্ঞান না কোরআন

যে বইটি চিন্তা জগতে বিপ্লব এনেছে। লাইব্রেরী অফ আমেরিকায় স্থান লাভ করেছে। ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

সিরিজ (১ হতে ৪র্থ খণ্ড) এতে রয়েছে রসুলুল্লাহর (দঃ) অমিয় বাণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ভারত থেকে যে বইটিকে কেন্দ্র করে লেখককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান অদৃশ্য বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে।

জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ)

বইটিতে কোরআন-হাদিস, বেদ-বাইবেল জিন্দাবেস্তা ও বিশ্বমনীষীদের মন্তব্য নিয়ে রসুলের (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ

আমরা বিছমিল্লাহর গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের উপর জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করি না। মহাত্মারা এর উপর রিসার্চ করেছেন এবং প্রচুর সুফল লাভ করেছেন। তাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে 'বিছমিল্লাহ' জপ সর্বশ্রেষ্ঠ কেননা বিছমিল্লাহ আল্লাহর পবিত্র নাম।

মানবজাতির মুক্তির পথ

যত মানব সন্তান এ বিশ্বে আছে, ছিল এবং আসবে সবারই মুক্তির পথ রয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর যত নবী-রসুল বিভিন্ন দেশ ও জাতির উপর প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের মূল চিন্তাধারা অভিন্ন। সৃষ্টিকর্তা-এক। তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। বিভিন্ন জাতির জন্য কোরআন হাদিস-বেদ বাইবেল অনুযায়ী।

সর্বধর্মে বেহেশত দোজখ

পাপ পূণ্যের উপর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য অসংখ্য নবী ও রসুল প্রেরিত হয়েছিল একই উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে। পাপ পূণ্যের পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কেউ পাবে মহাপুরস্কার কেউ পাবে মহা তিরস্কার। প্রতিদান তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন– বন্টন করবেন পরকালে বেহেশত দোজখে।

বংশ পরিচয়

জলে বাস ক'রেও কাঁকড়া যেমন মহাসমুদ্রের পরিচয় জানে না, মরুর বুকে বিচরণ ক'রেও উট যেমন মরুর দিগন্ত-প্রসারী বিশালতার খবর রাখে না, শূন্যে বিচরণ ক'রেও বাবুই পাখি যেমন অনন্ত মহাকাশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের হিসাব দিতে পারে না, তেমনি মানব হ'য়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েও এ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিচয়ও কেউ জানে না। যে যতটুকু পরিচয় দিয়ে এ বিশ্বগুরুর পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন সে পরিচয় তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়। তাঁর পরিচয় এর উর্ধ্বে–বহু উর্ধ্বে। শব্দযোগে বাক্য গঠন হয় সত্য কথা, কিন্তু মনকে গঠন ক'রে মনের নিভৃত কোণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রকাশ করা যায় না। তাই বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় যোগেও প্রকৃত ভাব অপ্রকাশিতই থাকে। যে বাক্যে হযরতের পরিচয় দিতে যাব, যে বিশেষণে তাঁর গুণাগুণ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতে যাব, সে বাক্য ও বিশেষণ অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ থাকবে বলে আমরা তাঁর আসল পরিচয় তাঁর নিজস্ব মুখে, মহাপুরুষদের মুখে ও আল্লাহর মুখে শুনব। এখানে শুধু তাঁর বাহ্যিক ও বংশগত পরিচয়টুকু অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

আজ থেকে প্রায় চোদ্দশ' বছর আগে এ মরুভাস্কর মরুর কোল উদ্ভাসিত ক'রে আমিনার গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন আরবের মক্কা নগরীতে। ঐতিহাসিকদের মতে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট– চান্দ্রমাসের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারের প্রভাতই ছিল তাঁর জন্ম তারিখ। জন্মের ছয় মাস পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ প্রাণত্যাগ করেন। বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মুত্তালেব এ প্রাণপ্রিয় সুদর্শন শিশুটিকে প্রতিপালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের উপর।

যে বংশে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন সে বংশই ছিল আরবের স্বনামধন্য 'কোরেশ' বংশ। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষ 'কোরেশ' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই এ কোরেশ বংশের উদ্ভব হয়। সর্বজনমান্য কোরেশ বংশের চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান পুরষগণই মক্কা নগরীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন পরিচালনা করেন।

বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র আরব। আরবের প্রাণকেন্দ্র ছিল পবিত্র মক্কা নগরী। এ নগরী ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম জনবসতিপূর্ণ নগরী। এর স্থাপয়িতাও ছিলেন স্বয়ং সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম। এই সুবিখ্যাত নগরী মক্কা– যাকে 'উম্মুল কোরা' বলা হয়– বিশ্ব মানবের চোখে ছিল অতি পবিত্র। কেননা এখানেই ছিল আদিগৃহ 'কাবা'– বিশ্ব মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনালয়। যুগ-যুগান্তরের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই পবিত্র ধর্ম-নিকেতন ও ঐশী উপাসনালয় যার সমতুল্য পৃথিবীতে আর নেই। রোমান, পারসিক, মুসলিম, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি জাতির প্রাণ ছিল এ কাবা। এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য যে কত অধিক কোরআনে তার সাক্ষ্য মেলে।

"এবং যখন আমি কাবা-গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছিলাম এবং মাকামে ইব্রাহিমকে প্রার্থনাস্থল নির্ধারণ করিয়াছিলাম; এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও এতেকাফকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।"[১] (২ ঃ ১১৫)

এই পবিত্র মিলনতীর্থেই জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র আত্মা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ কাবার ভিত্তি স্থাপনকারী আদি পিতা হযরত ইব্রাহিমেরই বংশধর ছিলেন এ মহামানব– যে বংশে জন্ম নিয়েছিলেন– পরাক্রমশালী মহাপুরুষ; নবী ও পয়গম্বর– হযরত ইসমাইল, ইয়াকুব, দাউদ, সোলায়মান, মুসা ও ঈসা (আঃ)। এ বংশের খ্যাতি কে না জানে। এ বংশের ইতিহাস কোন জাতির কাছেই বা অজানা আছে। ধ্যান, জ্ঞান, দয়া, ধর্ম, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের বংশই ছিল আরবের খ্যাতনামা এ কোরেশ বংশ।

এ বংশের উপরই ভার ছিল আদি গৃহ কাবার পবিত্রতা রক্ষা করার। দুনিয়ার বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মাগণ যখন ঐ কাবাগৃহে আগমন করতেন তখন কোরেশ বংশের লোকেরাই তাঁদের খেদমতে হাজির হতেন। কথিত আছে যে, এ কাবাগৃহে আগত পুণ্যাত্মাদের পানি সরবরাহ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন হযরতেরই পিতামহ পুণ্যাত্মা, দয়াশীল মনীষী হযরত আবদুল মুত্তালিব। একদা তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, "হে আল্লাহ। হযরত ইসমাইলের পবিত্র পদাঘাতে যে 'জমজম' কূপের সৃষ্টি হয়, সে হারান কূপের সন্ধান লাভ করতে পারলে এবং সে কূপের অফুরন্ত পানি দিয়ে হজ্জ ও তীর্থ পালনকারীদের তৃষ্ণা মেটাতে পারলে আমার পুত্রদের মধ্য হ'তে সবচেয়ে প্রিয়জনকেই তোমার নামে কোরবাণী করব।"

ত্যাগের এমন মহান আদর্শ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আল্লাহকে ভালবেসে– আল্লাহর নামে ধন-সম্পত্তি নয়, টাকা-পয়সা নয়, পশু-পক্ষী নয়, প্রাণপ্রিয় পুত্রকে উৎসর্গ করার মত দৃষ্টান্ত অন্য কোন বংশের কোন মহাত্মা রেখে গেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় এক মহানবী এমন উৎসর্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে যুগে যুগে অমর হ'য়ে আছেন। সে ভাগ্যবান মহাপুরুষ অন্য কোন জাতির নয়, অন্য কোন বংশের নয়, অন্য কোন রক্তধারার নয়, যে নবীর বংশ নিয়ে আলোচনা করছি সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এরই বংশধর ও পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) যাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর নামে কোরবাণী ক'রেছিলেন। উৎসর্গীকৃত পুত্র ইসমাইল যাঁর পবিত্র পদাঘাতেই হ'য়েছিল 'জমজম'– অমৃত বারি ধারার উৎস যা পান ক'রে মানুষ পায় পরম আনন্দ ও তৃপ্তি, যে পবিত্র পানির জন্য লালায়িত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, যে পানি হৃদয়কে শান্তি দেয়, আত্মাকে নির্মল ক'রে, রোগের বংশকে সমূলে ধ্বংস করে। এ 'আবে জমজম' এর সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বংশ হ'তেই হ'য়েছিল– এর পুনরাবিষ্কারও হ'য়েছিল তাঁরই বংশ হতেই। এ পানির বিলি বণ্টনও হয় তাঁরই বংশের পুণ্যাত্মাদের হাতেই। দান, উৎসর্গ ও ত্যাগের অপূর্ব সমাবেশ যে

১ –কোরআন–সূরা বাকারা, আয়াত ১১৫।
মাকামে ইব্রাহিম ঃ– হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর স্থান। যে স্থানে একখানি প্রস্তরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবাগৃহের প্রাচীর নির্মাণ করতেন।

বংশের ছিল সে বংশে জন্ম নিয়ে হযরত নিজেই গৌরবান্বিত। এর মর্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে।–এর সাক্ষ্যও বহন করে তাঁরই মহাবাণী।

"এই মর্যাদা কোরেশদের মধ্যেই থাকবে যতদিন বাকি থাকবে তাঁদের দু'ব্যক্তিও।"[১]

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। আর তাঁর স্ত্রী হাজেরা যিনি নির্বাসিত হ'য়ে এ মক্কাপ্রান্তরে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসিনী। পারস্য ও মিশরের রক্তধারায় গঠিত হযরত ইসমাইল–যাঁর স্ত্রী বিবি 'সারা' ছিলেন আরবের অধিবাসিনী। তা হ'লে দেখা যায় 'পারস্য-মিশর-আরব' রক্তধারায় অর্থাৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মহামিলনের স্রোত-প্রবাহে রূপলাভ করেন এ জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)।

আমি কে?

'আমি কে'–এ জটিল প্রশ্ন সবার মাথায় দোলা দেয় না। দেয় শুধু তাঁদেরই যাঁরা নিজের পরিচয় জানতে চায়। নিজের পরিচয় জানবার কৌতূহল, নিজের আত্মাকে চিনবার মত জ্ঞান, নিজকে উপলব্ধি করবার মত অবসর সবার হ'য়ে উঠে না। জগৎ যাঁদের পানে তাকিয়ে থাকে, সমাজ যাঁদের কাছে ঋণী হ'তে চায়, সৃষ্টজীব যাঁদের মোহমায়ার বন্ধনে জড়িত হবার আশায় দিন গোনে, তাঁরা–শুধু তাঁরাই জানতে চায় 'আমি কে'? 'আমার কর্তব্য কি"?

দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হালিমার দুধ পান করতেন– দু'টি নয়, একটি। কেন? কি রহস্য ছিল এর মধ্যে? কোন্ মায়ার বশবর্তী হ'য়ে একটি দুধ রেখে দিতেন? কার জন্য হৃদয় সাগরে তাঁর প্রেমের ঢেউ উথলিয়ে পড়ত? তিনি কি জানতেন তাঁর আরও একটি ভাই একসাথে হালিমার দুধ পান করে? জানবার কথা নয়। বুঝবার কথা নয়। উপলব্ধি করবারও কথা নয়। তবুও জানতেন, বুঝতেন ও উপলব্ধি করতেন। নইলে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে জগৎকে স্তম্ভিত করতেন না। 'আমি কে?' এ প্রশ্ন তখন থেকেই তাঁর মাথায় দোলা দিয়েছিল। শুধু দিয়েছিলই না– সমাধানও তিনি দিয়েছিলেন তাঁর জবাবে– 'আমি বিশ্বের নায়ক। আমি সাম্য-মৈত্রীর গায়ক।'

ঐশী বাণী হাতে নিয়ে ঐশী দূত তাঁর কাছে দাঁড়ালে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে তিনি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতেন– 'আমি কে?' অন্তর তাঁর বলে দিত– 'তুমি নবী। তুমি পয়গম্বর। তুমি আল্লাহর রাসুল।'

ব্যথিত, নির্যাতিত, মজলুম জনতার পাশে দাঁড়ালে, এতিম, দুঃখী, কাঙ্গালের গৃহে আগমন করলে মনে তাঁর প্রশ্ন জাগত 'আমি কে?' অমনি অন্তর তাঁর বলে উঠত, –

"আমি শান্তির দূত, আমি এতিমের ভাই, আমি দুঃখীর বন্ধু, আমি কাঙ্গালের সাথী, আমি ব্যথিতের ব্যথা মোচনকারী, আমি লাঞ্ছিত, নির্যাতিত মজলুম জনতার সাহায্যকারী।"

মূঢ় মানব সমাজের দিকে তাকালে অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের উপর-দৃষ্টি পড়লে

১–সহীহ বুখারী। কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ। তর্জমা–আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা–২৬৭ (৫-২৮২)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্তরে তাঁর তুফান বইত আর মনে জাগত 'আমি কে?, আমার কর্তব্য কি?' কালবিলম্ব না করেই মন তাঁর বলে দিত– 'আমি বিচারক, আমি সংস্কারক, আমি ভীতি-প্রদর্শক, আমি আল্লাহর বাণী-বাহক।'

পূজক-পূজারী, নায়ক-নায়িকা, রাজা-মহারাজা, সাধক-সাধ্বী, শাসক-শাসিত, পীর-পয়গম্বর, ওলি-গাউস, নেতা ও জনতার মাঝে যখন মিশতেন তখনও তাঁর হৃদয়ে প্রশ্ন উঠত– 'আমি কে?' নির্ভীক হৃদয়ের উত্তর তাঁর মিল্‌ত,–

'আমি রাসুলদের নেতা। আমি আল্লাহর প্রতিনিধি। আমি প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি। আমি সাধককুল শিরোমণি। আমি বিশ্বের আশীর্বাদ। আমি জয়ী– আমি বিশ্ববিজয়ী।'

জড়-চেতন, আলোক, বাতাস, জীবজন্তু, চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-লতা, সাগর-মরু, আকাশ ও ভুবন দেখে বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় অভিভূত হ'য়ে পড়ত। নির্বাক মনে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে দিনের পর দিন কাটাতেন আর নিজের মনেই প্রশ্ন করতেন– 'আমি কে? " –উত্তর পেতেন,–

'আমি মূল সৃষ্টি। আমার নূরে আলোকিত এ বিশ্বজগৎ। আমি পথ-প্রদর্শক। আমি আহ্বানকারী, আমি প্রার্থনাকারী। আমি বিশ্বজগৎ উদঘাটনকারী। আমি জ্ঞানী–আমি মহাজ্ঞানী। আমি গুরু– আমি জগৎগুরু।'[১]

হযরত কী বলেছেন?

বিশ্ব যখন ডুবু ডুবু, ধরা যখন টল্‌টলায়মান, মানব সম্প্রদায় যখন পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত তখন মরুর বুকে আরবে উদিত হ'য়েছিলেন এ মরু-ভাস্কর– হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। শুধু আরবের কুখ্যাত বেদুইনদের জন্যই তিনি আসেন নি, সমগ্র বিশ্বকে অনাচার, অত্যাচার, নৃশংসতা, বর্বরতা, দীনতা ও পাশবিকতার হাত থেকে মুক্ত করতেই এসেছিলেন এ বিশ্বনবী। পূর্বের মহাপুরুষদের দ্বারা যা সম্ভব হয় নি, পূর্বের নবীদের দ্বারা যার সমাধান হয় নি, পূর্বের পয়গম্বরদের উপর যে সব করুণার বাণী বর্ষিত হয় নি সে সব শক্তি হাতে নিয়েই হয়েছিল এ মহানবীর আবির্ভাব। সম্প্রদায়ের নেতা, জাতির নেতা, দেশের নেতা ও জগতের নেতারূপে তিনি হ'য়েছিলেন মনোনীত। তাই তিনি বলেছেন–

"আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে– আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকেই উহা দেওয়া হয় নাই। আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ করা হইয়াছে এবং উহাকে পবিত্র করা হইয়াছে। অতএব আমার উম্মতদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি নামাযের সময় হইলে যথায় ইচ্ছা নামায পড়িতে পারিবে। আমার জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ বৈধ করা হইয়াছে; অন্যান্য নবীগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং আমি সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইয়াছি; এবং আমাকে শাফায়াত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"[১]

পৃথিবী সৃষ্টির কোটি কোটি বছর পার হ'য়ে গেছে। এই কোটি কোটি বছরের মাঝে

'যে ব্যক্তি মুহাম্মদের বাধ্য হইল, সে আল্লাহর বাধ্য হইল এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মদের অবাধ্য হইল, সে আল্লাহর অবাধ্য হইল এবং মুহাম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী।' (সহীহ বুখারী)

১–সহীহ বুখারী। কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ–তর্জমা আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ২৮৬।

কোটি কোটি মানুষ জন্মলাভ করেছে এবং এ পৃথিবী হ'তে চিরবিদায় নিয়েছে। আকাশের কোলে অগণিত তারকার মাঝে যেমন কতকগুলি তারকা নিজ বৈশিষ্ট্যের গুণে আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে তেমিন কোটি কোটি চেনা-অচেনা মানুষের মাঝেও কিছু সংখ্যক মহাপুরুষ নিজ বৈশিষ্ট্যে এ ধরাকে আলোকিত করেছেন। বিপথগামী মানবসমাজকে সুপথে চালিত করে নিজেরা বিশ্বের বুকে অমর হ'য়ে রয়েছেন। এ সব মহাপুরুষগণ যুগ যুগের মানুষের কাছেই স্মরণীয়, বরণীয় ও আদরনীয়। মহামনীষীদের আবির্ভাব ঘটে তখনই যখন কোন দেশ, কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সুপথ ছেড়ে বিপথে পতিত হয় এবং দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও অন্যায় অরাজকতার চরম সীমায় উপনীত হয়। ঠিক এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষনে জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ), যিনি নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে–

"আমি মনুষ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরিত হইয়াছি, যুগের পর যুগ গিয়াছে, অবশেষে আমি আসিয়াছি আমি যে যুগে আছি।"[১]

'আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে'। এ কথাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। আধ্যাত্মিক অর্থ কি জানি না, তবে সাধারন অর্থে যা বুঝা যায় তা হলো এই যে, এই পাপ-পঙ্কিল ধরাধামে পাপের যে রাজত্ব চলছিল তার অবসান ক'রে পুণ্যের এক স্বর্গ রচনা করাই ছিল তাঁর মহান এক দায়িত্ব, যে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই ন্যস্ত করা হ'য়েছিল শুধু তাঁরই উপর; অন্য কোন নবীর উপর নয়। পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিই মসজিদের মত পবিত্র হোক, সুন্দর ও সুখের লীলা-ভূমিতে পরিণত হোক, তপস্যা ও আরাধনার ক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠুক এটাই ছিল তাঁর পবিত্র ইচ্ছা যা তাঁর জীবনেই তিনি পূরণ করতে পেরেছিলেন। এত বড় কৃতিত্বের অধিকার কোনো নবী বা মহাপুরুষের ভাগ্যেই জোটে নি। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে সবাইকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল। এ অমোঘ বাণী পরবর্তী যুগে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধ যুগের অন্ধ দেশ আরব থেকে এ বাণী ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে, আর তাকেই মেনে নেয় সভ্য দেশের মনীষীরা। এ জন্যই হযরত তাঁর এক বাণীতে বলেছিলেন,

"ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু বাকি থাকিবে না যেখানে আল্লাহ পরাক্রমশালীদের পরাক্রম অথবা দুর্বলদের দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামের বাণী না পৌছাইবেন।"–(মিশকাত)

'আমার জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ বৈধ করা হইয়াছে'। এ বাণীটির মর্ম কি আমি অনুধাব করতে অক্ষম। লুণ্ঠিত দ্রব্য সবার জন্যই অবৈধ। অথচ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন তাঁর জন্য এটা বৈধ।

এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। লুণ্ঠিত দ্রব্য অর্থ যুদ্ধে প্রাপ্ত সামগ্রী। অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করার পর যে-সব দ্রব্য বিজেতাদের হাতে আসে পূর্বে কোন শাসক বা নবীদের এ

১–সহীহ বুখারী, কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ–তর্জমা, আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ, পৃষ্ঠা–২৮৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

সব দ্রব্য ভোগ করার অধিকার ছিল না। যোদ্ধারা শুধু ভোগ করত। অনেক সময় দেখা যেত এ সব দ্রব্যকে কেন্দ্র করে যোদ্ধাদের মধ্যেও আবার এক অন্তর্ঘাতী বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে অকারণে অনেকেই প্রাণ হারাত। তাই রাষ্ট্রনায়কগণ এ সব দ্রব্য জমা করে পুড়িয়ে ফেলতেন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্য এসব দ্রব্য আল্লাহর নির্দেশে বৈধকরণ করা হয়েছে। তিনি একমাত্র মহাপুরুষ যিনি পুরাতন পদ্ধতিকে ঢেলে নতুনভাবে সাজালেন, সমবণ্টনের ব্যবস্থা করলেন, রাজা-প্রজার ভেদাভেদ না রেখে আনন্দের সঙ্গে সবারই ভোগ করার এক অধিকার দিলেন, যে অধিকার নিয়ে এলো সবার জন্য শান্তি–পরম শান্তি।

'Equal distribution of wealth'—অর্থাৎ ধন-সম্পদের সমবণ্টন ব্যবস্থা, যা ছিল ইসলামী বিপ্লবের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা, তা নিয়ে এলেন এ মহান বিপ্লবী নায়ক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

লেনিন, কার্ল মার্কস প্রভৃতি পরবর্তী যুগের সমাজ বিজ্ঞানীরা বোধ হয় হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর এই 'লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ বৈধ' নীতিকে অনুসরণ করে বিপ্লব এনেছিলেন যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে।

"অন্যান্য নবীগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং আমি সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইয়াছি এবং আমাকে শাফায়াত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"–এ বাণীর উপর আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

এ বাণী হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। কোন নবী, কোন পয়গম্বর এমন দাবী উত্থাপন করতে পারেন নি। এমন চ্যালেঞ্জ, এমন আশার বাণী ইতিপূর্বে কেউ দিতে পারে নি। সেই মহাবিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি নবী 'ইয়া নফ্ছী ইয়া নফ্ছী (আমাকে বাঁচাও–আমাকে বাঁচাও)' বলে চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহর কাছে কারো জন্য কোন সুপারিশ করার কোন অধিকার থাকবে না। মা ছেলেকে চিনবে না, ছেলে মাকে চিনবে না। স্বামী স্ত্রীকে ভুলে যাবে, স্ত্রী স্বামীকে ভুলে যাবে। বিভ্রান্ত মৌমাছির মত সবাই ছুটাছুটি করতে থাকবে। পরিত্রাণের আশায় কতজনের হাত-পা ধরবে কিন্তু কোনই ফল হবে না। নবী, পয়গম্বর, সাধু, সন্ন্যাসী, আউলিয়া, দরবেশ সবাই নিজে নিজের জন্য থাকবে ব্যস্ত। এই মহাপরীক্ষার সামনে, এই মহাবিপদের ক্ষণে একমাত্র পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ) 'ইয়া উম্মতি'–'ইয়া উম্মতি' বলে কাঁদতে থাকবেন। তখন আল্লাহ-পাক তাঁকেই মাত্র ক্ষমতা দেবেন তাঁর উম্মতদের জন্য সুপারিশ করতে। তাঁর উম্মতদের মধ্যে যারা সামান্য পুণ্যও অর্জন করেছে তারাও হযরতের শাফায়াত অনুযায়ী আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তিসনদ নিয়ে বেহেশতে ঢুকবেন। ভাগ্যবান তাঁরাই যাঁরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অনুসারী। শাফায়াত করার অধিকার যখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ছাড়া অন্য কোন নবীরই নেই তখন একথা কি বললে ভুল হবে যে তিনিই হলেন নবী-সম্রাট। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে দেখে আল্লাহর প্রিয় ও পরাক্রমশালী নবী হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত কেঁদে বলেছেন, "হে আল্লাহ! কেন আমাকে সেই পরম উম্মতে মুহাম্মদী রূপে সৃষ্টি কর নি?"

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কেন কাঁদিতেছেন আপনি' ? তিনি বললেন, 'কাঁদিতেছি এ জন্য যে, আমার পরে প্রেরিত হইয়াছেন এক যুবক যাহার উম্মত অধিক সংখ্যায় বেহেশতে প্রবেশ করিবে আমার উম্মতের চেয়ে।"[১]

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন ষষ্ঠ আসমানে উঠলেন তখন হযরত মুসার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। হযরত মুসা হযরতকে আলিঙ্গন করে বলেন, "শুভাগমন হউক পুণ্যবান ভ্রাতা ও পুণ্যবান নবীর।" এরপর হযরত (দঃ) যখন সপ্তম আসমানের দিকে চললেন তখনি হযরত মুসা কেঁদে উপর্যুক্ত কথাগুলি বলেছিলেন।

আল্লাহর নিকট শাফায়াত করার অধিকার পেয়ে হযরত নিজে যেমন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হ'য়েছেন তেমনি আমরাও তাঁকে শাফায়াতকারী নবী হিসাবে পেয়ে ধন্য হ'য়েছি। এ নবীর প্রকৃত উম্মত বেহেশতের অধিকারী হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা হযরত নিজেই বলেছেন,

"আমার এই উম্মতগণ এক আশীর্বাদ প্রাপ্ত জাতি। পরলোকে তাঁহাদের কোন শাস্তি নেই। আপদ-বিপদ, বিপ্লব এবং হত্যা তাহাদের জন্য ইহলোকে শাস্তি।"[২]

ধর্মের খাতিরে, বাপদাদার ঐতিহ্যকে বহন করতে, নিজ নিজ সমাজের নিন্দার ভয়ে যদিও অমুসলিমগণ তাদের কৃষ্টি সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছেন তবুও তারা বলতে বাধ্য হ'য়েছেন যে হযরত মুহাম্মদের আদেশ, উপদেশ, জ্ঞান-গরিমা, কৃষ্টি, সভ্যতা সব কিছুই ছিল অতুলনীয়। কারো কাছেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন নি। তাঁরই শিক্ষা জগতের মনীষীরা মেনে নিয়েছেন এবং চিরদিন নিতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ ছাড়া কোন নবী, কোন পয়গম্বর, কোন সাধক, কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক, কোন পণ্ডিত বা কোন জ্ঞানীই তাঁর উপরে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারেন নি এবং পারবেও না। এ কথা রাসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেই ঘোষনা করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে–

"তোমরা কি জান কে সর্বাপেক্ষা মহানুভব" ? তাহারা বলিল– 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল উত্তমরূপে অবগত আছেন।' তিনি বলিলেন, "আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহানুভব এবং আমার পর তাহাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহানুভব যে জ্ঞানার্জন করে, অতঃপর তাহা প্রচার করে। রোজ কিয়ামতে সে কোন শাসনকর্তা বা সম্প্রদায়ের নেতারূপে উপস্থিত হইবে।"[১]

"রোজ কিয়ামতে আমিই সর্বপ্রথমে সেজদা করিতে আদিষ্ট হইব এবং আমিই সর্বপ্রথমে মাথা তুলিতে হুকুম পাইব। তখন আমার সম্মুখে যাহা আছে সবই দেখিব। সকল মানুষের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিব। তাহাদের একদল আমার পাশ্চাতে, একদল আমার দক্ষিণে ও বামে থাকিবে।"[২]

১–সহীহ বুখারী। মিরাজ পরিচ্ছেদ–তর্জমা, আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা–৩৬৯
২। আবু দাউদ। সংগৃহীত হাদিসের আলো। (মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন। এম. এ. ১ম খণ্ড)।
১–মিশকাত। সংগৃহীত–মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন, এম. এ. কর্তৃক–'হাদিসের আলো' পৃষ্ঠা ১০৪
২–তিরমিজী, ঐ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা কোন মনীষীই দিতে পারেন নি। নিজকে নিয়ে এমন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার শক্তি কোন মহাপুরুষেরই হয় নি।

পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই আমাদের আদি-পিতা আদমের (আঃ) জন্ম হ'য়েছিল। তারপর প্রতি শতাব্দীতেই প্রতিটি জাতির জন্যই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'য়েছে। হাদিসের তত্ত্ব হ'তে এ কথা জানা যায়।

"মহান ও গরীয়ান আল্লাহ এই উম্মতদের জন্য প্রতি শতাব্দীর শেষভাগে একজন লোক প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের ধর্মের সংস্কার সাধন করিবেন।" (আবুদাউদ, মিশকাত)

প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর স্ব স্ব দেশ ও জাতির মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শুধু তাঁর মাতৃভূমি আরব ও তাঁর স্বগোত্রের জন্য জন্মলাভ করেন নি। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে, সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে, সমগ্র জীন-ইনসানের হাতে জ্ঞানের অপরিসীম ভাণ্ডার তুলে দিতেই আল্লাহ তাঁকে দয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। এ কথা আল্লাহ নিজেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর মহাবাণী কোরআনে।

অনেকেই হয়ত মনে করতে পারেন উপরে বর্ণিত রাসুলুল্লাহর (দঃ) ঘোষণায় তাঁর অহমিকা ফুটে উঠেছে। এটা অহমিকা নয়। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সামান্যতম দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্বের একটা মাপকাঠি দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সজাগ ক'রে দিয়েছেন। নিজকে তিনি আল্লাহ ব'লে ঘোষনা করেন নি। আল্লাহর প্রেরিত রাসুল বলেই তিনি মানব জাতিকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা মহানুভবকে এর উত্তরে ভক্তি-বিজড়িত কণ্ঠেই তিনি স্বীকার ক'রেছেন– 'আল্লাহ যিনি মহাবিচারের দিনে তাঁকেই সর্বপ্রথম হুকুম দেবেন।'

"আমি সর্বপ্রথমে মাথা তুলিতে হুকুম পাইব"–যাঁরা মনে করেন তাঁর এ কথার মধ্যে অহমিকা আছে তাঁরা রাসুলুল্লার এ বাণীটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। শক্তিশালী মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাই তিনি করবেন। আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ ক'রে নিজের বাহাদুরী ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সগর্বে মাথা তুলবেন না। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পরেই তিনি মাথা তুলে তাকাবেন এবং সবকিছুই দেখতে ও বুঝতে পারবেন। 'আল্লাহর পরেই তাঁর স্থান'– এ কথার মধ্যেও বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের ছোঁয়া নেই। কেননা এ কথা ঘোষণা করে তিনি সমগ্র মানবজাতিকে বুঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ নির্ভুল। তাঁর প্রদর্শিত পথই সরল ও সুপথ, তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং মহানুভবতাই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে। তাই তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করবে তাঁরাই জ্ঞানী। তাঁরাই কেবল তাঁর আসনের পাশে সমাসীন হবেন এ আসন পেতে হ'লে দরকার জ্ঞানার্জন। তাই তিনি জ্ঞানীদের স্থান দিয়েছেন উর্ধ্বে, যেখানে আর কারোরই স্থান নেই। আমার এ বিশ্লেষণের পরে তবুও যারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ছিল, তারা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীগুলো একবার দেখুন।

"আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ মাত্র। শুধু পার্থক্য এই যে আমার নিকট প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আল্লাহই তোমাদের একমাত্র উপাস্য।"[১]

"আমি তোমাদিগকে বলি না যে আমার নিকট আল্লাহর কোষাগার রহিয়াছে এবং আমি ভবিষ্যৎ জ্ঞাত আছি এবং আমি তোমাদিগকে বলি না যে আমি একজন ফেরেশতা। আমার নিকট যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে আমি শুধু তাহাই অনুসরণ করি।"[২]

মানুষ ছাড়া অন্য কোন পরিচয় দিয়ে তিনি নিজকে বিভূষিত করেন নি। এমনকি ফেরেশতার সঙ্গেও তুলনা করেন নি। কত সুন্দর কথায় সাধারন মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখিয়েছেন এই বলে, "আমার নিকট শুধু প্রত্যাদেশ এসে থাকে যে তোমাদের মাবুদ মাত্র একজন।" মনে যাঁর মাবুদের ভয়, অন্তরে যাঁর সৃষ্টিকর্তার ভীতি, হৃদয়মনে যাঁর অফুরন্ত বিশ্বাস, আচরণে যাঁর সরলতা, তাঁর মনে অহঙ্কার ছিল এ কথা যারা বিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই অহঙ্কারের ছোঁয়া আছে। এ ছাড়া অহঙ্কারীদের উদ্দেশ্য ক'রে রাসুলুল্লাহ নিজেই বলেছেন, "অহঙ্কারী কুকুরের ও শূকরের স্বভাবপ্রাপ্ত হয়।"[৩]

আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আল্লাহর বাণী হাতে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠেই এ কথা ঘোষণা করেছেন, শুধু অহঙ্কারীকে মানব সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে। স্পষ্ট ক'রেই তিনি দেখিয়েছেন তাদের ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট স্বভাব। তাদের সমাজ শূকরের ও কুকুরের সঙ্গেই মাত্র হ'তে পারে– মানুষের সঙ্গে নয়। এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ যিনি উথাপন ক'রেছেন তাঁর কি অহমিকা ছিল? দেখুন, কত ভয়, ভীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি নিজকে সঁপে দিয়েছেন আল্লাহর কাছে। যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন তখন অশ্রুসজল চোখে দু'হাত তুলে বলতেন,

"হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমার ভুল, অজ্ঞতা ও সীমা-লঙ্ঘন এবং ঐ সব যাহা তুমি ভাল জান আমার চেয়ে; হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমার অলসতা ও হঠকারিতা, আমার ভুল, ত্রুটি ও সঙ্কল্প এবং এ সবই আছে আমার মধ্যে।"[১]

"আমি তোমার স্মরণ লইতেছি আলস্য হইতে ও বার্ধক্য হইতে, পাপ হইতে ও ঋণ হইতে, কবরের বিপদ হইতে ও কবরের শাস্তি হইতে এবং ঐশ্বর্যের অপকারিতা হইতে এবং আমি তোমাতে স্মরণ লইতেছি দারিদ্রের বিপদ হইতে এবং আমি তোমাতে স্মরণ লইতেছি দজ্জালের বিপদ হইতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সব গুনাহ ধুইয়া দাও আমা হইতে বরফ ও শিলার পানি দিয়া এবং পরিষ্কার কর আমার অন্তঃকরণ গুনাহ হইতে, যেমন পরিষ্কার করা হয় কাপড় ময়লা হইলে, এবং দূরে রাখ আমাকে আমার গুনাহ হইতে যেমন তুমি দূরে রাখিয়াছ পূর্বকে পশ্চিম হইতে।"[২]

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এক বক্তৃতার মাধ্যমে বলেছিলেন, 'সকল সিদ্ধ পুরুষের স্কন্ধে আমার চরণ।"[৩]

---

১ ও ২– মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন, এম. এ.। 'হাদিসের আলো', প্রথম খণ্ড, হইতে সংগৃহীত।
৩ – ঐ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮।
১ –সহীহ বুখারী, তর্জমা আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ, দোয়া পরিচ্ছেদ। হাদিস নং ১৭–১০৩১ ও ১৫– ১০০৯।
২ –সহীত বুখারী। ঐ হাদিস নং ১৭–১০১১ ও ১৫–১০০৯।
৩ –বড়পীর সাহেবের জীবনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে মহান সিদ্ধ পুরষ আল্লাহর ভয়ে নিজের আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন সেই মহান প্রেমিকের কাছে কেউ কি অহঙ্কারের বিন্দুমাত্র আশা করতে পারে? অথচ সাধারণ লোক যারা প্রসঙ্গ ছাড়াই কথার বিচার করে তারা নিঃসন্দেহেই এ কথা বলবে যে বড়পীর সাহেব সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ– এ কথা নিজের মুখে ঘোষনা ক'রে অহমিকা দেখিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা প্রসঙ্গ জানেন, যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, যাঁদের আত্মা কলুষ কালিমা হ'তে প্রমুক্ত, তাঁরা এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নত ক'রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রেছেন। শুধু তাই নয়, দূর থেকে—বহুদূর থেকে—যেখান থেকে তাঁর বাণী শ্রবণ করা সম্ভব নয়, সেই নির্জন প্রান্তর থেকেও ভক্তি বিজড়িত অন্তরে তাঁর চরণ দু'টি গর্বভরে প্রতিটি সাধক স্কন্ধে নিয়েছেন ও একবাক্যে স্বীকার করেছেন, 'আমাদের মাথায় তাঁর চরণ'। এজন্যই হযরত বড় পীর সাহেবকে 'তাজুল আউলিয়া' অর্থাৎ সিদ্ধ পুরষদের 'মাথার তাজ' বলা হয়। তাঁর এ বাণী অহঙ্কারের বাণী নয়। এ বাণী সিদ্ধ পুরুষগণকে শিখিয়ে দিয়েছে যে– যেখানে তাঁদের মিলিত সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর এ মহাসাধনা। এমন কঠোর সাধনা করার সৌভাগ্য সৃষ্টির পর থেকে জগতে কারো জীবনেই ঘটে নি। তাই তিনি সাধকদের উপর মহাসাধক, জ্ঞানীর শীর্ষে মহাজ্ঞানী।

রাসুলুল্লাহর (দঃ) কয়েকটি বাণী ধ'রে আমরা বিশ্লেষণ করেছি এবং দেখেছি যে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার, আত্মগরিমা বা হিংসা ছিল না। এবারে আর একটি বাণী যা তাঁর মুখ থেকেই নিঃসৃত হ'য়েছিল তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অমুসলিম ভাইয়েরা যাঁরা তাঁর অহমিকা প্রমাণ করতে সচেষ্ট তাঁরা দেখুন কত বিনয় এবং সৌজন্য নিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন! তিনি বলেছেন,

'আমি পয়গম্বরদের নেতা' কিন্তু এ জন্য আমার কোন গরিমা নেই, আমি নবীদের আগমনের সমাপ্তি ঘোষনাকারী কিন্তু এ জন্য আমার কোন অহঙ্কার নেই; আর আমি শেষ বিচারের দিন প্রথম প্রার্থনাকারী এবং আমার প্রার্থনা কবুলও হবে, কিন্তু এ জন্য আমার কোন আত্মগৌরব নেই।"[১]

"খ্রীষ্টানগণ মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে যেরূপ খোদার পুত্র বলে অত্যধিক প্রশংসা করে, তোমরা আমাকে তদ্রূপ করিও না, কারণ আমি শুধু আল্লাহর ভৃত্য। অনন্তর আল্লাহর বান্দা ও রাসুল বলিও।"[২]

নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে নয়, ঐন্দ্রজালিক কোন মায়ার প্রবঞ্চনা দিয়ে নয়, যশঃ ও খ্যাতির প্রলোভনের জন্য নয় তিনি শুধু পরবর্তী বংশধরদের নিজের পরিচয় দিতে সহজ, সরল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতেই এরূপ বানী উচ্চারণ করেছেন। কোন নবী বা পয়গম্বরদের দুর্নাম ক'রে তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ করেন নি। এ কথাও পরিষ্কার হ'য়ে যায় তাঁর নিম্নোক্ত বাণী হ'তে।

১ – বুখারী ও মুসলিম। সংগৃহীত আজহার উদ্দিন, এম. এ. কর্তৃক 'হাদিসের আলো', ২য় খণ্ড।
২– সহীহ বুখারী। আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ২৪৯।

"আমার আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত এমন যেন একটি প্রাসাদ যার নির্মাণকার্য খুবই সুন্দর হয়েছে কিন্তু তাতে একটা ইট বসানোর জায়গা খালি রেখে দেওয়া হ'য়েছে। তারপর দর্শকরা সেটা দেখতে এলো এবং তার সুন্দর নির্মাণকার্য আর সে সঙ্গে সেই এক ইট পরিমাণ খালি জায়গা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল। যাই হোক, সে ইটের খালি জায়গাটা আমিই পূরণ করলাম। আমার মাধ্যমেই সে প্রসাদের নির্মাণকার্য চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে গেছে এবং আমার দ্বারা রাসুলের আগমনও শেষ হয়ে গেছে।"[৩]

পূর্ব পৃষ্ঠার উদ্ধৃত এই গভীর তত্ত্বমূলক বাণীটির বিশ্লেষণ আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করতে চেষ্টা করব এবং বিশ্বের খ্যাতি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করব।

যে কোন সৃষ্টিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে হ'লে বহু পূর্ব হ'তেই এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করতে হয়। একটা মনোরম প্রাসাদ তৈরি করবার পূর্বে বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারদের সমাবেশে একটা পরিকল্পনা নক্‌সা তৈরি করতে হয়। এ নক্‌সার মধ্যে থাকে প্রাসাদের অবস্থিতি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ইত্যাদি। এরপর প্রয়োজন পড়ে তার বিস্তারিত কার্যবিবরণীর একটা তালিকা যাকে ইংরাজীতে schedule of work বলে। এ নক্‌সার সঙ্গে schedule of work-এর পুরাপরি সামঞ্জস্য থাকতে হয়। তবেই মাল-মসলা (materials), কর্মীর সংখ্যা, টাকার অঙ্ক এবং সময়ের একটা পূর্ণ ধারণা করা যায়। প্রধান কর্মকর্তার দ্বারা প্লানটি অনুমোদন করার পর Estimate Sanction দেওয়া হয়। তারপর যে জায়গায় প্রসাদটির ভিত্তি রচনা করা হবে সেই জায়গার অবস্থান, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রভৃতি তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করার পর কাজ শুরু করা হয়। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর তালিকা অনুযায়ী কার্যটি সুসম্পন্ন হ'লে তবেই বলা চলে এটা নিখুঁত। এর মাঝে যদি সামান্যতম ত্রুটিও থেকে যায় তবে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং কাজটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর নয় বলে ঘোষণা করা হয়।

এ-বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে যে ঠিক এমনি পরিকল্পনাই করা হ'য়েছিল এ বিষয়ে কোন দ্বি-মত থাকবার কথা নয়। কেননা পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ হয় না এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হয়। সামান্য একটা মাত্র প্রসাদের নির্মান কার্যের জন্য যদি অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও রাজমিস্ত্রির প্রয়োজন পড়ে তবে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পশ্চাতেও যে মহাপরিকল্পকের সুচিন্তা ছিল তা বিশ্বাস করতেই হবে। আল্লাহর বাণী কোরআনেও একথা মেলে–

"এবং যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমি এই পৃথিবীতে এজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব, তাহারা বলিয়াছিল– তুমি কি ইহাতে এমন সৃষ্টি করিবে যে তাহারা তন্মধ্যে অশান্তি উৎপাদন করিবে এবং শোণিতপাত করিবে? এবং আমরাই ত তোমার প্রশংসা কীর্তন করিতেছি এবং তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি; তিনি বলিয়াছিলেন– তোমরা যাহা অবগত নহ, নিশ্চয়ই আমি তাহা পরিজ্ঞাত আছি।"[১]

(২ঃ৩০)

৩ – সহীহ বুখারী আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁ কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২৮১।
১ –সূরা বকর–আয়াত ৩০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ছিল এ কথা আমরা বুঝতে অক্ষম, কেননা মহান আল্লাহর এ উদ্দেশ্য তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেই ছিল পরিব্যাপ্ত। আমাদের সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাপে যতটুকু আমরা বুঝতে পারি তা হলো এই যে আল্লাহ-পাক তাঁর স্বরূপ বিকাশ করতেই হয়ত পাঠিয়েছেন সৃষ্টিসেরা মানবকুল যারা তাঁকে বুঝতে সক্ষম– তাঁর মহিমা ও ক্ষমতা প্রকাশ করতে সক্ষম। ভ্রমর না থাকলে যেমন মধুর গুণাগুণ ফুঠে উঠত না, বাতাস না থাকলে যেমন ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ত না, তেমনি বুদ্ধিসেরা মানুষ না থাকলে আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে দেখবার, উপভোগ করবার ও তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবার প্রচেষ্টাও কেউ করত না। তাই তিনি মানুষ সৃষ্টি করার পরিকল্পনাতেই যে এ বিশ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনাতে হাত দিয়েছেন তা আমরা আপাততঃ ধারণা করতে পারি।

কোরআন ও ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে হযরত আদমকে (আঃ) মানুষ হিসাবে আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। এই মানুষই সর্ব জীবের প্রতিনিধি। ফেরেশতার উপরেও এ মানুষের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই আদমকে (আঃ) সেজদা করতে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবীর জন্ম হয় নি এবং হবেও না। কেননা তিনি তাঁর বিদায় হজ্বের বানীতে ঘোষণা করেছেন,–

"নিশ্চয় জানিও আমার পর আর কেহই নবী নাই। আমিই শেষ নবী। যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এই সকল বাণী পৌছাইয়া দিও।"[১]

যিনি সর্বপ্রথম এ পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন তিনিই আমাদের আদি পিতা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা দ্বিধাহীন চিত্তেই এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু রাসুলুল্লাহর (দঃ) বানী হ'তে দেখতে পাই যে আদম (আঃ) যদিও সর্বপ্রথম মানুষ হিসাবে এ পৃথিবীতে আগমন ক'রেছেন তবুও তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি নন। কেননা রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর বাণী তা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন,–

"আলেমতু মা ফি ছামাওয়াতে ওয়াল্ আর্‌দে বিন্ কাব্‌লে আদামা খামছিনা ছানা।" অর্থাৎ–

"আমি শিখেছি যা কিছু আসমান জমিন সমূহে আছে আদম সৃষ্টির পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে।"[২]

এ বিষয়ে হয়ত কারোরই আর সন্দেহ থাকতে পারে না যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সৃষ্টি আদম সৃষ্টির বহু বৎসর পূর্বে হয়েছে। কেননা তাঁর শিক্ষাই সমাপ্ত হ'য়েছে আদম সৃষ্টির পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। আরও একটি হাদিস এ সাক্ষ্য বহন করে। হাদিসটি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

"আবু হোরায়রা বলিতেছেন– লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসুল– আল্লাহ আপনাকে কখন নবুয়ত দান করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর করিলেন, 'আদম যখন রুহ ও দেহের মধ্যবর্তী ছিলেন' অর্থাৎ আদমের যখন সৃষ্টিই হয় নাই।"[১]

---

১ –হাদিস, সংগৃহীত, 'বিশ্বনবী'–বিদায় হজ্ব।
২ –হাদিস, সংগৃহীত, 'বিশ্বনবী'–গোলাম মোস্তফা।
১ –হাদিস, সংগৃহীত, বিশ্বনবী ২য় খণ্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা।

এ হাদিসটি হ'তে পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে যে আদম (আঃ) সৃষ্টির অনেক পূর্বেই তিনি নবুয়ত পেয়েছেন। যে মহান পুরুষের নবুয়ত প্রাপ্তি আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বেই হ'য়েছে তাঁর সৃষ্টি যে কতকাল পূর্বে হ'য়েছিল এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ মহান সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যে এ মহাবিশ্বের পরিকল্পনা নেওয়া হ'য়েছিল এ কথা স্বীকার করতে হয়ত কারো মনেই আর দ্বিধা থাকবে না। আর থাকবেই বা কি করে? আল্লাহ-পাক নিজেই ত হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে অনেক সাক্ষ্য দিয়েছেন।

যখন এটা প্রমাণিত হ'লো যে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও আদম সৃষ্টির পশ্চাতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-র সৃষ্টিই ছিল উদ্দেশ্য তখন আদম সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ের যত মহাপুরুষের সৃষ্টিই হোক না কেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে কেউ পারে না। কেননা আদম (আঃ) থেকে তাঁদের সৃষ্টি শুরু হ'য়েছিল। আর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সৃষ্টির পর থেকেই হ'য়েছিল বিশ্বসৃষ্টি ও আদমের সৃষ্টি। এ কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণীতে–

"আউয়ালো মা খালাকাল্লাহু নূরী।"[২]

অর্থাৎ, "সর্বপ্রথম আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা আমার নূর।"

নিজের শ্রেষ্ঠত্বের এমন প্রমাণ এবং ঘোষনা কেউ কি দিতে পেরেছে? পারে নাই এবং পারবেও না। কেননা তারা জানে যে হযরত মুহাম্মদের নূর থেকেই হ'য়েছে তাঁদের সৃষ্টি। ছেলে যেমন মায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারে না, তেমনি কোন মানুষ বা কোন পয়গম্বরই হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন না। তাই তিনি প্রাসাদ সৃষ্টির সঙ্গে নিজেকে তুলনা ক'রে বলেছেন,

"আমার মাধ্যমেই সে প্রসাদের নির্মাণ কার্য চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে গেছে এবং আমার দ্বারা রাসূলের আগমনও শেষ হয়ে গেছে।"

"আমি পয়গম্বরদের নেতা'–রাসুলুল্লাহর (দঃ) এ বাণীও প্রমাণ করে যে তিনিই ছিলেন এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একটা জাতির মুক্তি ও উদ্ধার সাধন করতে যুগে যুগেই এক একজন নবীর আগমন হয়েছে। ইতিহাস ও আল্লাহর বাণী এ সাক্ষ্য বহন করে। যে দেশ বা যে জাতির জন্য কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, সে দেশ ও সে জাতির শীর্ষপ্রান্তে থাকে সে মহাপুরুষের আসন। কালচক্রে যে সব মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। (তাঁর বাণী এই সাক্ষ্য দেয়)। তা'হলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সমগ্র দেশের সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বেই ছিল তাঁর আসন। তাই তাঁর পূর্বে কোন নবী বা পয়গম্বরই ঘোষণা ক'রে যান নি যে তিনি পয়গম্বরদের নেতা ও শেষ নবী। সবাই ছিলেন এ মহানবীর আগমনের প্রতীক্ষায়। শুধু এ কথা বলেই আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে চাই না বা 'জগৎগুরু' বলে আখ্যায়িত করতে চাই না। আমরা চাই এ মহাপুরুষের বাণীর উপর নির্ভর করেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে।

আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষগণ সবাই সম্মানিত ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণ

---

২ –হাদিস, সংগৃহীত, 'বিশ্বনবী', ২য় খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানবজাতির বহু উর্ধ্বে তাঁদের আসন। সবাই ছিলেন আল্লাহর অতি নিকটতম এবং প্রিয়। তাই তাঁদের জীবনের উপর ঘাত এবং প্রতিঘাত ঝঞ্ঝার মত অবিরাম বয়ে চলেছে। কাউকে মাছের পেটে, কাউকে জলন্ত অগ্নি মাঝে, কাউকে কূপের ঘোর অন্ধকারে, কাউকে বা গলিত অস্পৃশ্য রোগের নিপীড়নে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কষ্টি পাথরে তাঁদের ঈমানকে যাচাই ক'রেই মূঢ় মানব সমাজে পাঠানো হয়েছে তাদের সরল সুপথ দেখাতে। জীবন দিয়েই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন ক'রে গেছেন। তাই যুগে যুগেই তাঁরা যেমন অমর হ'য়ে থাকবেন, তেমনি আল্লাহর কাছেও মর্যাদা পাবেন।

একটি পরিবারের প্রতিটি ছেলেই যদি সুশিক্ষিত, ধার্মিক ও জ্ঞানী হয় তবে সবাই আদরণীয় ও বরণীয় হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। তবু তাদের মধ্যে যে ছেলেটি বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী তার আসন সবার উপরে থাকে। সমাজ যেমন তাকে সে আসনে সমাসীন করে, পরিবারের ভাই বোনেরাও তাকে তেমনি ভালবাসা, স্নেহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর ক'রেই সে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠিত হবার মূলে কারোরই কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকে না। এ ছাড়া যারা তার বিশিষ্ঠ গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করতে চায় তাদেরও কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না। তদ্রূপ এই বিশ্ব পরিবারের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) বিশিষ্ট গুণে মুগ্ধ হ'য়েই পীর, পয়গম্বর, ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির, ধনী-নির্ধন, রাজা, মহারাজা, স্বধর্মী, বিধর্মী সবাই একবাক্যে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে আখ্যায়িত ক'রেছেন। অনেকে যারা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে তাঁকে অসম্মানিত করতে প্রয়াস পেয়েছে তাদের পরিণতি কেমন হ'য়েছে ইতিহাস খুঁজলে তা দেখা যায়। আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে যুগ যুগের জন্য যে জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তা পরবর্তী বংশধরগণ চিরদিন মনে রাখবে। আজও যারা রাসুলুল্লাহর (দঃ) জীবন আদর্শকে অবাস্তব, কাল্পনিক ও তত্ত্বোপযোগী নয় বলে চারিদিক মিথ্যা প্রচারে কলুষিত ক'রে তুলছে হয়ত সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন তারা এ মহাপুরুষের বাণীর সারবত্তা বুঝতে পেরে নিজেদের বুকেই নিজেরা করাঘাত করবে। এ বাণীর ক্ষমতা এত অধিক, এ বাণীর আকর্ষণ এত বেশি, এ বাণীর র্মম এত প্রাণস্পর্শী যে- জীবজন্তু, জ্বীন-পরী, মানব-দানব, আকাশ-বাতাস মুগ্ধ হ'তে বাধ্য। তাঁর মহাবাণীর মাঝে কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন অবাঞ্ছিত কথা নেই, কোন প্রবঞ্চনার চিহ্ন নেই। তাই যুগ যুগের মনীষীরা তাঁর কথামালা গেঁথেই চলেছেন। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ মিলিতভাবে তাঁর জীবনের যে আলেখ্য রেখে গেছেন এবং রাখছেন কোন মহাপুরুষের জীবনের উপরেই তা এমনভাবে রাখা হয় নি। যে-ই লিখতে গিয়েছে সে-ই নিজকে ধন্য মনে ক'রেছে। যে তাঁর বাণী শুনেছে সে-ই তাঁকে পাবার নেশায় পাগল হ'য়ে উঠেছে। যে তাঁকে স্মরণ ক'রেছে সে-ই তন্ময় হ'য়ে নিভৃত জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। সাধক তার সাধনার নেশায় মত্ত হ'য়েছে, নারী তার মাতৃত্বের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে সেই নামেরই তসবিহ ধ'রেছে। প্রেমিক তার প্রেমের বাঁধন টুটে ফেলে উন্মাদ হ'য়ে নির্জন প্রান্তরে ঠাঁই নিয়েছে। ধনী তার ধনের মোহ পরিত্যাগ ক'রে সেই রত্নের সন্ধানেই প্রসাদ হ'তে বের হ'য়েছে।

এতটুকু আবেগ, অনুভূতি ও জ্ঞান আমি আজও পাই নি। তাই তাঁর নামে পাগল হ'য়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের পথ ধরি নি। ধরেছি এক ভাঙ্গা কলম। জানি না এ কলম তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে পারবে কি না।

ধারণার বশবর্তী হ'য়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াকে আমি পাগলামীর সামিল ব'লেই মনে করি। উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমেই রাসুলুল্লাহর (দঃ) জীবন চরিত আলোচনা করতে বসেছি। তাই যতটুকু সম্ভব প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করব। বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন মনীষীর জন্ম হ'য়েছিল। তাঁরা নিজের দেশ ও জাতিকে অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন- এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি। কোরআনও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

'নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম- অনন্তর সে বলিয়াছিল- হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর- তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই।" [সূরা আরাফ-আয়াত ৫৯]

"এবং আ'দের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হুদ সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর- তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। অতএব তোমরা কি সংযত হইবে না?" [সূরা আরাফ-আয়াত ৬৫]

"এবং সমুদদের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।" [সূরা আরাফ-আয়াত ৭৩]

"এবং মাদায়েনের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়াইব- সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়-তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই।" [সূরা আরাফ-আয়াত ৮৫]

"এবং যখন আমি তোমা হইতে ইসরাইল বংশীয়গণকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম।" [সূরা মায়েদা-আয়াত ১১০ এর একাংশ]

"এবং তিনি তাঁহাকে (হযরত ঈসা আঃ) ইসরাইল বংশীয়দের জন্য পয়গম্বর করিলেন।" [সূরা আল-ইমরান-৪৯ আয়াতের প্রথমাংশ]

ইহুদী খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা সবাই সগৌরবে নিজেদের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধারণা ক'রে থাকে এবং ধর্মের ব্যাপারে একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পায়। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব-কোলাহলের সৃষ্টি হয়। ফলে অগনিত লোক অনর্থক প্রাণ হারায়। ইহা দেখেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে- হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে ধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিচ্ছেন সেটাই সত্যধর্ম। এই সত্যধর্ম পূর্বের সমস্ত ধর্মের সারবত্তা নিয়েই তার ভিত্তিমূল রচনা করেছে। আল্লাহ নিজেই এ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে পূর্বের বিভেদ ও কলহের অবসান ঘটিয়েছেন। যে ধর্ম সত্যধর্ম বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং অন্য ধর্মের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেছে- সে ধর্মের প্রচারককে নিঃসন্দেহে অন্য ধর্ম-প্রচারকদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেওয়া চলে। কেননা আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

"মুহাম্মদ সকল প্রকার কলহ ও মতভেদের চরম মীমাংসাকারী।"

[কোরআন, সূরা নেসা–আয়াত ৫৯]

আল্লাহর এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষনার পরেও কি কোন জাতির সন্দেহ থাকতে পারে যে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দাঃ) পূর্বোক্ত পয়গম্বরদের শীর্ষে ছিলেন না?

আল্লাহকে অবিশ্বাস ক'রে, আল্লাহর বাণীকে অশ্রদ্ধা ক'রে কোন জাতি কি টিকে আছে? ধর্মে বিরোধিতা থাকতে পারে, মতভেদের গরমিল হতে পারে, বিদ্যাবুদ্ধির পার্থক্য থাকতে পারে, চিন্তাধারায় ব্যবধান হতে পারে, জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও রেষারেষি থাকতে পারে কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে সন্দেহ ও তাঁর বানীর প্রতি কারো কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। যাদের থাকে তারাই মোশরেক তারাই কলহকারী। তারাই বিভেদকারী ও সর্বনাশকারী। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ ভয়াবহ অবস্থার পরিণতিও ঘোষনা করেছেন–

"এবং যদি তুমি তাহাদের দেখিতে যখন তাহাদিগকে দাঁড় করান হইবে আগুনের ভিতর। যখন তাহারা বলিবে "হায়! হায়! আমাদের যদি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠান হইত তবে আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসকল অমান্য করিতাম না এবং মোমেনদের দলভুক্ত হইতাম।"

এরূপ অসংখ্য বাণীর মাধ্যমেই আল্লাহ-পাক অবিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই চলুন, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, মুসলিম, অমুসলিম সবাই আমরা সেই অমোঘ বাণীর উপর আস্থা রেখেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপর আবার গবেষণা করি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন,

"আমি বিচারের দিন জান্নাতের দুয়ারে আসিয়া খুলিতে চাহিলে প্রহরী বলিবে, 'তুমি কে?' আমি বলিব, 'মুহাম্মদ'। সে বলিবে আপনার পূর্বে ইহা কাহাকেও খুলিয়া না দিতে আমার উপর আদেশ হইয়াছে।"[১]

'জান্নাত' অর্থ চিরস্থায়ী পরম সুখের আবাসস্থল। বিভিন্ন ভাষায় একে বেহেশত, স্বর্গ, Heaven ইত্যাদি বলা হয়। পুণ্যবান লোকদের পুরস্কারের নিয়ামত এ বেহেশত। এ বেহেশতের অধিকারী তারাই যারা এ নশ্বর পৃথিবী হ'তে আল্লাহ ও রাসুলকে খুশি ক'রে পরকালের বিচারে মুক্তি সনদ পায়। যুগে যুগে যে সব মহাপুরুষ জন্মলাভ ক'রেছেন, মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে নিজেদের জীবন, যৌবন, সুখ ও শান্তি বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরাই হবেন প্রথম সারির অধিকারী। এ অধিকারীর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বেহেশতের দরজা খুলবেন, প্রথম যিনি পা বাড়াবেন, যাঁকে সর্বাধিক পুন্যাত্মা বলে আল্লাহ-পাক ঘোষণা করবেন তিনিই হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ গৌরব, এ সম্মান শুধু তাঁরই জন্য লিপিবদ্ধ, অন্য কারো জন্যই নয়। এজন্যই আল্লাহ-পাক বেহেশতের প্রহরীকে এমন কড়া নির্দেশ দান করেছেন যেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ভিন্ন অন্য কেউ প্রথম এ বাঁধন খুলে বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারে। এ মহাসম্মানীয় অতিথি নিজেও যেমন মহাড়ম্বর ও মহাসম্মানের সঙ্গে বেহেশতে ঢুকবেন তেমনি তাঁর প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু ও প্রিয় উম্মতদেরও

[১] –মেশকাত শরীফ।

বেহেশতে ঢুকাবেন, এত অধিক সংখ্যক উম্মতকে বেহেশতে ঢুকাবার 'পাসপোর্ট' কেউ আল্লাহর নিকট হ'তে নিতে পারবেন না। এ কথার সাক্ষ্যও দিয়েছেন এ মহান গুরু তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে। তিনি বলেছেন,

"বিচারের দিন নবীদের, উম্মতদের সংখ্যার ভিতর আমার উম্মতই অত্যধিক হইবে এবং যাহারা জান্নাতের দুয়ার নাড়া দেবে তাহাদের ভিতর আমিই সর্বপ্রথম হইব।"[১]

শাফায়াতকারী হিসাবে, মহাসম্মানিত পয়গম্বর হিসাবে নবীগণের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে তাঁর মর্যাদা যে সেদিন কিরূপ হবে সে পরিচয়টুকুও আমরা পাই তারই আর কয়েকটা বাণীতে, যা নিম্নরূপ। তিনি বলেছেন,

"আমি জান্নাতে সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী হইব। নবীগণের ভিতর আমাকেই সর্বাধিক লোক 'তছদিক' করিবে। নবীদের ভিতর এমন এক নবী ছিলেন তাহাকে এক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই তছদিক করিবে না।" [মোসলেম]

"নবীদের ভিতর এমন কোন নবী ছিলেন না যাহাকে মোজেজার কিছু দেওয়া হয় নাই। মানব তাঁহার ন্যায় অন্য কিছুই এত বিশ্বাস করে নাই। আমার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে— তাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি কি বিচারের দিন আমার অনুবর্তীগণের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি হইবে।" [বোখারী, মোসলেম]

হযরত এবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে যে রাসুল করিমের কয়েকজন সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বাহির হইয়া তাহাদের নিকটবর্তী হইলে তাহাদিগকে কথোপকথন করিতে দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'আল্লাহ ইব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন'। অন্য একজন বলিলেন—'আল্লাহ মুসার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন'। অন্যজন বলিলেন, 'ঈসা আল্লাহর বাক্য এবং তাঁহার রুহ'। অন্যজন বলিলেন, 'আল্লাহ আদমকে পছন্দ করিয়াছেন'। তারপর রাসুল করিম তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন,

'আমি তোমাদের কথোপকথন শুনিয়াছি। তোমরা যে বলিয়াছ-ইব্রাহিম আল্লাহর বন্ধু ছিলেন—তিনি সত্যই তাঁহার বন্ধু ছিলেন। মুসা আল্লাহর সহিত কথোপকথনকারী ছিলেন—তিনি সত্যই তাহা ছিলেন। আদমকে আল্লাহ পছন্দ করিয়াছেন—তিনি সত্যই তাহা ছিলেন। সতর্ক হও, আমি আল্লাহর হাবিব (অন্তরঙ্গ বন্ধু)—তাহাতে কোন অহঙ্কার নাই। আমি বিচারের দিন প্রশংসার নিশান বহন করিব এবং তাহার তলে আদম ও অন্যান্য নবীগণ থাকিবেন, তাহাতে কোন অহঙ্কার নাই। আমিই বিচারের দিন প্রথম শাফায়ত করিব এবং আমার শাফায়াতই প্রথম গৃহীত হইবে, ইহাতে অহঙ্কার নাই। আমিই প্রথম জান্নাতের দুয়ারে নাড়া দেব, তারপর আল্লাহ আমার জন্য ইহা খুলিয়া দিবেন এবং আমাকে তাহাতে দাখিল করিবেন। আমার সহিত মোমেন দরিদ্রগণ থাকিবে, ইহাতে অহঙ্কার নাই। **পূর্বাপর সকলের ভিতর আমিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত—ইহাতে অহঙ্কার নাই।**" [তিরমিজী]

[১] –মেশকাত শরীফ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ আমার জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব ও পশ্চিম আমি দেখিয়াছি। দুনিয়ার যাহা আমার নিকট সংকীর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাদের দেশে আমার উম্মতগণ শীঘ্রই পৌছিবে। লাল এবং সাদা এই দুইটি ধনই আমাকে দেওয়া হইয়াছে। [অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য]। আমার প্রভুকে আমার উম্মতের জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছি তিনি যেন সাধারণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস না করেন—নিজেদের লোক ব্যতীত তাহাদের শত্রু যেন তাহাদের উপর জয়লাভ না করে এবং তাহাদের সম্পত্তি বৈধ মনে না করে। আমার প্রভু বলিয়াছেন—' হে মুহাম্মদ। যখন আমার আদেশ হয়, তাহার রদ নাই। আমি তোমার উম্মতদিগকে এই দিয়াছি যে—তাহাদিগকে সাধারণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করিব না—তাহাদের নিজ লোক ব্যতীত তাহাদের শত্রু তাহাদের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহাদের সম্পত্তি তাহারা ইহার পার্শ্বে একত্রিভূত হইলেও লইতে পারিবে না যে পর্যন্ত তাহারা পরস্পরকে ধ্বংস না করে এবং পরস্পর পরস্পরকে বন্দী না করে।" [মোসলেম]

শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান একটি দুটি নয়, শত শত এমন প্রমাণ ইতিপূর্বে কোন নবী-পয়গম্বরই দিতে পারেন নি। নবী প্রতিনিধিরূপে, মানব সম্প্রদায়ের নেতারূপে, সুসংবাদদাতা রূপে, প্রশংসার ধ্বজাধারী রূপে, সর্বপ্রথম জান্নাতের মনোরম পোশাক-পরিহিত সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী রূপে যে মহামানব সেই মহাবিচারের দিন নিজ ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দেবেন তিনিই হলেন বিশ্বের নেতা, মানবজাতির নেতা, কুল মখলুকের নেতা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেছেন,

'যখন মানবগণ পুনরুত্থান করিবে—আমিই প্রথম বাহির হইব। যখন তাহারা প্রতিনিধিরূপে যাইবে আমিই তাহাদের নেতা হইব। যখন তাহারা নীরব থাকিবে—আমিই তাহাদের মুখপাত্র হইব। যখন তাহারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে—আমিই তাহাদের জন্য শাফায়াত করিব। যখন তাহারা হতাশ হইবে—আমিই তাহাদিগকে সুসংবাদ দিব। সম্মান এবং কুঞ্জী আমার হাতেই থাকিবে। প্রশংসার ধ্বজা আমার হাতেই থাকিবে। আমার প্রভুর নিকট আদম সন্তানগণের ভিতর আমিই বহু সম্মানিত হইব। আমার চতুর্দিকে এক হাজার চাকর-নফর থাকিবে। তাহারা যেন গুপ্ত মুক্তা এবং বিক্ষিপ্ত মণি।" [তিরমিজী]

"জান্নাতের পোশাক হইতে আমাকে একটি পোশাক দেওয়া হইবে। তারপর আমি আরশের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইব। সৃষ্টির ভিতর এমন কেহ থাকিবে না যে আমি ব্যতীত তাহার অধিকারী হইবে।" [তিরমিজী]

"আল্লাহর নিকট আমাকে 'নবীদের মোহর' বলিয়া লেখা হইয়াছে—তখন আদম ধূলার সহিত মিশ্রিত ছিলেন। আমার ব্যাপার সম্বন্ধে তোমাদিগকে খবর দিতেছি—ইব্রাহিমের দোয়া, ঈসার সুসংবাদ, এবং আমার মাতার স্বপ্ন। তিনি গর্ভবতী হইলে ইহা দেখিয়াছিলেন যে তাহার নিকট হইতে এমন একটি নূর বাহির হইয়া আসিয়াছে যাহা সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত করিয়াছে।" [আহমদ]

"আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'অছিলা' চাও।" তাহারা বলিল—হে আল্লাহর রাসুল! 'অছিলা' কি? তিনি বলিলেন, "জান্নাতের ভিতর সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। একটি লোক ব্যতীত অন্য কেহই তাহার অধিকারী হইতে পারিবে না। আমি আশা করি আমিই সেই ব্যক্তি হইব।" [তিরমিজী]

এই মহান গুরুকে যে ব্যক্তি ভক্তিভরে প্রাণের মণিকোঠায় রেখেছে, প্রাণের আবেগে তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছে, মুক্তির মাধ্যম হিসাবে অশ্রুর বন্যায় তাঁর উপর 'দরুদে অছিলা' পড়েছে, সেই ব্যক্তিই তাঁর বন্ধু, প্রকৃত উম্মত—বেহেশতের অধিকারী। রাসুলের (দঃ) শাফায়াত সে ব্যক্তির জন্য অবধারিত। কি সুন্দর ভাবেই না সে কথা তিনি প্রকাশ করেছেন—

"নবীগণ হইতে প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকিবে। আমার বন্ধু আমার পূর্ব-পুরুষ এবং আমার প্রভুর বন্ধু। তারপর তিনি পাঠ করিলেন, ইব্রাহিমের অতি নিকট ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নবী এবং বিশ্বাসীগণ। আল্লাহ্ মোমেনদের বন্ধু।" [তিরমিজী]

চলুন আমরা আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে স্বজাতি, বিজাতি, সাদা, কাল, বর্ণ-বৈষম্য দূরে ঠেলে নিজেদের মুক্তির পথ রচনা করি ও হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) অছিলা করে কেঁদে কেঁদে বলি—

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদেন অসিলাতি ইলায়কা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লেম" অর্থাৎ

'হে আল্লাহ্! তোমার দিকে আমার মাধ্যম, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর এবং তাঁর বংশাবলীর উপর রহমত বর্ষণ কর আর সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর।'

[যারা কোন পীরের মাধ্যমে কলব এর ছবক নিয়েছেন তাঁরা উপরে বর্ণিত 'দরুদে অছিলা' নিম্নোক্তভাবে নিয়ত করে এশার নামাযের পর ৫০০ বার পাঠ করবেন। স্বপ্নে অথবা মোরাকাবার মধ্যে হযরত (দঃ)-এর দর্শন মিলিবে।]

নিয়ত—আমি আমার কলব এর প্রতি মনোনিবেশ করছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলব এর অছিলায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কলব এর সঙ্গে যুক্ত হোক। তাঁর কলব হ'তে মহব্বত, জিয়ারত ও তাওয়াজ্জুর ফায়েজ আমার কলবে আসুক।[ইয়া আল্লাহ্]

পাঠকবৃন্দ মাত্রই এ দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। ভুল করবেন না। হয়ত এ দরুদের মাধ্যমেই পাপী হ'য়েও মুক্তি পেতে পারেন। আপনি তাঁর উপর শান্তির বাণী পাঠালে শুধু তিনিই খুশি হবেন না, আল্লাহ্-পাকও খুশি হবেন। রাসুলের বাণী সে কথারও সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন—

'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গুণা মাফ হয়ে যায় আর দশটি সম্মান লাভ হয় এ দরুদ পাঠ আল্লাহর হুকুম। এতে হযরত (দঃ)-এর মহব্বত বৃদ্ধি পায়—বিপদ কেটে যায়, উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং শাফায়াত পাবার পথ পরিষ্কার হয়। তিনিই যে নবীকুল শিরোমণি—নবীদের মুখপাত্র ও শাফায়াতকারী, এ ঘোষণা তিনি বারবার এই বলে দিয়েছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"যখন বিচারের দিন আসিবে আমি নবীদের নেতা ও মুখপাত্র এবং শাফায়াতকারী হইব—ইহাতে অহঙ্কার নাই।" [তিরমিজী]

"আমার পাঁচ নাম আমি মুহাম্মদ ও আহম্মদ, আমি মাহী যাহার যোগে খোদা মুছিয়া দেন কুফর, আমি হাশির যাহার পিছনে খোদা সকলকে একত্রিত করিবেন এবং আমি "আকিব" (শেষ নবী)।"[১]

'মুহাম্মদ'—অর্থ চরম প্রশংসিত। সমগ্র সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে যিনি প্রশংসিত তিনিই ত চরম প্রশংসিত। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কয়েকটি বিশেষ নামের মাধ্যমে। মুহাম্মদ নামের সার্থকতা তাঁর কতটুকু হ'য়েছিল এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। তিনি সত্যই মুহাম্মদ (দঃ) নামের যোগ্য ছিলেন কিনা—চরম প্রশংসা তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল কিনা—তিনি সমগ্র সৃষ্ট জীবের প্রশংসাভাজন হ'য়েছিলেন কিনা—আমরা দেখে নিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করব ও তাঁর বাণীর সারবত্তা যাচাই করব।

হযরত (দঃ)-এর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে শৈশবকালেই তিনি 'আল্-আমিন'—অর্থাৎ বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রধান প্রধান শত্রুরাও তাঁকে 'আল্-আমিন' বলে ডাকতেন। সেই চরম মিথ্যার যুগে, সেই চরম অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে যিনি বিশ্বাসী খেতাব লাভ করেছিলেন তিনিই কি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী মহামানব নন? আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওৎবা অলিদের মত অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীরা যখন তাঁকে বিশ্বাসী ব'লে স্বীকার করতেন তখন কোন অবিশ্বাসী তাঁকে মিথ্যাবাদী ব'লে ছোট করতে পারে? মহত্ত্বের বিচারের প্রথম মাপকাঠিতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ল। শৈশব জীবনে এমন মহত্ত্বের খেতাব ইতিপূর্বে কোন নবীই পান নি।

হযরত (দঃ)-এর পূর্বে যে সমস্ত নবীর জন্ম হ'য়েছিল তাঁদের মধ্যে কেউ ধর্ম-কর্ম, ইহকাল-পরকাল, সমাজ-গোষ্ঠী-দেশ ও জাতির সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনে তা সম্ভব হ'য়েছিল। একটি গোটা মানব জাতির আদর্শরূপে, বিভিন্ন মানব সমাজের পথ-প্রদর্শক রূপে তিনি ছিলেন সর্বোপরি—তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন ইতিপূর্বে কেউ দাবী করতে পারেন নি। কেননা পূর্বের নবীগণ তাঁদের নিজস্ব দেশ ও সমাজের জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সংসার ধর্ম পালন করে, অভাব, অনটন, দুঃখ ও দারিদ্র্যকে বরণ করে এমন কঠিন সংগ্রামে কেউ ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হতে পারেন নি। বুদ্ধদেব সংসারের মায়াজালে বেষ্টিত হবেন না বলে এক অন্ধকার রাতে প্রিয়তমা পত্নী গোপাকে ছেড়ে আত্মগোপন করলেন। হযরত ঈসা (আঃ) নারীর সংস্পর্শকে পরিহার করে চিরকুমার জীবন যাপন করলেন। সংসারের মায়া, মমতা ও নিষ্ঠুর জ্বালা তিনি কোন দিনই উপলব্ধি করেন নি। বীরের বেশে শত্রুকে ভূপাতিত করে সত্যের ঝাণ্ডা ইতিপূর্বে কেউ উড়াতে পারেন নি। চিরদিনের দলিত, মথিত ও লাঞ্ছিত নারী সমাজের ত্রাণকর্তা রূপে কোন নবীই ইতিপূর্বে আখ্যায়িত হন নি। রাষ্ট্রগঠন, সমাজগঠন, ধর্মগঠন ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে

১ — সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮০। তর্জমা আলহাজ্ব আব্দুর রহমান খাঁ।

বিশ্বের বুকে এমন নজির আর কোন নবীই ইতিপূর্বে দেখাতে পারেন নি। জ্ঞানের ভাণ্ডার সুপ্রকাশ করে, অন্ধ যুগে আলোর-রাজ্য স্থাপন করবার সৌভাগ্য কারো হয় নি। দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, উদারতা, মহানুভবতা দিয়ে মনোরাজ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারেন নি। শৃঙ্খলিত দাস-দাসীকে মুক্ত করে প্রেমের ডোরে বেঁধে দেবার সাহস কোন নবীই অর্জন করতে পারেন নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন সর্বস্তরের অবহেলিত, নির্যাতিত, নরনারী, দরিদ্র, কুলী-মজুর, কামার-তাঁতী, দেশী-বিদেশী ও আপন প্রতিবেশীদের নিকট থেকে। শুধু তাই নয়, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সাধু-সন্ন্যাসী, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, তাপস-তাপসী প্রতিটি স্তরের মানুষের নিকট থেকে। এ সব অবাস্তব নয়। উল্লিখিত প্রতিটি শব্দের পিছনেই আছে এক একটি রহস্যময় ঘটনা যা জানা যায় তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে। যেমন—তিনি আপন দাস জায়েদকে মুক্ত করে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আবু সুফিয়ান, ওয়াশী, সাফ্ওয়ান, আব্দুল্লাহ-বিন-উবাই—যারা তাঁর প্রধান শত্রু ছিল তাদেরও তিনি ক্ষমা করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার পর সন্ধির মর্যাদা রক্ষার্থে আবু জন্দল ও ওৎবাকেও শত্রুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ন্যায় বিচারক ও সত্যবাদী হিসাবে প্রশংসা পেয়েছিলেন। হযরতকে (দঃ) কষ্ট দেবার জন্য যে বৃদ্ধা রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত সে বৃদ্ধাকে কয়েকদিন না দেখে অস্থির হয়ে তাকে দেখতে তারই বাড়িতে গমন করেছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শত্রুর নিকট থেকেও এ মহামানব প্রশংসিত হয়েছিলেন। লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, ঘৃণিত ও অপমানিত হলে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। নবী পয়গম্বরগণ যুগে যুগে মানুষকে সৎপথে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হন। অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ মানুষ এ নবী পয়গম্বরদের অপমান করতে ছাড়ে নি। সর্বদেশের সর্ব যুগের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। অপমানের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যায়, অরাজকতা যখন চরম সীমায় পৌঁছে, তখন নবীগণ পর্যন্ত রুষ্ট হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের শাস্তি দিতে প্রার্থনা করেন। যেমন—হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর কাছে হাত তুলে অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারীদের শাস্তি দিতে বলেছেন—

"হে ঈশ্বর! তাহাদের দন্তসমূহ চূর্ণ কর, তাহাদিগকে অগাধ সলিলে নিমজ্জিত কর—তাহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর—তাহাদের প্রত্যেককে ধ্বংস কর, তাহাদের কাহারো প্রতি দয়া করিও না ... ...।" [জব্বুর—৫৯—৬ হতে ৮, ৫০—৫ হতে ১৩]

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কাফেরদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত হয়েও, নিজ মাতৃভূমি আরবের বুক থেকে বিতাড়িত হয়েও, ঘন ঘন অপমান, লজ্জা ও কঠোর ভাষা শ্রবণ করেও কাউকে অভিশাপ দেন নি বরং বলেছেন—"অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হই নি—প্রেরিত হয়েছি মানব জাতির কল্যাণকামীরূপে।"

ওহোদের যুদ্ধে যখন তিনি নির্মমভাবে অত্যাচারিত হন—তাঁর পবিত্র দন্ত শহীদ হয় তখনও তিনি এ অত্যাচারী কাফেরদের অভিশাপ দেন নি। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করেন নি বরং আল্লাহর কাছে হাত তুলে মুনাজাত করেছিলেন,

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হে আল্লাহ! তুমি তাদের ক্ষমা করো। এরা অবুঝ।"

এমন উদারতা, এমন মহান, এমন ক্ষমাশীল মহাপুরুষ যিনি ছিলেন তিনিই হলেন পয়গম্বর নেতা—হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এমন ত্যাগ, ক্ষমার, এমন আদর্শ জগতের বুকে আর কেউ দেখাতে পারেন নি। এ জন্যই তিনি প্রশংসিত চরম প্রশংসিত আখ্যা 'মুহাম্মদ' (দঃ) নাম নিয়ে বিশ্বের বুকে অমর হয়ে আছেন।

বারজন বিধবা নারীকে বিবাহ করে, যেমন, (১) খাদিজা, (২) সওদা, (৩) উম্মে সালমা, (৪) মায়মুনা, (৫) মেরী, (৬) রায়হানা, (৭) সাফিয়া, (৮) উম্মে হাবিবা, (৯) জয়নব, (১০) হাফসা, (১১) জওয়ায়েরা, (১২) জয়নব বিনতে খোজাইমা—হযরত নারী জাতির নিকট হতে এক যুগান্তকারী প্রশংসা লাভ করেছেন।

হাজেরা, মরিয়ম, গোপা, সীতা প্রভৃতি সতীসাধ্বী নারীরা যেখানে পূর্বের নবী ও মহাপুরুষদের দ্বারা নির্বাসিতা ও পরিত্যক্তা হয়েছিলেন, সেখানে জায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রী জয়নবকে বিবাহ করে তিনি কি অন্যান্য মহাপুরুষদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন নি। তিনি কি সমাজের এরূপ নির্বাসিতা ও পরিত্যক্তা নারী জাতির প্রশংসা অর্জন করেন নি?

সংগ্রাম, সাধনা, ধৈর্য, ঈমান, ত্যাগ, বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর দৃষ্টান্ত হযরত বিশ্বের বুকে যা রেখে গেছেন তা অতুলনীয়।

ইতিপূর্বে কোন সংগ্রামী পুরুষ, কোন সাধক, কোন ধৈর্যশীল মনীষী, কোন ঈমানদার, কোন ত্যাগী ও মহাবীর এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে নিজেকে অতুলনীয় ও অপরাজেয় বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। শাসকরূপে, রাষ্ট্রনায়করূপে ও বিজেতারূপে তিনি যে ইতিহাস রচনা করেছেন তার নজির মেলে না। সামান্য একজন রাখাল বালক এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দিক-দিগন্তে তাঁর ভূখণ্ড স্থাপন করবেন ও খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতি গঠন করবেন এটা কি কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা? এ গৌরব কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে জোটে নি। কোন মহামানব সমগ্র জাতির আদর্শ হয়ে এমন প্রশংসা অর্জন করতেও সমর্থ হন নি। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, হানিবল, আকবর কেউ এমন সুদৃঢ় রাজ্য স্থাপন করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের মহাসূত্র বিধিবদ্ধ করে চিরস্থায়ী করে দিতে পারেন নি। ধর্মের শাসন, আইনের শাসন ও সামাজিক শাসনকে এক সূত্রে গ্রথিত করে ইসলামী শাসন অর্থাৎ শান্তির শাসন দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারেন নি এবং যুগ যুগের অন্ধ কুসংস্কারের মাথায় কুঠারাঘাত হেনে ইহ পরকালের জন্যে এমন সুন্দর ব্যবস্থা দিতে পারেন নি। তাই তিনি প্রশংসিত যুগ-যুগের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে, সমাজের কাছে, ধর্মনেতাদের কাছে, বিশ্বমানবের কাছে।

শ্রমের মর্যাদা দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নিকট চিরদিন তিনি মাথার মুকুট হয়ে থাকবেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি রাখাল বালক হিসাবে মেষ পাল চরাতেন। মেষ পালকে আয়ত্বে আনা, এদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা, নিজ কড়া শাসনে এদের বশীভূত করার পিছনে ছিল বিরাট রহস্য। যাকে সারা বিশ্বের শাসন ভার হাতে নিতে হবে, সারা বিশ্বের সৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে, তাঁকে মেষপাল চরানোর মত কঠিন শাসন ভার

যে শৈশবেই নিতে হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। মেষপাল চরাতে গিয়ে তিনি যেমন কঠোরতা শিখেছিলেন, তেমনি দয়া, মায়া ও প্রেমের আকর্ষণেও আকর্ষিত হয়েছিলেন। জীবজন্তুকেও যে ভালবাসা দিয়ে বশ করা যায়, তাদেরও যে প্রাণ আছে, এরাও যে একই আল্লাহর সৃষ্টি এ সব জ্ঞান তিনি শৈশবেই অর্জন করেছিলেন। তাই নবী জীবনে জীবজন্তুর কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারেন নি। একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত মারতে নিষেধ করতেন—গাছের একটি পাতা অবৈধ ভাবে ছিড়তে মানা করতেন এবং বলতেন—

"প্রত্যেক পাতাই আল্লাহর গুণগান করে।"[১]

খাঁচার পাখিকে মুক্ত করে, শৃঙ্খলিত হরিণীকে আযাদ করে জীবজন্তুর নিকট হতেও তিনি প্রশংসিত হয়েছেন।

তরুলতার প্রতি মায়া, জীবদেহের প্রতি দয়া ও মানব সমাজের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি জয় করেছিলেন সবার মন। তাই প্রশংসিত ছিলেন সর্বস্তরে।

বিশ্বের শ্রমিক সমাজ, হযরত (দঃ)-এর নীতিকে মর্যাদা না দিয়ে পারেন না, কেননা ধনীদের প্রতি তিনি যেমন কঠোর উপদেশ দিয়ে গেছেন,

'শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ কর।'[২]

এদিকে আবার যাকাত প্রথা প্রবর্তন করে বিশ্ব সমাজে যেমন এক বিপ্লব আনেন তেমনি দুঃখী, এতিম ও গরীবের বাঁচার চিরস্থায়ী এক বন্দোবস্ত করেন। এরূপ বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা শ্রমিক ও গরীবদের জন্য দিয়ে পূর্বে কোন নবী-পয়গম্বর সবার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন কিনা জানি না।

হযরত (দঃ)-এর মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন মেলে তাঁর অন্য ধর্মের প্রতি উদারতায়। কোন ধর্মের মানুষকেই তিনি হেয় করেন নি। তাঁদের ধর্ম-কর্ম পালন করার এক অপূর্ব সুযোগ দিয়েছিলেন যা অন্য কোন মনীষীরা বা পয়গম্বর দিতে পারেন নি। 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে—আমার ধর্ম আমার কাছে'—কোরআনের এই বাণীকেই সার করে তিনি ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। বলপ্রয়োগ করে কোন ধর্মাবলম্বীকেই তিনি ইসলামে দীক্ষিত করেন নি। এছাড়া যখন অন্য কোন ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য আসতেন তখন সাদরে তাঁদের গ্রহণ করতেন। কথিত আছে যে একদা নজরানের এক খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদল যখন হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে দেখা করতে মদিনা আসে তখন তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মদিনার সেই পবিত্র মসজিদে। মুসলমানগণ যখন কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, খ্রীষ্টানদের দল একই মসজিদে পূর্বদিক হয়ে উপাসনা করতেন। পৌত্তলিক তায়েফবাসীদেরও তিনি এই মসজিদে স্থান দিয়েছিলেন। এ জন্যই বলেছি—দেশি, বিদেশি, স্বধর্মী, বিধর্মী, প্রতিটি মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন মহান, তিনি ছিলেন অত্যধিক প্রশংসিত।

১— মুহাম্মদ আজাহার উদ্দিন কৃত 'হাদিসের আলো'। ২য় খণ্ড—৬৯ পৃঃ।
২—মুহাম্মদ আজাহার উদ্দিন কৃত 'হাদিসের আলো'। ২য় খণ্ড—৬৯ পৃঃ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জড়-চেতন, আকাশ-বাতাস, ভূতল-সাগর যা কিছু আছে সবই ছিল হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অনুরক্ত ভক্ত বা বাধ্য। সবারই সৃষ্টি হয়েছিল এ মহামানবের তরে। সবই ধন্য হয়েছিল এ মহাপুরুষের সেবায়। এর দৃষ্টান্তও আমাদের হাতে আছে।

তাঁর আগমন বার্তায় আকাশে-বাতাসে আনন্দের হিল্লোল বয়েছিল। গাভীর বুকে দুধের বন্যা বয়েছিল। ফলে, ফুলে ও তরুলতায় এক সজীবতা এসেছিল। সাগর, নদী ও ঝরণার ধারায় বন্যার জোয়ার এসেছিল। মেঘ তাঁর মাথায় ছায়া দান করেছিল। আকাশের চাঁদ তাঁরই ইশারায় দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। কাবার মূর্তি কেঁপে উঠেছিল, আর অগ্নিনির্বাপিত হয়েছিল। হয় নি কি?

জিব্রাইল আল্লাহর বাণী তাঁরই জন্য বয়ে আনতেন। ফেরেশতারা তাঁর আনুগত্যের জন্য তৈরি থাকতেন। জ্বীন ইনসান সাধক-স্বাধ্বী তাঁরই ধ্যানে মত্ত থাকত; কার প্রশংসা তিনি পান নি? কার কাছে তিনি প্রশংসিত নন? মানুষের কাছে যিনি প্রশংসিত, তিনি আল্লাহর কাছেও প্রশংসিত, জড়-চেতন পদার্থের কাছে যিনি প্রশংসিত, তিনি আল্লাহর কাছেও প্রশংসিত। এ জন্যই আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে 'মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করেছেন। আর মুহাম্মদ নিজেও বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহারই সৃষ্টি জীবের নিকট উৎকৃষ্ট যে তাহার পরিজনের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং আমি আমার পরিজনের মধ্যে উৎকৃষ্ট।" [মিশকাত]

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিজন শুধু কোরেশ বংশ নয়, মক্কার অধিবাসী নয়,—সারা জাহান—বিশ্ব মখলুকাত। যে মহান ব্যক্তি বিশ্ব স্রষ্টার নিকট উৎকৃষ্ট তিনিই ত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসার অধিকারী। তিনিই ত আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। মুহাম্মদ নাম তাঁর সত্যি সার্থক হয়েছে।

আহম্মদ—এবারে দেখি 'আহম্মদ' নামের সার্থকতা কতটুকু। আহম্মদ অর্থ চরম প্রশংসাকারী।

ইতিপূর্বে কোন নবী, কোন রাসুল কোন পয়গম্বর বা কোন মহাপুরুষ কি চরম প্রশংসাকারী ছিলেন না? নবী-পয়গম্বরগণ সবাই আল্লাহর মনোনীত। সবাই আল্লাহর প্রিয়, সবাই তাঁরই ধ্যানে মত্ত ছিলেন। সাধনা ও কর্মের দ্বারা সবাই আল্লাহকে খুশি করেছিলেন। কিন্তু তবুও কিছুটা পার্থক্য আছে। হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম এ পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। ফেরেশতাকুল তাঁকেই সেজদা করে তাঁর কাছে বাধ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর চরিত্রের কোন কলঙ্ক বা দোষ ত্রুটি আমরা দেখি নি। তবু একটা কথা সবার মনেই দাগ কাটে যে আদি সৃষ্টি হয়ে, আল্লাহর পয়গম্বর হয়েও আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল তিনি ভক্ষণ করেন। ফলে বেহেশতের চির শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এই প্রতারণার ভাণ্ডার পৃথিবীতে তাঁকে আসতে হয়। এ জন্যই আল্লাহ নারাজ হয়ে বলেন,

"তোমরা নিচে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু।"[১]

আদম (আঃ) যে চরম প্রশংসাকারী ছিলেন না এবং আল্লাহকে যে তিনি সম্পূর্ণ খুশি

১—সূরা বকর —৩৬ আয়াতের অংশ।

করতে পারেন নি এ তত্ত্ব মেলে সূরা ত্বহা—১১৫ ও ১২১ আয়াত থেকে। সেখানে বলা হয়েছে—

"এবং নিশ্চয়ই আমি ইতিপূর্বে আদমের প্রতি প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং আমি তাঁহার মধ্যে সুদৃঢ় সংকল্প প্রাপ্ত হই নাই। এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল, তজ্জন্য সে বিভ্রান্ত হইয়াছিল।'

[সূরা ত্বহা, আয়াত ১২১]

পয়গম্বরদের মধ্যে যাঁদেরকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানি তাঁদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত ঈসা, হযরত মুসা (আঃ) ইত্যাদি। প্রত্যেকেই আমাদের চোখে চরম ত্যাগী ও প্রশংসাকারী ছিলেন কিন্তু আল্লাহর চোখে বা আল্লাহর ভাষায় 'আহম্মদ' অর্থাৎ চরম প্রশংসাকারী বলে কেউ ইতিপূর্বে আখ্যায়িত হন নি। তাঁদের ধর্ম ও কর্মজীবন ছিল অসম্পূর্ণ। এ জন্যই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর প্রার্থনার মাধ্যমে বলেছেন,—তাঁর বংশে একদলকে অনুগত করতে এবং একজনকে রাসুলরূপে প্রেরণ করতে যিনি পরবর্তী বংশধরদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে জগৎকে আলোকিত করবেন। কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দান করে। [সূরা বকর—পরে বর্ণিত হয়েছে]

হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) বাণী হতে দেখা যায় যে তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপরই ন্যস্ত করেন—যিনি তাঁর সাধনা ত্যাগ, ক্ষমা ও মহানুভবতা ইত্যাদি দিয়ে চরম প্রশংসিত ও প্রশংসাকারীদের প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। হযরত মুসা মৃত্যুর পূর্বে বলেছেন,

"আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই সকল কথা বলি এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আকাশ মণ্ডল-ও।"

"পৃথিবীকে সাক্ষী করি। কেননা, আমি জানি আমার মরণের পরে তোমরা একেবারে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে বিপথগামী হইবে। আর উত্তর কালে তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে, কারণ সদা প্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা করিয়া তোমরা আপনাদের হস্তকৃত কার্য দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিবে।"[১]

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন যে, তাঁর পরে একজন জগতের অধিপতি আসবেন যিনি মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে যাবেন।

বুদ্ধদেব বলেছেন, "আমি একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন—আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত। ... ... তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন।"[২]

হিন্দু ধর্ম মনীষী এবং অন্যান্য ধর্মমনীষীরাও একইরূপ মত পোষণ করেছেন।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রার্থনার এক বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে এক নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিফলিত হচ্ছে উপর্যুক্ত পয়গম্বর ও মনীষীদের বাণীর মাঝে।

১—বাইবেল। দ্বিতীয় বিবরণ [৩১—২৮ ও ২৯)
২—বুদ্ধের বাণী [দিঘা নিকায়া]

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথমত তাঁর প্রার্থনায় বুঝা যায় যে তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ কর্ম রেখে যাচ্ছেন পরবর্তী বংশধরদের জন্য। যিনি আল্লাহর মাহাত্ম্য ও গুণাগুণ বর্ণনায় সম্পূর্ণ নন, তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ নন। তাই আমাদের আদি পিতা ইব্রাহিম (আঃ)-কেও আমরা চরম প্রশংসাকারী বলতে পারি না।

দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তাঁর বংশ হতে একদলকে অনুগত করতে যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করবেন ও আল্লাহর পরিচয় মানুষকে দিয়ে সুপথে পরিচালিত করবেন। তাঁর বংশে পরবর্তী যুগে জন্মলাভ করেন প্রসিদ্ধ নবীকুল হযরত ইসমাইল, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত মুসা, হযরত ঈসা ইত্যাদি। তাঁরা কেউ 'রাসুল' নামে আখ্যায়িত হন নি। যেমন—নূহ-নবীউল্লাহ, ইসমাইল জবিউল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ, ঈসা-রুহু-ল্লাহ, দাউদ খালিফাতুল্লাহ। আদি পুরুষ আদমকেও বলা হয়েছে—আদম শফীউল্লাহ। এবং ইব্রাহিমকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলে।

তাঁর বংশের একমাত্র মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদকেই (দঃ) 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' বলা হয়েছে। এ খেতাব শুধু তাঁরই ভাগ্যে জুটেছিল রাসুলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল—নবীদের প্রতিনিধি। পূর্বের প্রেরিত নবীগণ অর্থাৎ হযরত (দঃ)-এর পূর্বে যে সমস্ত নবী ইব্রাহিম বংশে জন্মলাভ করেছিলেন সেই নবীদলই ছিলেন অনুগত।

হযরত মুসা, হযরত ঈসা ও বুদ্ধদেবের বাণী হতেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁরা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরে সমগ্র মানবজাতিকে বাস্তব ধ্যান ধারণা দিতে পারেন নি। তাই অন্য এক রাসুলের প্রতি সবাই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ও তাঁরই অপেক্ষা করছিলেন। পূর্ববর্তী নবীদের বাণী ও হযরতের বাণীর মধ্যে কত প্রভেদ। হযরত মুসা যেখানে বললেন তাঁর মরণের পর তাঁর অনুগামীরা একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে, সেখানে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করলেন,

"হে আমার উম্মতগণ! আমি যা রেখে যাচ্ছি তা' যদি তোমরা শক্ত করে ধর তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। জান সে গচ্ছিত সম্পদ কি? সেটা হলো আল্লাহর কোরআন ও রাসুলের বিধান।"[১]

হযরত ঈসা যেখানে বললেন, "আমাকে যেতে দাও—আমার পরে সেই সত্যের আত্মা জগতের অধিপতি আসবেন।" আর বুদ্ধদেব বলেছেন, "যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন যিনি আমার চেয়েও পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত—যিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন"—সেখানে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

"আমিই শেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না"। [২]

এ ঘোষণা হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের যেমন প্রমাণ করেছে তেমনি অন্যান্য নবীদের অসম্পূর্ণ জীবন কাহিনীরও ইঙ্গিত দিয়েছে। কেননা অন্যান্য নবীরা যেখানে বলে গেছেন যে তাঁদের বিধান টিকবে না, প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত এক মনীষী আসবেন—যিনি পূর্ববর্তী সকলের

১—২ হাদিস—বিদায় হজ্ব।

কথাই বলবেন এবং এমন বিধান দেবেন যা মানব দানবের জন্য অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। সে বিধান যে কোরআন ও হাদিস, হযরতের বাণী হতে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যদি তাই হয় তবে প্রকৃত প্রশংসাকারী অর্থাৎ চরম প্রশংসাকারী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছাড়া আর কেউই নন। কেননা তাঁর পূর্বে কেউ এ উপাধি পান নি। পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। তাই পরেও কেউ পাবেন না। এবারে দেখি চরম প্রশংসাকারী কেন তাঁকে বলা হয়েছে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এ দুটোর পরিচয় যে মহাপুরুষ তুলে ধরে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির ও সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অগাধ প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং দয়া, মায়া ও ভালবাসা দিয়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছেন, তিনিই ত চরম প্রশংসার উপযুক্ত। এবারে দেখি স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কি সম্বন্ধ হযরত দেখিয়েছেন।

হযরত বলেছেন—তোমাদের মাবুদ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সৃষ্টির মূলেই সেই স্রষ্টা—যিনি আল্লাহ, যাঁর প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মদ।

এই 'একক' এর নির্ধারিত সংজ্ঞা ইতিপূর্বে আমরা পাই নি। কেননা এই 'একক'কে ভেঙ্গে Arithmetic অথবা Algebra-এর 'এক'কে পেয়েছিলাম। যেমন ঃ— ১ = $\frac{১}{২}+\frac{১}{২}=\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}$ ..... ইত্যাদি।

অর্থাৎ 'এক' এর ভগ্নাংশ।

এসব ভগ্নাংশের সমষ্টিকে 'একক' করা যায়। কিন্তু এ ভগ্নাংশের সমষ্টিগত 'একক'কে Absolute একক বলা যায় না। Absolute 'একক' সেটাই যার কোন ভগ্নাংশ হয় না। উদাহরণ—চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি।

আল্লাহর পরিচয় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দিয়েছেন এই Absolute 'একে'। অর্থাৎ এ একে কোন ভগ্নাংশ সমষ্টি নেই। কোন তুলনা নেই। এ একের যে শক্তি, সে শক্তিই আদি শক্তি এবং সেটাই অন্ত শক্তি। এই 'একক' আদি-অন্ত শক্তিই স্রষ্টা—মহান আল্লাহ।

এই 'একক' শক্তির সম্পাদিত ক্রিয়াই হচ্ছে সৃষ্টি। ক্রিয়া—শক্তির কর্ম। কর্ম—শক্তি হতে পারে না।

মহাশক্তি আল্লাহর কর্ম—সৃষ্টি—মানব সৃষ্টি, এ বিশ্ব সৃষ্টি। তাই যে কোন সৃষ্টিই আল্লাহ হতে পারে না।

পুরানো যুগে মানুষের ধারণা ছিল ঠিক এ থিওরীর উল্টো। তারা সূর্যকে স্রষ্টা মনে করত, চন্দ্রকে স্রষ্টা মনে করত, দেব-দেবীকে স্রষ্টা মনে করত, ক্ষমতাশালী রাজা মহারাজাকে স্রষ্টা মনে করত। তাই চন্দ্র, সূর্য, পাথরের মূর্তি, মাটির মূর্তি, দেব-মূর্তিকেই পূজা করত। ফেরাউন, নমরুদ এরূপ পরাক্রমশালী বাদশাদেরও আল্লাহ বলে মনে করত। এ অসার দেব-দেবী, প্রতিমা পূজা ও মানব পূজার বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ালেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যিনি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'

অর্থাৎ—"নাই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া যাঁর প্রেরিত রাসুল মুহাম্মদ।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর পরিচয় তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন কোরআনের বাণীর মাধ্যমে যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—

"বল—আল্লাহ এক। আল্লাহ আত্মনির্ভরশীল। তিনি জন্ম দেন না—জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁর সমতুল্য আর কেহ নাই।"[১]

আল্লাহই সৃষ্টি ও ধ্বংসের মালিক। একমাত্র উপাস্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। অথচ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস না করে তাঁর অংশীদার ও স্ত্রী-পুত্রের ব্যাখ্যা পর্যন্ত দিয়েছেন। যেমন খ্রীষ্টানেরা যীশুকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকেন। অনেক খ্রীষ্টান আবার এক আল্লাহর পবিরর্তে তিন আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। যেমন ঃ—(১) God the Holy Father —(পবিত্র পিতা), (২) God the Holy Son (পবিত্র পুত্র), (৩) God the Holy Ghost (পবিত্র আত্মা)।

তাদের বিশ্বাস এক আল্লাহ এত বড় একটা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এক একটা ডিপার্টমেন্ট এক একজন আল্লাহ পরিচালনা করেন। এসব আল্লাহরা আবার সংসারধর্মও রীতিমত পালন করেন। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজনও আছে। তাই যীশুকে আল্লাহর প্রিয়তম পুত্র বলে স্বীকার করেন। যাদের উনি সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন তারাই মাত্র স্বর্গের অধিকারী হবে। অথচ যীশুখ্রীষ্ট এমন কথা কোনদিনও বলেন নি। কোরআনও এর ঘোর বিরোধী। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করব ও কোরআনের বাণী সবার অবগতির জন্য তুলে ধরব, ইনশ্আল্লাহ।

এবারে দেখুন খ্রীষ্টান ভাইদের মতে আল্লাহর বচন, ভঙ্গী ও লিঙ্গ ভেদের রূপ ঃ

একবচন	বহুবচন	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
God	Gods	God	Goddess

পারসিকরা আবার খ্রীষ্টানদের বিরোধিতা করে তিন আল্লাহর সংখ্যা কমিয়েছেন। তাঁরা বলেন দুই আল্লাহই যথেষ্ট। এক আল্লাহ শুধু মঙ্গলজনক কার্য করছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর পরিমাপ করে সবার খাদ্য বণ্টন করছেন।

অমঙ্গলের আল্লাহ ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ নৈসর্গিক আলোড়ন, দুঃখ, কষ্ট, জরা, জীর্ণতা, মৃত্যু ও প্রলয়ের জন্য দায়ী।

হিন্দু ধর্মে আল্লাহর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের মতে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
১। ঈশ্বর	ঈশ্বরী	৫। পরমেশ্বর	পরমেশ্বরী
২। ভগবান	ভগবতী	৬। মহেশ্বর	মহেশ্বরী
৩। ব্রহ্মা	সাবিত্রী, পার্বতী	৭। বিষ্ণু	সুমতী
৪। নারায়ণ	নারায়ণী	৮। কামদেব	কামদেবী
		৯। শিব	দুর্গা

এ সব সৃষ্টিকর্তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবই আছে। ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গে যে ঈশ্বরীর সন্ধান পাওয়া যায় সে ঈশ্বরীও একা নয়। তারও শরীক আছে, যেমন—(১) দুর্গা, (২) সরস্বতী, (৩) লক্ষ্মী।

১—কোরআন—সূরা এখলাস।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে—"প্রথমে সমুদয়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থান করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া একভাগে আকাশ ও অপরভাগে পৃথিবীরূপে সৃষ্টি হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, যথা-মরীচি, অত্র, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, বলিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টি কার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর সাধনার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় নারদ ইহাতে অস্বীকৃত হইলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাহাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।"[১]

এই ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন। তিনিই চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, স্থল, বৃক্ষ ইত্যাদি। এ জন্যই হিন্দুরা এবং অন্যান্য জাতি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের পূজা করে থাকেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমরা বাইবেল ও কোরআনে বর্ণিত এ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনায় রত হব। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও পুরাণের সঙ্গে কোরআন ও বাইবেলের দু'-চারটি লাইনের মিল থাকলেও প্রকৃত অর্থ ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণই পৃথক। বাইবেল, জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন আল্লাহর বাণী। কিন্তু বেদ-বেদান্ত,[২] পুরাণ, উপনিষদ, গীতা এগুলো আল্লাহর বাণী নয়। এগুলো ঋষি, দেবর্ষি ও মহাপুরুষদের বাক্য। এ সব বাক্যের মাঝে উপদেশমূলক তত্ত্ব আছে, সারবত্তা আছে, জ্ঞান আছে, আদেশ ও উপদেশ আছে, দেব-দেবতাদের অলৌকিক কাহিনী আছে কিন্তু আল্লাহর সম্বন্ধে যে নিখুত ধারণা তা নেই। আল্লাহর প্রকৃত শক্তি, মহিমা ও পরিচয় যেখানে মেলে না সেখানে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে তার নিকট হতে প্রাপ্ত বাণী আশা করাও কঠিন। তাই বেদ-বাক্যের বা পুরাণের কথার সঙ্গে বাইবেল ও কোরআনের মিল থাকতে পারে না। এ সব গ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্বের পরিষ্কার কোন প্রমাণ নেই এ কথা আমি মুসলমান হয়ে বললে অন্যায় করা হবে, তাই হিন্দু বিজ্ঞ মনীষীর উদ্ধৃতি দিয়ে পরে তুলনামূলক আলোচনা করছি।

পণ্ডিত প্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্বন্ধে পরিষ্কার বলেছেন, "দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এক উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নয়। সাংখ্য ও পূর্ব মীমাংসাতে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ন্যায় ও বৈষয়িক দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেছে বটে কিন্তু তাদের উপবিষ্ট উপায়ের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। পাতঞ্জল দর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগ প্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বটে, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রভেদ অল্প নয়।"[১]

এবারে দেখি বাইবেল বর্ণিত জগৎ সৃষ্টির বিবরণ ও আল্লাহর অস্তিত্ব, শক্তি ও মহিমা।

টীকা ঃ —১— সুবল চন্দ্র মিত্রের সরল বাংলা অভিধান

২ —বেদ-বেদান্ত। ঐশী বাণী বলে অনেকেরই ধারণা। কোন নবীর উপর ইহা অর্পিত হয়েছিল তা জানা যায় না। মনু কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন হযরত নূহ-নবীর উপর অর্পিত হয়েছিল ৪ হাজার বছর পূর্বে।

টীকাঃ —১— গীতা, ঈশ্বরবাদ —৭—৮ পৃষ্ঠা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাইবেল

[আদি পুস্তক প্রথম অধ্যায়]

জগৎ সৃষ্টির বিবরণ ঃ

(১) আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

(২) পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপর ছিল।

(৩) আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, 'দীপ্তি হউক'। তাহাতে দীপ্তি হইল।

(৪) তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

(৫) আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইতে প্রথম দিবস হইল।

(৬) পরে ঈশ্বর কহিলেন জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক।

(৭) ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন।

(৮) তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

(৯) পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক তাহাতে।

(১০) সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে,

(১১) তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন ভূমি—তৃণ, বীজ উৎপাদক ওষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক;

(১২) তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ভূমি স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল;

(১৩) উত্তম—আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

(১৪) পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশ-মণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও;

(১৫) বৎসরের জন্য হউক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশ-মণ্ডলের বিতানে থাকুক। তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর।

(১৬) দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন।

(১৭) আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব;

(১৮) করণার্থে এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃ সমূহকে আকাশ-মণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে সে ;

(১৯) সকল উত্তম, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

(২০) পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হউক এবং ভূমি ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে;

(২১) পক্ষীগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বরের বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে, সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে ;

(২২) সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হউক।

(২৩) আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

(২৪) পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক, তাহাতে সেইরূপ হইল।

(২৫) ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ তৈরি করিলেন আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম।

(২৬) পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ করি। আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পাখীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে।

(২৭) গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। 'পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন', ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন', পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

(২৮) পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর। আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপর কর্তৃত্ব কর।

(২৯) ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত বীজ উৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ জাত বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম।

(৩০) তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে আর ভূচর যাবতীয় কীট এবং সকল প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ঔষধ সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।

(৩১) পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন আর দেখ সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

(৩২) এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।

(৩৩) পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সে সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম লইলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন

কোরআনে বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য আমরা বহু স্থানে দেখতে পাই। সেখান থেকে আমরা মাত্র কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করছি যা বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি-রহস্যের সাক্ষ্য দেয়।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক—যিনি ছয় দিবসে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিবার পর মহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; তাঁহার আদেশের পরে কেহ অনুরোধকারী নাই; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতএব তাঁহারই উপাসনা কর, তবে কি তোমরা স্মরণ করিতেছ না?"[১]

'তুমি বল— তোমরা কি তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ—**যিনি দুই দিনে** এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা কি তাঁহার সাদৃশ্য স্থির করিতেছ? এইত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক এবং তিনি তন্মধ্যে উহা হইতে সমুচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং **চারি দিবসে** তন্মধ্যে উহার উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারিত করিয়াছেন; জিজ্ঞাসুগণের জন্য ইহা সমতুল্য। তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করিলেন এবং ইহা ধুম্রাকৃতি। অতঃপর তিনি উহার জন্য ও পৃথিবীর জন্য বলিয়াছিলেন—তোমরা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির সহিত উপস্থিত হও। তদুভয় বলিয়াছিল—আমরা সানন্দে উপস্থিত হইতেছি। অনন্তর **তিনিই দুই দিবসের মধ্যে আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন** এবং প্রত্যেক আকাশে উহার কার্য সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করিয়া দিলেন; এবং আমি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত ও সুরক্ষিত করিয়াছি; ইহাই মহাপরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ।"[২] (৪১ : ৯ - ১২)

হিন্দু পুরাণ ও বাইবেল থেকে আদি সৃষ্টি রহস্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। পার্থক্য কতটুকু ও মিল কতটুকু সেটাও পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারছি। সৃষ্টির মূলে যে স্রষ্টা হিন্দুশাস্ত্র মতে সে স্রষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্মার জন্ম ইতিহাস দেখান হয়েছে। বাইবেল স্রষ্টার জন্ম ইতিহাস দেখায় নি। দেখিয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টিলীলা ও কৌশল। সৃষ্টির প্রথম অবস্থা বাইবেল ও হিন্দুশাস্ত্র মতে একই। আকাশ ও পৃথিবী ছিল একত্রিত। জলের উপর অবস্থিত ছিল। সেখান থেকেই শুরু হয় সৃষ্টি।

বাইবেলের 'সৃষ্টি রহস্য' পরিচ্ছেদে কোরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণই মিল আছে। কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছে কিন্তু আল্লাহর জন্মকাহিনী বর্ণনা করে নি। আল্লাহর সর্বশক্তির আধার—সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা ও ধ্বংসকর্তা—এই সব বিশিষ্ট মহাগুণেরই পরিচয় দিয়েছে। ব্রহ্মা যেমন দেবর্ষি নারদকে সৃষ্টির জন্য আদেশ করেন এরূপ আদেশ কোরআনের মতে আল্লাহ অন্য কোন মহাশক্তির হস্তে অর্পণ করেন নি। সৃষ্টি ও ধ্বংসের জন্য তিনিই যথেষ্ট। যখন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন, 'কুন'-'ফা-ইয়া কুন'—অর্থাৎ 'হও'—'ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়।' বেদ-পুরাণে আল্লাহর সঠিক ধারণা মেলে

টীকাঃ —১—সূরা ইউনুস, ৩য় আয়াত।
২— সূরা হা'মিম। ৯ হইতে ১২ আয়াত।

না কিন্তু কোরআন ও বাইবেলে—শুধু সঠিক ধারণাই নয়, আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্রিয়াশক্তি ও মহিমার অজস্র দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ মেলে।

আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য কোরআন যে অসংখ্য তত্ত্ব পরিবেশন করেছে তার চাইতে বেশি তত্ত্ব অন্য কোন গ্রন্থেই মেলে না। তাছাড়া যে ভাব, ভঙ্গি, ভাষা ও গুরুত্ব সহকারে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে তারও কোনো তুলনা কোথাও মেলে না। এই অজস্র উক্তির মাঝ থেকে মাত্র কয়েকটা উক্তি পাঠকবৃন্দের জন্য তুলে ধরছি।

"তিনিই আল্লাহ—যিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি সর্বদাতা করুণাময়। তিনিই আল্লাহ—যিনি ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। তিনি পবিত্রতম—রাজ্যাধিপতি, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী অভিভাবক, মহাপরাক্রান্ত, প্রতাপশালী মহিমাময়। তাহারা যে অংশী স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্রতম। তিনিই আল্লাহ—যিনি সৃষ্টিকর্তা, নির্মাণকারক, আকৃতিদাতা—তাহার জন্যই অত্যুত্তম নামসমূহ; নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বৈজ্ঞানিক।"[১] (৫৯ : ২২ - ২৪)

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান। তিনিই আদি ও অন্ত এবং ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি **"ছয় দিবসে"** নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর আরশোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যাহা প্রবিষ্ট হয় এবং উহা হইতে যাহা বহির্গত হয়, এবং নভোমণ্ডল হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যাহা অধিরোহণ করে তিনি তাহা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন; এবং তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার পরিদর্শক। তাঁহারই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইয়া থাকে। তিনি রজনীকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি অন্তর সমূহের বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আমি তোমাদিগকে যদ্বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি তন্মধ্য হইতে ব্যয় কর; অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ব্যয় করে তাহাদের জন্য বৃহত্তম প্রতিদান রহিয়াছে।"[১] (৫৭ :১ -৭)

"সেই আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নাই। যিনি চিরজীবন্ত ও নিত্য বিরাজমান; তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে আকর্ষণ করে না; নভোমণ্ডলে যাহা আছে ও ভূমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই; এমন কে আছে যে তদীয় অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা আছে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন ; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন—তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়ই কেহ ধারণা দিতে পারে না। তাঁহার আসন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ব্যপিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয় না। এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।" [২] (২ : ২৫৫)

১—সূরা হাশর। ২২ হইতে ২৪ আয়াত।
টীকা:—১ হইতে ২ সূরা হাদিস ১ হইতে ৭ আয়াত, সূরা বকর ২৫৫ আয়াত, আয়তাল কুরসী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি লিখেছি স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক নয়। স্রষ্টার ইচ্ছাতেই হয় সৃষ্টি। সৃষ্টির ইচ্ছাতে স্রষ্টার জন্ম হয় না। সৃষ্টি নির্ভরশীল—স্রষ্টা নির্ভরশীল নয়। নির্ভরশীল শক্তি আত্মনির্ভরশীল মহাশক্তির নিকট পরাজিত। তাই দেব-দেবী, নবী, পয়গম্বর, ঋষি-দেবর্ষি, মানব-দানব, জড়-চেতন যা কিছুই হোক না কেন—যে একবার জন্ম লাভ করেছে অন্য শক্তির ইচ্ছায়,—সে পরম শক্তি আল্লাহ বা ঈশ্বর নয়। ব্রহ্মা সুবর্ণ অণ্ডকোষ হতে সৃষ্ট সুতরাং তিনি যত শক্তিশালী হোন না কেন তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে তিনি পরাজিত। তিনি এ মহাবিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি নন। পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা ও সৃষ্টিকর্তাও নন। পুরাণের উদ্ধৃতির মাঝে একটা লাইনের উল্লেখ আছে যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণ-যোগ্য। লাইনটি এই :

"প্রথমে সমুদয়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে **বিরাট মহাপুরুষ** নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন।"

যে বিরাট মহাপুরুষ জলের সৃষ্টি করেন ও বীজ নিক্ষিপ্ত করে সুবর্ণ অণ্ডকোষের মধ্যে ব্রহ্মাকে তৈরি করেন সেই মহাশক্তিই আল্লাহ বা ঈশ্বর। আল্লাহ বা ঈশ্বর ব্রহ্মা নন।

চিন্তাধারার সামান্য ত্রুটির জন্য সর্বনাশ ঘটে। বিশ্বাসের সামান্য ব্যতিক্রমের জন্য মহাপিবদ আসে। নিয়ম শৃঙ্খলার সামান্য পরিবর্তনেই জীবনে মৃত্যু ঘটে।

পূর্বের মহামানবগণ আল্লাহর যে পরিচয় দিতে পারেন নি—তাঁকে বুঝতে গিয়ে যে ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল—তাঁর স্বরূপ নির্ধারিত করতে গিয়ে তাঁর পরিবার পরিজন টেনে এনে যেভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করছিলেন, যুগ-যুগান্তরের যে সমস্যা পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আদর্শ ও মতের পার্থক্য হেতু সমাজে সমাজে ও ধর্মে ধর্মে যে কলহের সৃষ্টি করেছিল সে সব জটিল সমস্যার সমাধান করতেই আসেন জগৎ-গুরু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি শুধু যুগ সমস্যার সমাধান দিয়ে 'মুহাম্মদ' আখ্যাই নেন নি, আল্লাহকে তাঁর অংশীদার হতে মুক্ত করে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ, মর্যাদা ও শক্তিমহিমার অপূর্ব বিশ্লেষণ দিয়ে তাঁর নিকট হতেই 'আহম্মদ' খেতাব নিলেন এবং তাঁর এ মহাবাণী উপহার পেয়ে ধন্য হলেন।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করিয়া দিলাম।"[১]
(৫ : ৩)

এবারে দেখি এ বিশ্ব মানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সৃষ্টিকে কি দিলেন—কি তাকে শেখালেন।

তিনি যুগ যুগের অন্ধ ও অজ্ঞান মানুষকে দিলেন ধ্যান, ধারণা ও জ্ঞান আর শিক্ষা দিলেন সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ।

ধ্যান : কার ধ্যানের কথা তিনি বলেছেন? কার চিন্তায় তিনি নিমজ্জিত হতে বলেছেন? কার শক্তির নিকট নিজ শক্তি বিকিয়ে দিতে বলেছেন? মহাকাশের মহাজ্যোতি—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির কাছে? না দেব-দেবী বা অশরীরী প্রস্তর প্রতিমার কাছে? চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ,

টীকা:—১। কোরআন। সূরা মায়েদা, তৃতীয় আয়াতের অংশ।

নক্ষত্র সবই নিয়মের অধীন। সবই এক মহাশক্তির আদেশ অনুযায়ী আবহমান কাল ধরে চলছে এবং চলবে যতদিন না সেই শক্তি এদের পুনরাদেশ দেবেন। দেব-দেবী একজনও বেঁচে নেই। বেঁচেও থাকবে না। যারা বাঁচতে জানে না—যারা বাঁচাতে জানে না—যারা সৃষ্টি করতে জানে না—যারা সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, তারা ধ্যানের শক্তি হতে পারে না। উপাস্য হতে পারে না। এ অসার প্রতিমাপুঞ্জ চিরদিন অসার হয়েই থাকবে। এদের পূজা করা, এদের ধ্যানে মত্ত হওয়া, এদের জন্য জীবন-মন সঁপে দেওয়া শুধু নিরর্থকই নয়—সৃষ্টি-সেরা মানুষের জন্য এটা লজ্জাকর ও অবমাননাকর। মানুষ তাঁরই ধ্যানে মত্ত থাকবে যিনি তার সৃষ্টিকর্তা। এ ধ্যানের কথাই বলেছেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় বসে একাধারে চল্লিশ দিন তিনি এই আল্লাহর ধ্যানেই কাটিয়েছেন। এরপর সারা জীবন-ব্যাপী সমাজের মাধ্যমে কাজে-কর্মে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে এ মহাশক্তির ধ্যানেই প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কাছেই মাথা নত করেছেন। তাঁর কাছেই সাহায্য চেয়েছেন ও তাঁরই করুণা ভিক্ষা করেছেন। অন্য কোন শক্তির কাছে নয়। তাঁর প্রার্থনায় তা বুঝা যায়—

প্রভাত প্রার্থনা :—"হে আল্লাহ! আমাদের নিকট প্রভাত সমাগত হইল। তোমার নিখিল বিশ্বের উপর প্রভাত বিস্তৃত হইল। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি ছাড়া আর কেহ উপাসনার যোগ্য নয়—তুমি অদ্বিতীয়, তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমারই সকল শক্তি। সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি যাহা ইচ্ছা সকলই করিতে পার। হে আল্লাহ! এই দিন শুভ হউক। এই দিবসের মধ্যে যাহা শুভ তৎসমূদয় আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি। এই দিন যেন আমার পক্ষে অশুভ না হয়। ইহার মধ্যে যাহা অমঙ্গলজনক তাহা হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। হে আল্লাহ! আমাকে অলসতা হইতে রক্ষা কর। পার্থিব বিপদ আপদ হইতে নিরাপদ রাখ। মৃত্যুর পর কবরের আজাব হইতে আশ্রয় দাও।"[১]

সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রার্থনার ধারা পৃথক ছিল। কিন্তু সমস্ত প্রার্থনার মাঝে দেখা যায় যে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন মহান আল্লাহর কাছে। তাঁর প্রশংসাই ছিল হযরতের ধ্যান।

ধারণা:—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মানুষকে দিয়েছেন বাস্তব ধারণা; অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত যে ধারণা মানুষ যুগ যুগ ধরে করে আসছিল তিনি করেছেন তার অবসান। ইতিপূর্বের মনীষীরা কেউ দিয়েছেন ইহজগতের ধারণা, কেউ দিয়েছেন পরজগতের ধারণা। কেউ আবার যেমন নবী-পয়গম্বর ইহজগৎ ও পরজগৎ দুটোর ধারণাই দিয়েছেন, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দিয়েছেন প্রমাণের ভিত্তিতে। আকাশ-বাতাস, আরশকুরসী, বেহেশত, দোজখ স্বচক্ষে দেখে তার বাস্তব রূপ দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদের। আল্লাহর সৃষ্টি যে অমূলক নয়—যে যত ছোটই হোক বা যত দুর্বলই হোক, মানুষ যে তুচ্ছ নয়—সে যত দরিদ্রই হোক বা যত কুৎসিতই হোক, প্রতিটি কর্মেরই যে প্রতিফল হবে সেটা যত বড় বা ছোটই হোক—এ ধারণা দিয়ে গেছেন হযরত তাঁর জীবনব্যাপী। এমন ধারণা স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে কেউ ইতিপূর্বে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন নি।

টীকা: ১। শায়খান ও তিরমিজী; সংগৃহীত মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন—'হাদিসের আলো'। ২য় খণ্ড; প্রার্থনা পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্ঞান:—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন,

"আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।"[১]

অন্যত্র বলেছেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রত্যেকটি জিনিস আমার নিকট প্রকাশিত হইল। আমি উহার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম।" [২]

অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল হযরতের হৃদয়। তাঁর এ জ্ঞান-সাগর থেকেই তাপস-তাপসীরা এ জ্ঞানের সুরা পান করতেন। যে অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা কোনদিন ফুরাবে না।

পার্থিব জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, ইহলৌকিক জ্ঞান, পারলৌকিক জ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান, তপস্যার জ্ঞান, চরিত্র গঠনের জ্ঞান, ভক্তি-শ্রদ্ধার জ্ঞান, জড়-জগতের জ্ঞান, জীবদেহের জ্ঞান, সর্বোপরি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করে তিনি এ জগতে অমর হয়ে থাকবেন এবং জগৎগুরুর আসনই লাভ করবেন।

সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ নিয়ে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করেছি " বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)" পুস্তকের সমাজ বিজ্ঞান পরিচ্ছেদে। তাই এ নিয়ে পুনঃ আলোচনা করে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

এবারে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অন্যান্য কয়েকটি নাম নিয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। তিনি নিজকে **মাহী** নামে ব্যক্ত করেছেন।

মাহী শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আরবীর 'হাইউন' শব্দ হতে নেওয়া হয়েছে। হাইউন অর্থ চিরস্থায়ী। আর মাহী অর্থ নকসাকে বিলীনকারী অর্থাৎ নকল রূপের মূলোৎপাটনকারী।

হযরতের পূর্বের মানুষের ধারণা ছিল আল্লাহ সর্ব বস্তুতেই বিরাজমান এবং সব রূপেই মূর্তিমান। তাঁকে যে কোন বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যায়। হিন্দুদের মতে ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই আছেন। অর্থাৎ এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই এ ব্রহ্মার অংশ। সবাইকে নিয়ে হয় পূর্ণ ব্রহ্ম বা পরম একক। দেব-দেবীরা যেহেতু ব্রহ্মার আশীর্বাদপুষ্ট, তাই তাঁদের মূর্তি সম্মুখে রেখে পূজা করলেই পরম একক বা পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মেলে। ইহুদী, পৌত্তলিক, সাবেইন, নাসারা প্রভৃতি জাতি মূর্তি পূজার মাধ্যমে ত্রাণ খুঁজত। তাঁদের এ ধারণা সত্য ছিল না। কেননা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে কোন দেব-দেবী বা দেব-প্রতিমা তাদের মুক্তিদাতা হতে পারে না। কেননা একটা মক্ষিকার যে ক্ষমতা আছে এদের তাও নেই। কোরআন ও বাইবেল এ কথার সাক্ষী।

"এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার উপাসনা করে, উহা তাহাদের অনিষ্ট অথবা তাহাদের উপকার করিতে পারে না এবং তাহারা বলে যে, উহারা আল্লাহর নিকট আমাদের অনুরোধকারী হইবে; তুমি বল—তবে কি তোমরা আল্লাহকে তাহাই পরিজ্ঞাপন করিতেছ—যাহার তুল্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে নাই। এবং তাহারা যে অংশী স্থির করিতেছে তিনি তাহা হইতে পবিত্রতম ও সমুন্নত।"[১]

টীকা:—১ ও ২। হাদিস—বুখারী ও মিশকাত।

টীকা:—১—২। কোরআন-সূরা ইউনুস—আয়াত ১৮, সূরা জোমর—আয়াত ৩।

"সতর্ক হও। আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ধর্ম। এবং যাহারা তাঁহার পরিবর্তে অন্য অবিভাবক গ্রহণ করিয়া বলে, আল্লাহর দিকে নিকটতর করিয়া দিবে মনে করিয়াই আমরা তাহাদের পূজা করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিচার করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। যাহারা মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের পথ প্রদর্শন করবেন না।"[২]

"এবং যাহারা প্রতিমাপুঞ্জের পূজা হইতে প্রমুক্ত হয় এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহাদের জন্য সুসংবাদ; অতএব আমার সেবকগণকে সুসংবাদ প্রদান কর। যাহারা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপর ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর বিষয়ের অনুসরণ করে তাহাদিগকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহারাই জ্ঞানের অধিকারী।"[৩]

আমি এজন্যই বলেছি বিধর্মী ভাইয়েরা যারা ত্রাণের নিয়তে দেব-দেবী অথবা যে কোন সৃষ্ট শক্তির পূজা করেন তাদের সাধনা ও ধারণা বৃথা ও মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। এ সব শক্তিকে বিচারের দিন দাঁড় করিয়ে বলা হবে "যদি শক্তি থাকে তবে এদের মুক্তি দাও"। কিন্তু সে শক্তি তারা পাবে না। নিজেরা পরিত্রাণের পথ খুঁজবে। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে।

"এবং সেইদিন আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, তৎপর অংশী স্থাপনকারীদিগকে বলিব যে তোমরা ও তোমাদের অংশী উপাস্যগণ যথাস্থানে অবস্থিত হও। অনন্তর আমি তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিব এবং তাহাদের অংশী উপাস্যেরা বলিবে যে তোমরা আমাদের উপাসনা কর নাই।"[৪]

মাহী নামের আর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এ কথা সবারই জানা আছে যে আল্লাহর ঘর 'কাবা' ছিল তখন দেব-দেবীর ঘর। তিনশ ষাটটি পাষাণ প্রতিমা এ কাবা ঘরকে শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত করেছিল। আরববাসীরা প্রতিমা পূজার নামে এখানে করত অনাচার, ব্যভিচার, কলহ ও বিবাদ। অথচ লাভ কিছুই হতো না। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর এ পবিত্র ঘরে এ পাষাণ প্রতিমাদের অবস্থান সহ্য করলেন না। একদিন তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, **'লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'** দেব-দেবীগুলো তখন থর থর করে কাঁপতে লাগল। সমবেত কোরেশদের সম্বোধন করে হযরত বললেন, "হে কোরেশগণ! এ দেব-দেবীগুলি ভেঙ্গে ফেল। আল্লাহর উপাসনা কর। একমাত্র তিনি ছাড়া আমাদের আর কেহ উপাস্য নাই। আর কেউ সাহায্যকারীও নাই।"[১]

কোরেশগণ হযরতের এমন কঠিন আদেশ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হযরতের চাচা আবু তালেবের নিকট হযরতের এহেন উক্তির কথা বর্ণনা করে সাবধান করে দিলেন। আবু তালেব কিছুটা বিচলিত হয়ে হযরতকে ডেকে বললেন, "মুহাম্মদ! তোমার এ ধর্ম পরিত্যাগ কর। অনর্থক আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করো না। এতে শত্রুতা বাড়বে বই কমবে না।"[২]

৩। সূরা জোমর—আয়াত ১৮।

৪। সূরা ইউনুস।

টীকা:—১ হতে ৩। সংগৃহীত—'বিশ্বনবী', গোলাম মোস্তফা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, "চাচাজান! শত্রুদের জন্য আমি মোটেও ভয় করি না। কোরেশ কেন, সমগ্র বিশ্ব যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবু সত্য প্রচারে আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারবে না। আমি ইচ্ছা করে আপনাদের দেব-দেবীর নিন্দা করছি না। ইসলাম প্রচার করতে গেলে এ সব দেব-দেবীকে মিথ্যা না বলে উপায় নেই। আল্লাহর একত্ববাদের অর্থই দেব-দেবীর অস্বীকার। তাই বাধ্য হয়ে এ সব দেব-দেবীকে মিথ্যা বলতে হয়। আপনারা ভাবছেন আমি আপনাদের শত্রু। কিন্তু শত্রু আমি নই। আমি আপনাদের বন্ধু। আমার কথা শুনুন। ইসলাম কবুল করুন। আপনাদের মঙ্গল হবে।" ৩

হযরত-জীবনের সব চাইতে চরম সাফল্য এই যে তিনি জীবিত অবস্থায়ই এ সব পাষাণ মূর্তিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেন। শুধু তাই নয়, যে আবু সুফিয়ান একদিন সদর্পে আবু তালেবকে বলেছিল হযরতকে খুন করবে এ সব দেব-দেবীকে অস্বীকার করার অপরাধে—সেই আবু সুফিয়ান হলো মূর্তি ধ্বংসের সর্দার। নিমেষে কাবার মূর্তিগুলো ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মুগীরার কুঠারাঘাতে তথাকার নর-নারীর পরম-প্রিয় লাৎ দেবতা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আর জাগল না, প্রতিবাদ করল না, হযরতের উপর প্রতিশোধ নিল না। এবারে আরববাসীদের চেতনা হলো 'লাৎ' ঠাকুরের শক্তি নেই। পাথরে মূর্তি পাথরের মতই নিশ্চল। যিনি নকল উপাসকের মূলোৎপাটন করে কাবা ঘরকে আল্লাহর উপাসনাগারে পরিণত করে ঘোষণা করলেন,

"সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা চলিয়া গিয়াছে! সত্য আসিয়াছে। মিথ্যা না প্রথমে সৃষ্টি করিতে পারে, না পুনরায় পারে।"১ তিনিই কি প্রকৃত মাহী নন?

হাশির:—আরবীর হাশর শব্দ হতে 'হাশির' শব্দের উৎপত্তি। হাশর অর্থ একত্রিতকরণ আর হাশির অর্থ একত্রকারী, সমবেতকারী।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেকে 'হাশির' বলেছেন কেন এটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা উচিত। যে মহামানব তাঁর পতাকাতলে দুনিয়ার মানুষকে একত্রিত করার কৌশল উদ্ভাবন করে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি প্রকৃতপক্ষে হাশির নামের উপযুক্ত। পূর্ববর্তী নবী পয়গম্বর ও মহাপুরুষগণ তাঁদের ধর্মমত ও ন্যায় নীতির বাণী জনসাধারণের সম্মুখে তুলে, এক একটা সমাজ, দল ও জাতি গঠন করেছেন কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষকে নিয়ে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দলগত, ভাষাগত, ভাবগত সম্প্রদায় নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যেমন সবাইকে এক পতাকার নিচে একত্রিত করে সফলতা লাভ করেছেন এমন সফলতা লাভ আর কেউ করতে পারেন নি। এ দিক থেকে তাঁর 'হাশির' নাম সার্থক হয়েছে।

এছাড়া পারলৌকিক জীবনে যে মহান গুরুর প্রভুত্ব খাটবে, যাঁর ডাকে সবাই সাড়া দেবে, যাঁর ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্য নবী, পয়গম্বর পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে উঠবেন তিনিই ত সত্যিকারের 'হাশির' নামের উপযোগী। দেখি হযরতের এরূপ কোন বাণী তাঁর 'হাশির' নামের প্রমাণ দেয় কি না।

টীকা:—১—সহীহ বুখারী, তর্জমা আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ, পৃঃ ৭৬, (৬৫-৪০২)

"রোজ কিয়ামতে আমি সমস্ত মানব সন্তানগণের নেতা হইব এবং ইহা দ্বারা কোন গর্ব প্রকাশ করি না; এবং আমারই হস্তে প্রশংসাসূচক পতাকা থাকিবে এবং ইহা দ্বারা আমি গর্ব প্রকাশ করি না; সেই দিন আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পয়গম্বর আমারই পতাকাতলে সমবেত হইবেন এবং আমিই সর্বপ্রথম কবর হইতে উত্থিত হইব এবং ইহা দ্বারা আমি কোন গর্ব প্রকাশ করি না।"২

এ কথা প্রতিটি ধর্মের মানুষই জানে যে এ পৃথিবীর যেমন হয়েছিল শুরু তেমনি হবে এর শেষ। এ শেষেরও আছে এক পরিণতি। সে পরিণতি হলো কিয়ামত বা প্রলয়। এই প্রলয়ের দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। সবাই থাকবে নিজের জন্য ব্যস্ত সন্ত্রস্ত। কোন ধর্মযাজক, কোন পয়গম্বর, কোন নবী কেউ তাঁর উম্মত বা অনুসরণকারীর জন্য কোন চেষ্টা করবেন না। প্রশংসার কোন সার্টিফিকেট নিয়ে তাদের মুক্তির জন্য কোন পথ তারা প্রদর্শন করতে পারবেন না। একমাত্র মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) জয়ের পতাকা হাতে নিয়ে সমুন্নত হবেন। সে পতাকার ছায়াতলে আসবেন প্রতিটি নবী ও পয়গম্বর। সেই বিচারের দিনে—সমস্ত মানব সন্তানের নেতারূপে যিনি পরিচয় দেবেন—সমগ্র পয়গম্বর নবীদের উর্ধ্বে যিনি গৌরবের আসন অলংকৃত করবেন, যাঁর করুণা ও সহানুভূতির আশায় প্রতিটি ধর্মের মানুষ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকাবেন তিনিই কি সৃষ্টির সেরা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নন? কোন ধর্মযাজক, কোন মহাপুরুষ এরূপ চ্যালেঞ্জ দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে সাহস পান নি। নিজ গণ্ডি, নিজ সমাজ ও নিজ পরিবার পরিজনকেও রক্ষার কোন দায়িত্ব নেবেন বলে অঙ্গীকার করতে পারেন নি। অথচ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সমগ্র মানবমণ্ডলীর নেতারূপে সেদিন আত্মপ্রকাশ করে সকল সম্প্রদায়ের কাছেই গৌরবান্বিত হবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এমন নিদর্শন আর কি হতে পারে? সেই বিচারের দিন তিনি যদি শুধু আরবের নেতারূপে পতাকা উত্তোলন করতেন, যদি শুধু কোরেশ বংশের গৌরব-মুকুট বলে চিহ্নিত হতেন, যদি মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র অধিনায়ক বলে মাথা উঁচু করতেন, তবে আমরা তাঁকে জগৎগুরু বলে আখ্যায়িত করতাম না। কিন্তু যে মহামানব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ, মহাদেশ, নবী, গাউস, কুতুব, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ নির্বিশেষে নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেছেন—তিনিই ত সবার গুরু—তিনি জগৎগুরু। কোরআনও তাই সাক্ষ্য দেয় :

"সেদিন সর্ব প্রদাতা যাকে আদেশ করবেন এবং যার বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট তদ্ব্যতীত কারো অনুরোধ ফলপ্রদ হবে না।"১

আকিব:—অর্থ শেষ নবী বা সর্বশেষ আগমনকারী।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শেষ নবী ছিলেন এ কথার প্রমাণ পূর্ববর্তী নবীরা দিয়েছেন তাঁদের বাণীর উদ্ধৃতি পরবর্তী পরিচ্ছেদে দিয়ে এ কথার সারবত্তা প্রমাণ করব। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিদায় হজ্বের বাণীতে ঘোষণা করেছেন,

---

টীকা:—২—তরিমিজী। সংগৃহীত 'হাদিসের আলো', কৃত মুহাম্মদ আজহার উদ্দিন, এম. এ. ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪।

টীকা:—১—কোরআন-সূরা ত্বহা, ১০৯ আয়াত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আমি শেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না।" (বিদায় হজ্ব)

চোদ্দশ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এ ঘোষণার প্রতিবাদ আজও কেউ করতে পারেনি। নিজেকে পয়গম্বর বা শেষ নবী বলে আখ্যায়িত হবার সাহস কারো হয়নি। প্রতিটি শতাব্দীর পুরোভাগে এক একজন মহাপুরুষের জন্ম হয় এ কথা আমরা রাসুলের (দঃ) বাণী হতেই জেনেছি। তাহলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে বিগত চোদ্দশ বছরে চোদ্দজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কেউ কি নবী বা পয়গম্বর বলে দাবী করেছেন? কাল মার্কস, লেনিন, হিটলার, মুসোলিনী, আকবর, পিটার, স্ট্যালিন প্রভৃতি বিপ্লবী পুরুষ সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বর বলে চিহ্নিত হন নি। অনেকে অনেক সময় আল্লাহর পয়গম্বর বলে নিজেকে জাহির করবার অপপ্রয়াস করেছে কিন্তু তাদের বিড়াল তপস্যার রূপ ও চরিত্র ধরা পড়েছে। নিন্দনীয় হয়েছে দেশ দেশান্তরে ও মানব সমাজে। টিকে নাই তাদের অপপ্রয়াস। টিকে নাই তাদের দুরভিসন্ধি। টিকে নাই পয়গম্বর নামের মিথ্যা আস্ফালন।

আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তী সময়ে জন্মলাভ করেছেন, যাঁদেরকে আমরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকি তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল কাদের জিলানী, খাজা মইনুদ্দিন চিশতী, খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া , শাহজালাল (রঃ), বায়েজিদ বোস্তামী, খান জাহান আলী সাহেব কেউ নবী বা পয়গম্বর বলে দাবী করেননি। বরং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মত হতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন। তাই জীবন উৎসর্গ করে তাঁরাই ধর্ম ইসলাম প্রচার করতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কবির, নানক প্রভৃকি ধর্মগুরু মহাপুরুষগণও নিজেদেরকে পয়গম্বর বলে বা শেষ যুগের নবী বলে দাবী করেননি। প্রত্যেকেই ধর্মের সংস্কার করেছেন। এ জন্যই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেকে শেষ নবী বলেছেন এবং ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমি মানুষ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরিত হইয়াছি। যুগের পর যুগ গিয়াছে অবশেষে আমি আসিয়াছি আমি যে যুগে আছি।"[১]

হযরত বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন হাউযে কওসর-এর উপর দাঁড়াইব। উহার বিস্তৃতি মদিনা ও সানআর মধ্যে ব্যবধানের তুল্য।"[২]

হাউযে কওসর—এর অর্থ বুঝতে হলে কোরআনে মনোনিবেশ করতে হয়। সেখানে বলা হয়েছে "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 'কওসর' দান করেছি"। এটা হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি মাপকাঠি।

কওসর—অর্থ অনন্ত কল্যাণ, অফুরন্ত সম্পদ বেহেশতের সুপেয় ও সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ সরোবর।

পারলৌকিক মহাবিচারে যাঁরা চিরশান্তির বেহেশতে প্রবেশ করবেন তাঁরা এই আবে-

টীকা: ১—সহীহ বুখারী। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। ১ম খণ্ড—পৃষ্ঠা ২৮৭।
টীকা: ২—তজরীদুল বুখারী (হাউয পরিচ্ছেদ) তর্জমা আঃ রহমান খাঁ; পৃষ্ঠা ৪৫৬।

কওসর হতে পরম তৃপ্তিকর পানি পান করবেন। এ কওসরের একচ্ছত্র মালিক হবেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)—অন্য কোন নবী নন। কোরআন এ কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে। এ কওসরের পানির গুণাগুণ কি—এর প্রশস্ততা কতটুকু: হযরতের বাণী হতে তারও বিবরণ মেলে। তিনি বলেছেন—"আমার চৌবাচ্চা তিন মাসের পথ প্রশস্ত। উহার পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং উহার গন্ধ মৃগনাভির চেয়ে উত্তম। এবং উহার পানিপাত্র সমূহ যেন আসমানের তারা, যে কেহ পান করিবে উহা হইতে—সে পিপাসিত হইবে না আর কখনও।"[১]

অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের সামনে আমার হাউয হইবে জব্বা হইতে আযরাহ্‌র মত।"[৩]

সেই মহাবিচারের দিনে যখন কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না, নবী, পয়গম্বর, অলি, গাউস সবাই নিজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তখন হযরত ব্যস্ত হবেন তাঁর উম্মতের জন্য। আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই একটি ক'রে বর দিয়েছেন যা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাঁকে দেবেন। পূর্বোক্ত নবীগণ আল্লাহর এ আশীর্বাদ নেবেন নিজেদের মুক্ত করতে সেই ভয়াবহ মুহূর্তে কিন্তু এ দয়ার-সাগর জগদ্‌গুরু নিজের জন্য এ আশীর্বাদ তখন না নিয়ে পাগল হয়ে উঠবেন তাঁর উম্মতের জন্য। হযরতের এ আশার বাণীতে আমরা বিশ্বাসী মুসলমান সত্যি আশান্বিত ও গৌরবান্বিত। আমরা সেই বিপদের দিনে সুদিনের সাক্ষাৎ পাব এটা নিশ্চিত। কেননা হযরতেরই এটা প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেছেন—"প্রত্যেক নবীর আছে একটি বর যাহা কবুল করা হইবে যখন তিনি চাহেন উহা। আমি চাই যে আমার ঐ বর আমি রাখিয়া দিব আখেরাতে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য।"[৪]

অত্যন্ত সুন্দর তুলনা ও উপমার মধ্যেই হযরত তাঁর মহান পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ পরিচয়ে তাঁর অহমিকা নেই, গৌরব নেই, আভিজাত্যের কোন বড়াই নেই। আছে আমাদের জন্য জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয়। মানুষকে সুপথ দেখাতেই হয়েছিল তাঁর জন্ম। অমানিশার ঘোর অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। যুগ যুগের কলুষ কালিমা মুছে দিতেই উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জীবন। কীট-পতঙ্গ দলে দলে যেমন আগুনের প্রেমে পড়ে জীবন হারায়, নির্বোধ শিকারী যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখে হিংসায় জ্বলে উঠে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে জীবন হারায়, তেমনি কুৎসিত মোহ, মায়া ও হিংসার বশবর্তী হয়ে সে যুগের মানুষ নিজেদের হারাত। এদের সতর্ক করে দিতেই এলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী এটা প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন, "আমার ও আমাকে যাহা দিয়ে পাঠান হইয়াছে তাহার উপমা এই যে এক ব্যক্তি এক জাতির নিকট আসিয়া বলিল, 'আমি স্বচক্ষে একদল শত্রুসেনা দেখিয়াছি এবং উলঙ্গ হইয়া প্রকাশ্যে তোমাদের সতর্ক করিতেছি, তোমরা উহা হইতে বাঁচ।' একদল তাহার কথা মানিল এবং রাতারাতি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া রক্ষা

টীকা: ১-তজরীদুল বুখারী (হাউয পরিচ্ছেদ) তর্জমা আঃ রহমান খাঁ; পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৫।
২— ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪৫৪ - ৪৫৫
৩— ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৪৫৭ - ৫৫৮
৪—সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড-তর্জমা আঃ রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ৫০৮ (দোয়া পরিচ্ছেদ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাইল; অপর দল মিথ্যা জানিল, এবং শত্রুসেনা ভোরে আসিয়া সমূলে তাহাদের বিনাশ করিল।"[১]

উপরের বাণী পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, তাঁর আদেশ-উপদেশ মানে না—অর্থাৎ যারা শান্তির ধর্ম ইসলামে বিশ্বাস করে না, তাদের পরিণাম ধ্বংস। শত্রুসেনা কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অর্থাৎ মহাবিচারের দিনে তাদের সাহায্য করার মত কেউ থাকবে না।

হযরতের পূর্বে যে সব নবী, পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি, অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকলেও আল্লাহর পূর্ণ বাণী হাতে নিয়ে কেউ আসেননি। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা স্ব স্ব গোত্র ও জাতির ত্রাণকর্তা রূপেই এসেছিলেন। সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আসেননি। এ জন্যই complete code of life বা পরিপূর্ণ মহাবাণী কোরআন হাতে পাননি। জবুর পেয়েছিলেন হযরত দাউদ (আঃ), তৌরাত পেয়েছিলেন হযরত মুসা (আঃ), এবং ইঞ্জিল পেয়েছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। এগুলোর কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনই একমাত্র নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থসমূহের জননী। এ গ্রন্থের অধিকারী হয়েছিলেন নবী সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যিনি তাঁর বাণীতেই এর প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে পাঠান হইয়াছে পূর্ণ বাণীসহ এবং সাহায্য করা হইয়াছে প্রভাব দিয়া। আমি একদিন শুইয়া আছি এমন সময় আমার নিকট উপস্থিত করা হইল দুনিয়ার ধনাগার সমূহের কুঞ্জি এবং উহা স্থাপন করা হইল আমার হাতে।"[২]

শ্রেষ্ঠত্বের এমন প্রমাণ আর কি হতে পারে? দুনিয়ার ধনাগার যার হাতে সঁপে দেওয়া হলো—আল্লাহ স্বয়ং যাঁকে প্রভাবশালী করে ধরার বুকে পাঠালেন—এ বিশ্ব যাঁর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হলো তিনিই কি সর্বশ্রেষ্ঠ নন? হযরতের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বাণী একটি দুটি নয়, শত শত। চলুন আমরা এমন মহাবাণী আরও সংগ্রহ করি ও তাঁর সম্বন্ধে বিচার করি। তিনি বলেছেন, "আমার নামে নাম রাখ কিন্তু কুনিয়াত করিও না আমার কুনিয়াতে কেননা আমি কাসিম।"[১]

হযরত কোন সময় কেন এরূপ বাণী দিয়েছেন এবং নিজকে কাসিম নামে আখ্যায়িত করেছেন এ প্রসঙ্গ না জানলে কথাটির অর্থ ঠিক বুঝা যাবে না। এ জন্য একটু প্রসঙ্গ দিচ্ছি।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী হতে বর্ণিত আছে যে কোন এক সময় তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির এক ছেলে জন্মে এবং সে ছেলেটির নাম রাখা হয় 'কাসিম'। আনসারীরা এ 'কাসিম' নামে আপত্তি জানালে যার ছেলে তিনি নবীজীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার একটি ছেলে হয়েছে আর আমি তার নাম রেখেছি কাসিম কিন্তু আনসারীরা বলে আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনিয়াত দিব না এবং তোমার চক্ষু শীতল করব না'। তখন হযরত উপর্যুক্ত বাণী দিয়েছিলেন।

দৃঢ় কণ্ঠে এমন কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল এ জন্যই যে পৃথিবীর বুকে ন্যায়ের

১—সহীহ বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড, তর্জমা, আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। [পৃষ্ঠা ৪৩৬—৪৩৭]
২। সহীহ বুখারী—আলহাজ্ব আঃ রহমান খাঁ [হাদিস ৫—১০৪ নং পৃষ্ঠা ১১৫]
টীকা: ১। 'কাসিম' অর্থ বণ্টনকারী। সহীহ বুখারী আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ, পৃষ্ঠা—১৪৭।

বণ্টনকারী হিসাবে কাসিম নামে আখ্যায়িত হবার জন্য যদি কেউ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সে আখ্যায় ভূষিত হবার উপযুক্ত তিনি ভিন্ন আর কেউ নন। এ গৌরব, এ আখ্যা তিনি ভিন্ন আর কেউ লাভ করতে পারেন না। এর প্রমাণ মেলে তাঁর আর একটি বাণীতে।

একদা রাসুলুল্লাহ (দঃ) জিরারে যুদ্ধ সামগ্রী বণ্টন করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'ন্যায় বিচার করুন।' প্রতি উত্তরে হযরত বললেন, "আমি যদি ন্যায় বিচার না করিয়া থাকি তবে তুমি হতভাগ্য।"[২]

ন্যায় বিচারক হিসাবে দুনিয়ার বুকে তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল। শৈশবকাল থেকেই তিনি ন্যায় বিচারক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করে গেছেন।

হজরে আসওয়াদ বা কাল পাথর সংস্থাপনের ঘটনা কে না জানে। কোরেশের সকল গোত্র মিলে যখন পবিত্র কাবার সংস্কার করছিলেন তখন এক মহাগোলযোগ বাধে। এ কাল পাথরটিকে নিয়ে কোন্ গোত্র কাবা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে যুগ যুগের কৃতিত্বের দাবীদার হবে? এ পবিত্র পাথরটির সঙ্গে ছিল প্রত্যেকেরই একটা গভীর যোগসূত্র। এ পাথরের স্পর্শ ছিল ফেরেশতাদের, এর স্পর্শ ছিল আদি মানব হযরত আদমের (আঃ)। এর অণু-পরমাণুতে মিশ্রিত ছিল পিতা-পুত্র হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের (আঃ) আশীর্বাদ। তাই একে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হতে কে বঞ্চিত থাকবে? কোন গোত্রই স্বীকার করল না—কোন গোত্রই পিছ পা হলো না একে যথাস্থানে না রাখার যুক্তিতে। একদিন নয়, দু-দিন নয়—পুরা চারদিন চলল ভীষণ প্রতিযোগিতা। হিংসা ও বিদ্বেষের দাবানল শেষে রক্তপাতের সীমান্তে এসে পৌছল। কোথায় কাবার সংস্কার, কোথায় সামাজিক মর্যাদা, কোথায় বা আল্লাহর প্রতি ভক্তি নিবেদন। এক নিঃশ্বাসেই মরুর লু-হাওয়ায় তা যেন মিশে গেল। কে এর সমাধান দেবে? কে 'হজরে আসওয়াদ' কাবার বুকে স্থাপন করে চার গোত্রের তথা সমগ্র বিশ্ব গোত্রের হাতে সাম্য, মৈত্রী এনে দেবে? এ সাহস কার? এর মীমাংসাকারী কে? জটিল হতে জটিলতর হয়ে দাঁড়াল এ প্রশ্ন সবার মাথায়।

এ প্রশ্নের কি সমাধান হয়নি? ন্যায়ের বিচারক হিসাবে কেউ কি সাহস করে এ পাথরটিকে কাবা ঘরে নিজে হতে রেখে গোত্রে গোত্রের মাঝে এক মহামিলন এনে দেন নি? সব গোত্র কি তাঁর এ মীমাংসায় খুশি হয় নি? কাবার সংস্কার হয়ে আজও কি তা মহামিলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়ে রয় নি? সব প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন—আরবের 'আল-আমিন'—তরুণ যুবক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। এ ইতিহাস কি জানতে ইচ্ছা হয় না? রহস্য উদ্ঘাটনের এ আশ্চর্য পন্থা জানবার সাধ কি হয় না? শুনুন কেমন সুন্দর ঘটনা।

কাবার সংস্কার বন্ধ হলো। যুদ্ধের জন্য সবাই তৈরি হলো। আপোষে নয়, মীমাংসায় নয়—তীর, ধনুক ও তরবারিতে হবে মীমাংসা। সংগ্রামে যে টিকবে সেই গোত্র প্রধানই স্থাপন করবে 'হজরে আসওয়াদ' কাবার ঘরে।

এমন সময় জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে ডেকে বললেন,

২—সহীহ বুখারী—আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ১৫০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাবা মন্দিরে প্রবেশ করবে তার উপরেই আমরা এ বিচারের ভার দেব। সে যে বিচার করবে আমরা তাই মেনে নেব। তোমরা আমার এ প্রস্তাবে রাজি আছো?" সবাই এক বাক্যে এ প্রস্তাব মেনে নিল। গভীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল কে সর্বপ্রথম কাবা ঘরে প্রবেশ করে।

দেখা গেল আর কেউ নন, আসছেন সেই 'আল-আমিন'—মুহাম্মদ (দঃ)। খুশির অন্ত রইল না। মুহাম্মদ (দঃ) যে কারো গোষ্ঠীর নন,—মুহাম্মদ (দঃ) যে কারো বিরাগভাজন নন, মুহাম্মদ (দঃ) যে অবিশ্বাসী নন, মুহাম্মদ (দঃ) যে অন্যায় বিচারক নন এ কথা তাঁর শত্রুর মনও বলে দিল। তাই বিচারের ভার তাঁর উপরই দেওয়া হলো।

মুহাম্মদ (দঃ) দেখলেন, তিনি আল্লাহর নবী, সাম্যের গায়ক, পার্থক্যের অবসানকারী, কলহ বিবাদের উচ্ছেদকারী, যুগ যুগের অন্যায় বিচারের প্রতিরোধকারী।

নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। নিজ হাতে এ কাল পাথরটি তুলে এর মাঝখানে রাখলেন। চার গোত্রের চারজন দলপতিকে ডেকে চাদরের চার কোণা ধরে কাবা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে তা বসিয়ে দিলেন। বিবাদ মিটে গেল। হিংসা তিরোহিত হলো। রক্তপাত বন্ধ হলো। প্রেম-প্রীতি ও সাম্যের এক ভিত্তি আল্লাহর ঘরে স্থাপিত হলো।

জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-বিশ্বাস, কঠোরতা ও কোমলতা যার চরিত্রে শোভা পায়, তিনিই ত কেবলমাত্র ন্যায়ের বিচার করতে পারেন। চরিত্রের এ সব অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন এ মহানবী, এ জগদ্‌গুরু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

হোদায়বিয়ার কঠোর সন্ধি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। আবু জোন্দল কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে হযরতের পায়ে আশ্রয় নিয়েও স্থান পেলেন না। ফিরিয়ে দিলেন কোরেশদের হাতে। ওৎবাকে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হবে বলে তাদেরই হাতে সঁপে দিলেন। অথচ ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি নিজ হাতেই তরবারী ধরেছেন। যে কুখ্যাতিনী জয়নব হযরতকে বিষ পান করিয়েছিলেন—তাকে নিজের খাতিরে ক্ষমা করলেও আন্তর্জাতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ন্যায় বিচারের আদর্শ দেখিয়েছেন। এরূপ ঘটনা একটি দুটি নয়, শত শত। ন্যায়ের শাসক ও ন্যায় বণ্টক হিসাবে তাঁর চাইতে বেশি আর কোন নবী, পয়গম্বরই করতে পারেননি। বহু বিবাহ করেও প্রতিটি স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতেন। সম-বণ্টনেই তাঁদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেন। সম ব্যবহারেই তাঁদের মনতুষ্টি সাধন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোন কার্পণ্য বা কাপুরুষতার লক্ষণ দেখা যায় নি। তাঁর নিম্নোক্ত বাণী এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

"যদি আমার কাছে থাকিত 'ইযাহ্ গাছের'[১] সমান সংখ্যক উট ছাগলাদি তবে আমি তাহা বণ্টন করিতাম তোমাদের মধ্যে; তোমরা আমাকে পাইতে না কৃপণ, মিথ্যাবাদী বা কাপুরুষরূপে।"[২]

টীকা: ১। এক প্রকার কাঁটা গাছ।

টীকা:—২,৩। সহীহ বুখারী। আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। জিহাদের মাহাত্ম পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা—১৫৬ এবং ১৫৮।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "কে ন্যায় বিচার করিবে যদি খোদা ও তাঁহার রাসুল না করেন?"[৩]

কাসিম নাম তাঁর সত্যি সার্থক। ন্যায় বিচারক উপাধি তাঁর সত্যিই উপযুক্ত। তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর সমকক্ষ কেউ হতে পারবেন না। কেননা তিনি শেষ নবী। এ কথাও তিনি ঘোষণা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "বনি ইসরাইলদের শাসনকর্তা ছিলেন নবীগণ। যখন এক নবীর মৃত্যু হইত, তখন তাঁহার স্থলে অন্য নবী হইতেন কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হইবেন না। অবশ্য খলিফা হইবেন এবং বহু হইবেন।"[১]

আল্লাহর নিকট যিনি সব চাইতে প্রিয়, আল্লাহর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সংযোগ—তাঁরই 'রহমান' ও 'রহিম' নামের সঙ্গে যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁর সঙ্গে কার তুলনা চলে? আল্লাহকে যিনি ভালবাসেন, মুহাম্মদকে (দঃ) তিনি ভাল না বেসে পারে না। মুহাম্মদকে (দঃ) বাদ দিয়ে আল্লাহকে ভালবাসাও চলে না। সে ভালবাসায় আল্লাহও খুশি হ'তে পারেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও এ কথার আমরা বিচার করতে পারি। যে ছেলে আমার প্রিয়, আমার প্রাণ, আমার আত্মাকে যে ভালবাসে, আমার প্রতিটি কাজে যে সাহায্য করে, আমার সুখে-দুঃখে যে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে, আমার কার্যবিধি ও গুণে যে মুগ্ধ, আমার প্রশংসায় যে পঞ্চমুখ, তাকে উপেক্ষা ক'রে, তাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিয়ে, তাকে উপহাস ক'রে ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে যদি কেউ আমার কাছে এই বলে দাবী করে, 'আমি আপনাকে ভালবাসি'—তা'হলে সে দাবী আমার কাছে কখনই গ্রহণীয় হবে না। উপরন্তু তার উপর আমার আক্রোশ, অভিমান ও রাগ হবে। তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আরববাসী বলে, কোরেশ বংশের বলে, ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলে যদি কেউ ঘৃণা করে, উপহাস করে বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে মানব চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস নিয়ে আল্লাহকে ভালবাসতে যায় বা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী রাখে, তবে উদ্দেশ্য তার সফল হবে না, দাবী তার কার্যকরী হবে না, প্রচেষ্টা তার ফলপ্রসূ হবে না। দেখুন কত সুন্দর উপমা দিয়ে হযরত এ মানব সমাজকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'রহিম' ও 'রহমানের' একই ধাতু। এই জন্য আল্লাহ বলিয়াছেন:—"যে কেহ যুক্ত থাকিবে তোমার সহিত আমিও যুক্ত থাকিব তাহার সহিত এবং যে কেহ বিচ্ছিন্ন হইবে তোমা হইতে আমিও বিচ্ছিন্ন হইব তাহা হইতে।"[২]

এ জগৎগুরু আদেশ ও উপদেশ যদি কেউ মেনে চলে তবে সে শুধু মানুষের মনোরাজ্যই জয় করবে না, বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও অধিকারী হবে। এ ছাড়া আধ্যাত্মিক, পরমাত্মিক তত্ত্বেরও দ্বার উন্মোচন করে হবে জয়ী। মহাকালের মহাবিচারে পাবে মহাপুরস্কার—বেহেশত। হযরতের নিম্নোক্ত বাণী এ কথার সাক্ষ্য দেয়। "আমার সব উম্মত দাখিল হইবে বেহেশতে অস্বীকারকারী ব্যতীত।"

১। সহীহ বুখারী। আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা। ২৫১।

২—সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪ - ৮২৩।আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ, ২য় খণ্ড—পৃষ্ঠা ৩৯৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অস্বীকারকারী কে? এ কথার জবাবে তিনি বলেন,

"যে আমাকে মানে সে দাখিল হইবে বেহেশতে আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই অস্বীকারকারী।'

এ শিক্ষাগুরু শুধু পার্থিব শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। অপার্থিব জগতের শিক্ষাও পাশাপাশি দিয়ে জগৎগুরু নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। এ গুরু তাই মনোরাজ্যে বিচরণ করেন। পার্থিব গুরু শিক্ষার্থীদের মনোরাজ্যে ভ্রমণ করেন। শিক্ষার্থীও গুরুর মনোরাজ্যে স্থান লাভ করেন। কিন্তু গুরু নিঃস্পন্দ হয়ে গেলে তাঁর মনের মাঝে আর শিক্ষার্থীরা থাকে না। কিন্তু এ জগৎগুরুর আত্মা অমর। পরজগতে স্থান লাভ করেও তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্ত অনুসারীদের মনের মাঝেই বিচরণ করেন। দেখুন আমার কল্পনা-প্রসূত এ ক্ষুদ্রতম মনের বিশ্লেষণ ঠিক কি না?

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন—"যদি কাহারও কোন প্রয়োজন হয় তবে সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে এইরূপ মোনাজাত করে—

'ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দয়ালু নবীর অছিলায় আপনার দিকে মোতোওয়াজ্জা হচ্ছি।'

"ইয়া মুহাম্মদ! আমি আপনার অছিলায় আমার প্রভু এবং আল্লাহর দিকে মোতোওয়াজ্জা হই ঐ বাসনা পূরণ করতে তাঁর সাফায়াতকে কবুল করুন।" [তিরমিজী, নেসায়ী ইবনে মাজা ওয়াল হাকাম বর্ণিত—হোসনে হাসিন কেতাব, ১৫১ পৃষ্ঠা]

হযরতকে স্মরণ করে হযরতের বাণীকে ভক্তি ভরে গ্রহণ করে, হযরতের কার্যবিধিকে মান্য করে, তাঁর আদেশ ও উপদেশকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করে লাভবান হয়নি এমন দৃষ্টান্ত বিরল। যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন শুধু মুহাম্মদ (দঃ) নামের সুরা পিয়ে যদি কেউ ধ্যান করে, তবে সে এ অমর মহাপুরুষের দেখা পাবেই। এ দেখা স্বচক্ষে, স্বপ্নে অথবা তার দিব্য দৃষ্টিতে সম্পন্ন হতে পারে। মরেও যিনি অমর, মরেও যিনি দেখা দেন, মরেও যিনি তাঁর ভক্তের প্রতি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, তিনি কি অন্য কোন মহাত্মার সমতুল্য হতে পারেন?

বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন ছিলেন তিনি সহায়, যেমন ছিলেন বন্ধু, যেমন ছিলেন গুরু, মৃত অবস্থায়ও তিনি তেমনি সহায়, বন্ধু ও গুরু।

চোদ্দ-শ' বছর পূর্বে এ মহাপুরুষ এ ধূলির ধরা ত্যাগ করেছেন কিন্তু আজও কি কেউ তাকে ভুলতে পেরেছেন? যতই দিন যায় ততই যেন আকাশে বাতাসে তাঁর নামই প্রতিধ্বনিত হয়, তারই নামে মানুষ পাগল হয়, তাঁরই নামে ধন-সম্পদ উজাড় করে দেয়। আপদেও এ নাম, বিপদেও এ নাম। দুঃখেও এ নাম, সুখেও এ নাম। আহারেও এ নাম, বিহারেও এ নাম। এ নামেই আছে যাদু। এ নামে আছে তৃপ্তি। এ নামেই আছে মহামুক্তি।

পূজা নয়, অর্চনা নয়, কোন উপঢৌকন দিয়ে নয়, লক্ষ লক্ষ প্রেমিক হৃদয় উজাড় করে সে অমর আত্মার কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হাজির হয়। মানুষ মরে গেলে ধূলিতে মিশে যায়। তার গৌরব, মান-সম্মান, ধূলির বুকেই মুছে যায়। অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। মৃত মানুষ জীবিতের তরে কাজ করবে, জীবিতের মনের কথা বুঝে সান্ত্বনা দেবে, জীবিতের জন্য আল্লাহর কাছে কাঁদবে আর সে দেশের মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করবে—এমন আশা কেউ করতে পারে না। এ দুরাশার বুক ছেদন করে যে মহাপুরুষ মুসলিম জগৎ আলোকিত করেছেন, মুমেনের অন্তরে আস্তানা গেড়ে বিরাজিত রয়েছেন, তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তাঁর অছিলায় মদিনাবাসীরা বসে থেকেও খাবার পাচ্ছে। মনে হয় যেন দুনিয়ার মানুষ পাগল হয়ে সেই মদিনাবাসীদের জন্যই ছুটছে আর নিজের টাকা পয়সা সেখানে খরচ করে শান্তি কিনে আনছে। হযরতের সাক্ষাৎ লাভ করতে গিয়ে মদিনাবাসীদের বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে আর আদর করে তাদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী। কবরে শুয়ে থেকেও যিনি দীনদরিদ্রের আহার যোগান, কবরের মাঝে থেকেও যিনি প্রেমের সৌরভ ছড়িয়ে দেন, কবরের অভ্যন্তরে থেকেও যিনি ভক্তের জন্য দিবানিশি কাঁদেন, তাঁর চেয়ে মহান, তাঁর চেয়ে উদার, তাঁর চেয়ে শক্তিশালী গুরু আর কে আছেন? এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন,

"তুমি বল—যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবেন।"

কি পন্থায় হযরত সুপারিশ করবেন, কিভাবে তাঁর উম্মতদের দোজখ হতে মুক্ত করবেন—সুপারিশের আর একটি তত্ত্বমূলক হাদিস থেকে আমরা তা জানতে পাই। এটাই হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বশেষ প্রমাণ। এ প্রমাণ দিয়েই তাঁর নিজস্ব পরিচয় পরিচ্ছেদ এখানে শেষ করছি।

মানুষ বিচারের দিন বিভ্রান্ত মৌমাছির মত যখন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, পুণ্যের জন্য ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে, সুপারিশের জন্য দেবদেবীর কাছে ধর্ণা দেবে, বাপ-মা ও ভাই বোনদের কাছে কাকুতি-মিনতি করবে তখন কেউ কারো ডাকে সাড়া দেবে না। নিজেদের জন্য নিজেরাই হবে ব্যস্ত। তারপর তারা যাবে ঈসা (আঃ) এর নিকট। তিনি বলবেন, "ইহা আমার কাজ নহে। যাও মুহাম্মদ (দঃ) এর নিকট।"

হযরত বলেন, 'তখন তাহারা আসিবে আমার নিকট এবং আমি বলিব, উহা আমারই কাজ। তখন আমি আমার প্রভুর অনুমতি চাহিব এবং অনুমতি দেওয়া হইবে আমাকে; এবং তিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন তাঁহার প্রশংসাবলী—যাহা দ্বারা আমাকে প্রশংসা করিতে হইবে। উহা এখন আমার মনে নাই। তারপর আমি প্রশংসা করিব ঐ বাণীর যোগে এবং সেজদায় পড়িব তাঁহার সম্মুখে। তখন বলা হইবে, "হে মুহাম্মদ! উঠাও তোমার মস্তক। চাও, দেওয়া হইবে তোমাকে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে তোমার সুপারিশ।"

অতঃপর আমি বলিব, "প্রভু আমার। আমার উম্মত,—আমার উম্মত।'

তখন বলা হইবে, "যাও দোজখের দিকে এবং বাহির কর উহা হইতে যাহার অন্তরে আছে যব-কণা পরিমাণ ঈমান।'

আমি যাইয়া তাহাই করিব। তারপর ফিরিয়া আসিয়া প্রশংসা করিব ঐ প্রশংসা বাণীর যোগে এবং সেজদায় পড়িব তাঁহার সম্মুখে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন বলা হইবে, 'হে মুহাম্মদ! উঠাও তোমার মস্তক এবং বল, শোনা হইবে তোমার কথা, দেওয়া হইবে তোমাকে; সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে তোমার সুপারিশ।'

তারপর আমি বলিব, 'প্রভু আমার! আমার উম্মত, আমার উম্মত।'[১]

তখন বলা হইবে, "যাও এবং বাহির কর—যাহার অন্তরে আছে অণু পরিমাণ ঈমান, বাহির কর তাহাকে দোজখ হইতে।'

অতঃপর আমি যাইয়া তাহাই করিব। তারপর আমি পুনরায় ফিরিয়া প্রশংসা করিব তাঁহার ঐ প্রশংসাবাণীর যোগে এবং সেজদায় পড়িব তাঁহার সম্মুখে।

তখন বলা হইবে, "হে মুহাম্মদ! উঠাও তোমার মস্তক। এবং বল, শোনা হইবে তোমার কথা; চাও; দেওয়া হইবে তোমাকে, এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে তোমার সুপারিশ।'

তারপর আমি বলিব, প্রভু আমার! আমাকে অনুমতি দাও তাহাদের মধ্যে যাহারা বলিয়াছেন,—'নাই কোন উপাস্য—আল্লাহ ভিন্ন'—তাহাদের সম্বন্ধে।

তখন তিনি বলিবেন, 'কসম আমার ক্ষমতার ও আমার গৌরবের, আমার মাহাত্ম্যের ও মহিমার; আমি বাহির করিব দোজখ হইতে তাহাদেরও যাহারা বলিয়াছে 'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন।"[২]

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিচয় যারা এতদিন পান নি তাঁর মাহাত্ম্য, গৌরব ও ক্ষমতার মাপকাঠি যারা এতদিন বিচার করেননি, তাঁরা দেখুন ও বিচার করুন এ মহামানব সত্যি জগদ্‌গুরুর আসন দখল করার উপযুক্ত কিনা! এ গুরু শুধু মুসলিম জাহানের গুরু নন, এ গুরু শুধু সাধক কুলের গুরু নন—এ গুরু শুধু নবী কুলের গুরু নন, সমগ্র মানব জাতির গুরু। তাই শুধু মুসলমানের জন্যই নয়—যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, আল্লাহর অস্তিত্বে যার সামান্যতম বিশ্বাসও আছে, তার জন্যই তিনি কাঁদবেন, তার জন্যই প্রার্থনা করবেন, তাকেও তিনি দোজখ থেকে বের করে আনবেন। এতটুকু ঈর্ষা তাঁর অন্তরে আসবে না যে, সে আমাকে (মুহাম্মদকে (দঃ) বিশ্বাস করে নি— কেন তার জন্য সুপারিশ করব। আল্লাহকে তিনি ভালবাসতেন। তাই যে পাপী শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে অথচ মুহাম্মদকে (দঃ) বিশ্বাস করে নি তার জন্যও তিনি কাঁদবেন ও সুপারিশ করবেন। কেননা যে আল্লাহকে ভালবেসেছে, মুহাম্মদ (দঃ) তাকেই ভালবেসেছেন—এটাই তিনি প্রমাণ করবেন।

কী অদ্ভুত! কী করুণাময় হৃদয়! কী মাহাত্ম্য! কী মহাসাগরের মায়া! কী সীমাহীন মহাকাশের দয়া! জাতিভেদের প্রশ্ন এখনও কি জাগে? সংকীর্ণতা এখনও কি মনের মাঝে উঁকি দেয়? শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস করে যদি মুহাম্মদ (দঃ)-এর হাতে মুক্তি হয়, যে মুক্তি আর কেউ দিতে পারবে না—তবে কেন শুধু বলবেন, 'নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন'? এর সঙ্গে সেই মুক্তির দিশারী, বিপদের কাণ্ডারী মুহাম্মদ (দঃ)-এর নাম যুক্ত করে কেন বলবেন না—**"নাই কোন উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন যার প্রেরিত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ?"**

আপনি বিশ্বাস না করলেও দেখুন বিশ্ব মনীষীরা কত পূর্বেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর মুহাম্মদকে (দঃ) মুক্তির দূত বলে স্বীকার করে ভক্তিভরে মাথা নত করেছেন এবং নিজেদের পরিত্রাণের পথ তাঁরা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

১। কোরআন, সূরা আল-ইমরান, ৪র্থ রুকু, আয়াত ৩১।

২—সহীহ বুখারী। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত — (হাদিস নং ৯-১০৪২, পৃষ্ঠা ৫৬৪-৫৪৭)

বিশ্ব মনীষীরা কি বলেছেন?

তেজোদীপ্ত ভাস্কর সমুদিত হবার প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্বেই এ শুভ্র জ্যোতিঃরেখা তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করে। এ বার্তা পেয়ে পশু-পক্ষী, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, মানব-দানব সবাই সচেতন হয়ে উঠে এবং এর আগমন প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্তে তারা পুলক অনুভব করে। রক্তিম সূর্য তাদের প্রাণে এনে দেয় এক নুতন স্পন্দন। শরীরের অণু-পরমাণুতে দিয়ে দেয় অফুরন্ত প্রেরণার উৎস, আর হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে ঝঙ্কার ধ্বনি দিয়ে তুলে মধুর সুর—যে সুরে বেজে উঠে প্রাণের বীণা।

কে না জানে এক মহাতেজোদীপ্ত মরুভাস্কর মরুর দিক-দিগন্ত আলোকিত করে যখন উদ্ভাসিত হয়েছিল তখন শুধু পূর্ব গগনেই তার শুভ্র জ্যোতিঃরেখা বিস্তার লাভ করে নি—করেছিল এ মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে। তাই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, সাগর-মরু, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, জ্বীন-ইনসান হয়ে উঠেছিল ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত। মহা অতিথির মহা আগমনে মহাজগতে পড়েছিল এক মহাসাড়া। কে কার আগে সালাম দিয়ে ধন্য হবে, কে কার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আনুগত্যের সিলমোহর নেবে, কে কার আগে কর্মকুশলতা দেখিয়ে ললাটে বিজয় মুকুট পরিধান করবে—চলল তার প্রতিযোগিতা। ধর্মের বাঁধন টুটে গেল, দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটল, রেষারেষি ছিন্ন হলো। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির মহাপুরুষগণই সাদর সম্ভাষণ জানাতে তৈরি হলেন আর জয় উল্লাসে ঘোষণা করলেন তাঁর এই আগমন বার্তা। সাবধান করে দিলেন স্বজাতিকে, সাবধান করে দিলেন স্বগোত্রের পরিবারকে, সাবধান করে দিলেন অবিশ্বাসী, অত্যাচারী ও ভণ্ড সমাজকে। দেখুন, কথাগুলো সত্য কি না।

ধর্মনেতাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

হিন্দুধর্ম প্রণেতা মনু বলেছেন—

(১) "হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো[১] জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মনং অল্লাম। ২ ॥
অল্লোহরসল্ল মহমদরঃ[২] কং বরস্য অল্লো অল্লাম।
আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকং নির্খাত কম ॥ ৩ ॥

[অল্লোপনিষদ—সপ্তম পরিচ্ছেদ]

অর্থাৎ "আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহা ইন্দ্রের ইন্দ্র। আমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পরমপূর্ণ ব্রহ্ম। আমি আল্লাহ। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের তুল্য আর কে আছে? আমি আল্লাহ। আল্লাহ সহায়, অবিনশ্বর, এক এবং স্বয়ম্ভূ।"

আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এ মহা-মনীষী 'মনু' বলেছেন যে

টীকা—১ 'আল্লাহ্' শব্দ সংস্কৃতে "অল্লো' বলা হয়।

২। 'মুহাম্মদ'— শব্দ সংস্কৃতে 'মহমদ' বা মহামত বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (দঃ)-যাঁর তুল্য এ বিশ্বে আর কেউ নেই। এমন সুস্পষ্ট ও সত্যবাণী প্রচার করা সত্ত্বেও যারা 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করতে ও মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত পয়গম্বর বা রাসুল এ কথা বিশ্বাস করতে চান না তাঁরা দেখুন এ মহান ব্যক্তি কোন ভাষায়, কোন আবেগে আল্লাহ ও রাসুলের প্রশংসাগীতি গেয়েছেন।

(২) **আল্লাহ রসল্ল মুহাম্মদরঃ কং বরস্য অল্ল অল্লাম।**
ইল্ললোতি ইল্ললা ॥ ৯ ॥ [অথর্ববেদ উপনিষদ]

অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই।

(৩) **"লা ইল্‌হা হর্‌তি পাপম্ ইল্ল ইল্‌হা পরম পদম।**
জন্ম বৈকুণ্ঠপর অপ্ ইনুতিত জপি নাম মোহাম্মদম্।"

[উত্তরায়ণ বেদ, অন্ কাহি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

অর্থাৎ "লা-ইলাহা বললে সমস্ত পাপ মাফ হয়। ইল্লাল্লা বললে প্রচুর সম্মানের অধিকারী হয়। যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মুহাম্মদের নাম জপ কর।"

উপরে উদ্ধৃত মন্ত্রটি "অন-কাহি বা অন-কথা' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। এ মন্ত্রটির গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম। অন্ সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ 'না'। এই অন্-কাহি বা অন-কথা দ্বারা এটাই বুঝায় যে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই'।

'লা ইল্‌হা'—সংস্কৃত শব্দের আরবী উচ্চারণ 'লা-ইলাহা' অর্থাৎ কোন মা'বুদ নেই বা কোন উপাস্য নেই।

ইল্লা-ইল্‌হা—এই সংস্কৃত শব্দের আরবী উচ্চারণ 'ইল্লাল্লা'—এর অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া।

তা'হলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার লা-ইল্‌হা ইল্লাইল্‌হা—আরবীতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা'—যার বাংলা অর্থ 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই'। এ মন্ত্র হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র জাতিরই মূল মন্ত্র। এ বাণীর উপর বিশ্বাস না আনলে 'কাফের'—অর্থাৎ আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী বলেই আখ্যায়িত হতে হবে। এ কাফেরদের পুরস্কার নরক বা দোজখ—এ কথা প্রতিটি ধর্ম-প্রণেতাই বলে গেছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু সমাজের একটা রীতি আছে যে মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ঘর হতে বের করে মুক্ত আকাশের নিচে তুলসী তলায় রাখা হয় এবং তার কানে "অন-কথা' পাঠ করা হয়। এই "অন-কথা' কানে দেবার পর নাকি তার কষ্টের লাঘব হয় এবং অতি সহজে প্রাণবায়ু বের হয়। এই "অন-কথার' ফলেই নাকি আত্মার মুক্তি হয়—এবং পরকালে পরিত্রাণ পায়। এর রহস্য অমুসলিমদের জানা ছিল না। হিন্দু ভাইগণও এ গুপ্ত-ভেদ সমাজে কোনদিন প্রকাশ করেন নি। সারা জীবন পূজা-অর্চনা করে মুক্তির পথ হয় না, অথচ এই 'অন-কথা' উচ্চারণ করে মৃত্যু সহজ হয়, পরকালের পথ পরিষ্কার হয়, আত্মা কষ্টের হাত থেকে লাঘব পায়।

কি জবাব দেবেন কুলীন হিন্দু ব্রাহ্মণ ভাইয়েরা? নিজ স্বার্থের বশে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোটি কোটি নিরীহ, অশিক্ষিত ও সরলপ্রাণ ব্যক্তিদের ধোঁকা দিয়েছেন—নরকের সহজ পথ ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনার উপায় কি ? নিজেরা মনে মনে হয়ত জপছেন—'লা-ইল্‌হা ইল্ল-ইল্‌হা'—আর অপরকে বলেছেন মুসলমান অস্পৃশ্য, এরা শূদ্রের চেয়েও নিকৃষ্ট। 'লা-ইলাহা'—এ মহামন্ত্র কাউকে শিখতে দেন নি। হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) পয়গম্বর—শেষ মুক্তির দূত বলে তাঁর নামে মালা জপেন নি। অন-কথায় কি শুনালেন?

"যদি চিরতরে স্বর্গে বাস করতে চাও তবে মুহাম্মদ নাম জপ কর।"

জপের সময় দিলেন কোথায়? হিন্দু ভাইয়েরা! এখনও কি আপনাদের জ্ঞান ফিরবে না? মুক্তির লাগি, স্বর্গে বাসস্থানের লাগি মুহাম্মদের (দঃ) নাম ধরে অশ্রু বিগলিত সুরে বললেন না—তুমিই মুক্তির দিশারী, তুমিই মুক্তির কাণ্ডারী, তুমিই পথ প্রদর্শক, তুমিই সমগ্র মানব জাতির শান্তির দূত, তোমাকে সালাম।

হয়ত প্রাণে বেশ আঘাত লাগবে। কেননা আমি মুসলমান এমন ধারাল কথা বলছি। হিংসার বশে নয়, জেদের বশে নয়, আপনাদের মুসলমান করবার বাসনাতেও নয়—সত্যের বাণী, আল্লাহর বাণী ও মহামনীষী মনুর মুখ-নিঃসৃত কথাই শুনাব; নইলে আমি ভীরু, কাপুরুষ। শুনুন, এ মহানবীর উপর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেমন সুললিত কণ্ঠে 'মনু' সালাম জানাচ্ছেন ঃ

"উপ নরং নোত্তমসি সুক্তেন বচসা বর্ষ ভদ্রেন বচসা বয়ম।
চনো দধিষ্ব নো গিরো ন রিষ্যেম কদাচন ॥ ১৪ ॥

(অথর্ব্ববেদ—সংহিতাকাণ্ড ২০ ॥ ১২৩ ॥ ১—১৪)

অর্থাৎ—"আমরা মহানবীর প্রশংসা গান গাই এবং শ্রুতিমধুর স্বরে তাঁরই মহিমা কীর্তন করি। হে বীর! সানন্দে আমাদের এই স্তুতিগান গ্রহণ করুন—তাহলে আমরা বিপদমুক্ত থাক্‌ব।" (হিন্দু টীকাকার)

এ উপদেশ শুধু 'বেদেই' নয়—কোরআনেও আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ সর্ব ধর্মের মানব জাতিকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন :

"ইয়া আয়ুহাল্লাজিনা আমানু সাল্লা আলাইহে ওয়া সাল্লামো তাস্‌লিমা।" (কোরআন)

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ! তাঁহার উপর (মুহাম্মদের) দরুদ ও উত্তমভাবে সালাম জ্ঞাপন কর।"

এ দরুদ পাঠের উপকারিতা কি আগ্রহান্বিত হিন্দু ভাইয়েরা তা জেনে নেবেন। বৈদিক ঋষির মতে এ দরুদ পাঠে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় এবং বিপদ-আপদ দূর হয় এবং মুক্তির সহজ পথ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজে বলেছেন : "যখন কেহ আমার উপর সালাম প্রেরণ করে তখন আল্লাহ আমার আত্মা আমার নিকট পাঠান এবং আমি তার উপর সালাম ফেরৎ দেই।" (হাদিস)

অন-কথার—লা-ইল্‌হা ইল্ল-ইল্‌হা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এর বাহক হযরত মুহাম্মদের কিছুটা পরিচয় জানলাম। তাঁর সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করছি।

এই মহামন্ত্র **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'**—পাঠ করলে ইসলামের মতানুযায়ী বেহেশতে প্রবেশ করা যায়। মৃত্যুর পূর্বে এক কলেমা পাঠ করলে খাঁটি মুসলমান রূপে মৃত্যু হয়। যাদের মুখে এ বাণী আসে না তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। আত্মার চরম উৎকর্ষ ও পাপ মার্জনার জন্য এমন বাণী আর নেই। তাই ঋষি, মহাঋষি, অলি, গাউস, ফকির, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী, নবী, পয়গম্বর সবাই এই একটি বাণীরই সাধনা করেন। এ বাণীতেই তাঁরা পাগল। তপস্যার জন্য এর চেয়ে মূল্যবান আর কোন বাণী নেই।

(ধ্যান বা তপস্যার সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—এ পর্যন্তই বলতে হয় এবং নির্দিষ্ট বার পাঠ করার পর **'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'** বলতে হয়। এর বিশেষ নিয়ম আছে। ওলি, গাউস বা কামেল পীরদের নিকট জেনে নেবেন।)

এ কলেমা পাঠেই হযরত আদম (আঃ)-এর পাপ মাফ হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ) মহাপ্লাবনেও রক্ষা পেয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও সুরক্ষিত হয়েছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্রাট আকবর এর শাসন আমলে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হন। তাঁদের মধ্যে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অন্যান্য হিন্দুদের উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন :

"সত্য ব্রাহ্মণ বা সত্য হিন্দু হইতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে, নতুবা হিন্দু শাস্ত্রের অবমাননা করা করা হয় এবং তদ্রূপ ক্ষেত্রে হিন্দু বলিয়া আত্মপ্রকাশ করাও অন্যায় ও যুক্তিহীন।"[১]

বিশ্ব নবীর আগমন-বার্তা প্রতিটি ধর্মের মহামনীষীরাই দিয়ে গেছেন একথা আমি বহুবার উল্লেখ করেছি এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হতে এর উদ্ধৃতি দিয়েও প্রমাণ করেছি যা আপনারা বিভিন্ন পরিচ্ছেদেই দেখতে পাবেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উপরই আলোচনা করছি। এখান থেকে যতটুকু সম্ভব হযরতের পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

'কুন্তাপসুক্তে"[২] বলা হয়েছে :—

"ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে
ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আ রুষমেষু দম্মহে।" ১॥

(বেদ-কুন্তাপসূক্ত-প্রথম মন্ত্র সংগৃহীত 'বেদপুরাণে হযরত মুহাম্মদ' কৃত, ডক্টর, মোহাম্মদ কুদরতুল্লাহ)

অর্থাৎ—"হে জনগণ! সসম্মানে ইহা শ্রবণ কর। জনগণের যশস্বী পুরুষের স্তুতিগান হইবে। হে আরামপ্রিয় রাজন! ষাট হাজার নব্বই জন তাহাদের শত্রুদিগকে নির্মূল করিতেছে।"

[পণ্ডিত খেমকরণ (এলাহাবাদ) অনুবাদ হতে গৃহীত]

এ মহামন্ত্রগুলো পাঠ করতে বেদে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহাপুরুষের স্তুতিগান গেয়ে প্রতিটি হিন্দুরই ধন্য হওয়া উচিত।

কে সে মহাপুরুষ? কার আবির্ভাবের সংকেত হাজার হাজার বছর পূর্বে বেদে উল্লেখ

টীকা—১: সংগৃহীত—'বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) (কলির অবতার)'—কৃত ডক্টর মোহাম্মদ কুদরতুল্লাহ্।

টীকা—২: 'কুন্তাপসূক্তের' অর্থ: বেদের বিংশতি পরিচ্ছেদকে 'কুন্তাপসূক্ত' বলা হয়। সূরা ইয়াসিনকে যেমন কোরআনের ক্বলব বলা হয়, তেমনি কুন্তাপসুক্তকেও বেদের আত্মা বলা হয়। সূরা ইয়াসিন পাঠে যেমন পাঠক কচি শিশুর মত নিষ্পাপ হয় তেমনি এ 'কুন্তাপসূক্ত' পাঠেও হিন্দুগণ নিষ্পাপ হন বলে তাঁরা বলে থাকেন। বেদের এই গূঢ় অর্থবোধক মন্ত্র ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত মাত্রই অতি সমাদরে কণ্ঠস্থ করেন। নতুন বছর আরম্ভ হলে ১৭ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একযোগে শ্রুতিমধুর কণ্ঠে সূক্ত গুলো একবার পাঠ করেন। এবার আমরা দেখি এ কুন্তাপসূক্তের প্রকৃত অর্থ কি? কেনই বা এ সূক্ত বেদের মূল অংশ বলে আখ্যায়িত। কার প্রশংসায় এ সূক্ত রচিত। এ অংশটুকুতে কোন কৃত্রিমতা নেই। এর বিশুদ্ধতার ও অকৃত্রিমতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আজও দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

'কুন্তাপ'—শব্দকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়—কুঃ+তাপ

'কুঃ'—দ্বারা পাপ বুঝায়। তাপ শব্দ 'তপ' হতে নির্গত; 'তপ'—অর্থ দহন করা। তাহলে 'কুন্তাপ'-শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—বেদের যে অংশটুকু পাপ দহন করে।

"কুন্তাপ"—শব্দদ্বারা আরোও দুটি অর্থ বুঝায়, যেমন নাভি, উদর। কুন্তাপসূক্তে—বেদের নাভি বা উদর অর্থও বুঝায়।

করা হয়েছে? 'যশস্বী পুরুষ' বা প্রশংসিত পুরুষ বলতে দুনিয়ার বুকে একজনকে বুঝায়—'মুহাম্মদ' (দঃ) যার নামের অর্থ প্রশংসিত বা যশস্বী। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে আরবে তখন ৬০০৯০ জন অধিবাসী ছিল যারা প্রথম অবস্থায় হযরতের শত্রু ছিল। তারা হযরতকে বহু নির্যাতন করেছে, এমনকি প্রাণে বধ করার পরিকল্পনাও করেছে। যার ফলে তাঁকে আরব থেকে মদিনায় প্রস্থান করতে হয়েছিল। এই আরবের ৬০০৯০ জনকেই রুষম বা শত্রু বলা হয়। ব্যাখ্যায় যদি তবুও কারো মনে সন্দেহ হয় তবে কুন্তাপসূক্তের পরবর্তী শ্লোকগুলো দেখুন, সেখানে কি বলা হয়েছে। কোন্ নাম ধরে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে।

'অমস্বন্তা সতপতি র্মামহে মে গাব তেতিষ্ঠো অসুরো মঘীনঃ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানরঃ ত্রয়ং রুণাশ্চিকেত ॥

[ঋগ্বেদ ৫, ২৭, ১]

অর্থাৎ "সারথি, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, অতি বুদ্ধিমান, শক্তিমান, দয়ালু মামহ (মোহাম্মদ) তাঁহার বাণীদ্বারা আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। সর্বশক্তিমানের (আল্লাহর) দাস, সর্বগুণসম্পন্ন, বিশ্বের শান্তিবাহক দশ সহস্র সহচরসহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।"

[বঙ্গানুবাদ, হিন্দু টীকাকার]

উপরে বর্ণিত বাণীটির প্রতিটি শব্দই হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য। অন্য কারো জন্যই নয়। এ ছাড়া দয়ালু 'মামহ' বলে তাঁর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। আল-আমীন বা সত্যবাদী হিসাবে শৈশবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। রহমাতুল্লিল আলামিন বিশ্বের করুণাশীল বা বিশ্বের শান্তি উপাধি আল্লাহরই দেওয়া, অন্য কারো নয়। এর প্রতিটি শব্দের উপরই বিভিন্নস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু ইতিহাসের ঘটনাটি উল্লেখ করে দশ হাজার সহচরসহ কিভাবে তিনি বিজয়ী হলেন এটাই সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

হযরতের 'মক্কা বিজয়' ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল ঘটনা। মাত্র দশ হাজার সহচরসহ তিনি মদিনা হতে মক্কা অভিযানে গেলেন। এ সহচরদের মধ্যে ছিল নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি শ্রেণীর সাহসী বীর মুজাহিদ। 'মক্কা'—হযরতের জন্মস্থান, প্রাণপ্রিয় ইব্রাহিমের (আঃ) আবাসস্থল, সারা বিশ্বের কেন্দ্র—তাঁকে জয়লাভ করতেই হবে; এ পবিত্র ও সুদৃঢ় কল্পনাই ছিল এ অনন্যসাধারণ বীর সেনানীর। কেউ ভাবতেও পারেন নি বিনা যুদ্ধে; বিনা রক্তপাতে এ হিংস্র ৬০ হাজার পশুর দল হযরতের পদতলে লুটিয়ে পড়বে আর তাঁরই হাত স্পর্শ করে **'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'** বলে ইসলাম কবুল করে ধন্য হবে।

এ মহান হৃদয়, এ করুণার সাগর, এ দয়ালু 'মামহ' (মুহাম্মদ দঃ) কারো উপর প্রতিশোধ নিলেন না, কাউকে বন্দী ক'রে কারাগারে নির্মম জ্বালা সহ্য করতে পাঠালেন না। অত্যাচারের প্লাটফরমে তুলে তাদের চক্ষু উপড়িয়ে ফেললেন না। সবাই ভেবেছিল- মুহাম্মদ এলে নিস্তার নেই। দুশমনদের হাড় হাড্ডি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অতীতের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কিন্তু সবারই ধ্যান-ধারনা বিপরীত করে হযরত যখন ঘোষণা করলেন-

'আজ তোমরা মুক্ত। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন প্রতিশোধ নেই।'[১]

---

১ -হযরতের এ মহানুভবতার কথা কোরআনও সাক্ষ্য দেয় "লাতুশরেবো আলাইকুমুল ইয়াওমা"-(আজ তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেই।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আকাশ, বাতাস প্রকম্পিত করে ধ্বনি উঠল– **'আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।'** হযরত মক্কা বিজয় করলেন। পবিত্র কাবায় গিয়ে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে শুকুর আদায় করলেন। অশ্রু-বিগলিত হৃদয়ে মানব জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করলেন। রক্তের খেলা বন্ধ হলো। হিংসা বিদ্বেষের মূল উপড়ে গেল। কাবায় ৩৬০টি পাষাণ প্রতিমা চিরতরে ধূলির সঙ্গে মিশে গেল। কায়েম হলো ইসলামী রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠা হলো শান্তি– অপার শান্তি। মহান ঋষি এ কথাও সাক্ষ্য দিলেন তাঁর মহান বাণীতে–

"পরিক্ষিণ্ন ঃ ক্ষেমমকরুন্তম আসনমাচারণ।
কুলারং কৃণবন কৌরব্য পতির্ব্বদতি জায়্যা" ॥ ৮ ॥

[বেদ–কুন্তাপসূক্ত–অষ্টম মন্ত্র]

অর্থাৎ, "যিনি সকলের আশ্রয়দাতা, তিনি সিংহাসনে আরোহন করিবামাত্র জগতের শান্তি স্থাপন করিলেন। কুরুক্ষেত্রে[১] লোকগণ গৃহ নির্মাণ কালে তাহার শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিতেছে।" [বঙ্গানুবাদ, হিন্দু টীকাকার]

বেদে এরূপ বাণী আমরা আরও দেখতে পাই, যেমন–

"কতরত ত আ হরাণি দধি মন্থাং পরিস্রুতম।
জায়া পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাক্ষ পরিক্ষিতঃ" ॥ ৯॥

[বেদ কুন্তাপসূক্ত নবম মন্ত্র)

অর্থাৎ– "শান্তি প্রতিষ্ঠাতা সংরক্ষক রাজার রাজ্যে পত্নী স্বীয় পতিকে দধি বা অন্য পানীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার আদেশ প্রার্থনা করে।"

দাম্পত্য জীবনে শান্তি স্থাপন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। নারীর কর্তব্য কি, স্বামীর রুচি অনুযায়ী তার জন্য কি ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা দরকার, কিভাবে স্বামী সুখী হয় এ সব জিজ্ঞাসাই ছিল এ বাণীর মাঝে। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে নারীরা ছিল ঘৃণিত, অবহেলিত ও অনাদৃত। নারীদের স্বাধীনতা যেমন ছিল না তেমনি স্বামী সেবারও তদ্রূপ সুযোগ ছিল না। এখন নারীরা মুক্ত মনে জানতে চায় সমাজের কি সেবা তারা করবে। স্বামীর প্রতি কোন আচরণ তার হৃদয় জয় করবে।

রাজ্যের জনসাধারণ নারী-পুরুষ সবাই যে দ্রুততর উন্নতির পথে চলতে থাকবে এ মহামানবের শাসন ব্যবস্থায় তার আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ–

প্রজিহিতে যবঃ পক্ক পরো বিলম।
জনঃস ভদ্রমেঘতে রাষ্ট্রে রাক্ষঃপরিক্ষিত'।। ১০॥

[বেদ–কুন্তাপসূক্ত –দশম মন্ত্র)

অর্থাৎ–" পাকা যব ফাটল হইতে গজাইয়া আকাশের দিকে উঠে। সংরক্ষণকারী রাজার রাজ্যে প্রজাগণ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।" মাটির নিম্নে যব যেমন লুক্কায়িত থাকে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা গজাইয়া উঠে এবং শূন্যে বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব জাতি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সংস্পর্শে এসে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করল এবং উন্নতির চরম সীমায় আরোহন করল।

টীকা ঃ ১–কুরুক্ষেত্র, এখানে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। মহাভারতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ননা আছে। বৈদিক ঋষি হিন্দুদের বুঝানোর জন্য কৌরব শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দ প্রয়োগ সমুচিত হয়েছে। 'কৌরব' এর অর্থ গৃহনির্মাতা বা মিস্ত্রী। কাবার নির্মাণের সময় এরূপ এক তুমল যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল।

ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ-পাক হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) যে নির্দেশ দেন তা আমরা দেখতে পাই কোরআনে, যেখানে বলা হয়েছে–

"হে বসনাবৃত ব্যক্তি! উঠো এবং লোকদিগকে সাবধান কর এবং তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর।" [কোরআন–সূরা মুদ্দাচ্ছের]

ঠিক অনুরূপ বাণী কুন্তাপসূক্তের একাদশ মন্ত্রেও দেখা যায়। সেখানে নিম্নরূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

"ইন্দ্রঃ কারুমবৃ বুধদন্তিষ্ট বি চরা জনম্।
মমেদু প্ররুষ চকৃধি সব ইততে পরিণাদরিঃ" ॥ ১১॥

অর্থাৎ-"ইন্দ্র স্তুতিপাঠককে জাগ্রত করিলেন এবং দিকে দিকে লোকের নিকট গমন করিবার আদেশ করিলেন। তিনি প্রবল ইন্দ্রের যশোগানে আদিষ্ট হইলেন। সকল ধার্মিক লোক তাঁহার উদ্যমের মর্যাদা উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।"

(বঙ্গানুবাদ –হিন্দু টীকাকার)

অনেকেই হয়ত বলতে পারে এ বাণী হযরত মুহাম্মদের প্রতি নির্দেশ করছে তার প্রমাণ কি? হাজার হাজার বছর আগের এ বাণী কিরূপে হযরতকে ধর্ম প্রচার করার জন্য নির্দেশ দান করবে।

হযরতের আবির্ভাবের ঘোষণাই বেদের এ অংশটুকু করছে এ প্রমাণ আমি বেদের বাণী ধরে প্রথম হতেই করে আসছি। একই ব্যক্তির জয়গানে এ মহাঋষি মনু কিভাবে তন্ময় হয়ে পড়েছেন সেটাও দেখিয়েছি। আরও দেখুন– কে বিশ্বসম্রাট, কে দেবতাদের দেবতা, কে সারা বিশ্বের আলোকবর্তিকা হয়ে চির অন্ধকার বিদূরীত করলেন। আশা করি, পরবর্তী বাণীগুলো গভীরভাবে চিন্তা করলে সন্দেহের কীট আর দংশন করে আপনার মস্তিষ্ককে পীড়া দেবে না। সুস্থ দেহে আপনার মানবচোখে ভেসে উঠবে ঐ একটি ছবি যার স্তুতিগানে আপনিও হবেন বিভোর– এই বলে ঃ

"রাক্ষো বিশ্ববজনীনস্য যে দেবোমর্ত্যা অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্ঠুতিমা শৃণীত, পরিক্ষিত ঃ" ॥ ৭॥

[বেদ–কুন্তাপসূক্ত –সপ্তম মন্ত্র)

অর্থ্যাৎ– "বিশ্বরাজের বিশ্বজ্যোতির উচ্চ প্রশংসা কর। তিনি মানবশ্রেষ্ঠ দেব; মানবের পথ প্রদর্শক এবং আশ্রয়দাতা। (বঙ্গানুবাদ –হিন্দু টীকাকার)

যে সব গুণরাজিতে 'মনু' হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) ভূষিত করেছেন তার প্রতিটি শব্দই সত্য। এসব বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শুধু কোরআনের একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা প্রতিটি মানবজাতির জন্যই গ্রহণীয় ও সমাদৃত হবে।

"নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসুল আগমন করিয়াছেন, তোমরা বিপদাপন্ন হও ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য, তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাসীগণের জন্য স্নেহশীল করুণাময়।" (কোরআন–সূরা তওবা। আয়াত–১২৮)

কেন্দ্রস্থিত একটি বিশাল চুম্বকের দ্বারা যেমন পার্শ্বস্থিত সব কিছুই আকৃষ্ট হয় তেমনি আকর্ষণকারী এ শক্তিশালী পথপ্রদর্শক ও আশ্রয়দাতার কোলে স্থান নেবার জন্য যুগ যুগের মহামনীষীরা তাঁদের অনুচরদের কতভাবেই না নির্দেশ দিয়েছেন। হতভাগা সেই জাতি যারা তাঁদের নির্দেশ পালন করেন নি। স্কুল-কলেজের মহান শিক্ষকগণ কতভাবেই না ছেলেদের শিক্ষা দেন। গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ (Important chapters) সমূহ লাল কালিতে চিহ্নিত করে দেন এবং হুঁশিয়ার করে দেন যে পরীক্ষার জন্য এগুলো আসবেই আসবে। সজাগ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ তাঁহার রথ বিশিষ্ট উট টানিয়া নেয়; তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রীগণও আছেন। তাঁহার রথের শিরোভাগ মর্গধাম স্পর্শ করিয়া নিচে নামিয়া আসে।

সংস্কৃত ভাষায় 'রথ' এর অর্থ যানবাহন। যেমন সংস্কৃতে বলা হয় "স্বর্ণরথে সূর্যদেব ভ্রমণ করেন"। [ঋক বেদ। ১ ঃ ৩৫, ২]

মন্ত্রের শেষ লাইন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এ মহাপুরুষ 'মার্গধাম' অর্থাৎ আকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে আবার এ পৃথিবীতে নেমে আসেন। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) পুস্তকের ৩য় খণ্ডে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আকাশের শেষ সীমা 'সিদ্‌রাতুল-মুন তাহা'– এ পর্যন্তই এ রথ বা বোরাক হযরতকে নিয়ে পৌছিলেন এবং হযরত স্বর্গ, নরক প্রভৃতি দর্শন করে এবং আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে এ বাহনযোগেই পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। কোরআনও একইরূপ সাক্ষ্য দান করে।

"তিনি আকাশের সর্বোচ্চ সীমায় আরোহন করিয়াছিলেন।"[১]

এবারে চলুন অন্যান্য যানবাহন যা' নিয়ে হযরত চলাফেরা করতেন তার উপর আলোচনা করি।

যানবাহনের মধ্যে উট ও ঘোড়া অন্যতম। আরব দেশে ঐ সময় এ দুটিই ছিল প্রসিদ্ধ। ইন্‌জিন চালিত কোন যানবাহন ছিল না। উটকে মরু জাহাজ বলা হয়। হযরতের দুটি উট ছিল। একটির নাম কাসওয়া এবং অন্যটির নাম আজবা। কাসওয়ার উপর আরোহন করেই তিনি মক্কা হতে মদিনায় গমন করেন। সস্ত্রীক তিনি উটের পিঠে আরোহন করে ভ্রমণ করতেন। হযরত আয়েশার সঙ্গে এরূপ ভ্রমণের যে ইতিহাস তা যুগ যুগের জন্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেহেতু কল্কির অবতার উটের পিঠে যাতায়াত করবেন সেহেতু উটের পিঠে আরোহণ, উটের মাংস ভক্ষণ মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ। মনু স্মৃতির (১১–২০) শ্লোকে নির্দেশ আছে– "কোন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় উটের বা গাধার পিঠে চড়লে বা উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করলে অপবিত্র হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে প্রায়শ্চিত্ত করলে এ অপরাধকৃত পাপ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।"

[সংগৃহীত ঃ 'বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ'
লেখক ঃ ডক্টর মুহাম্মদ কুদরতুল্লা।]

যারা কুন্তাপসূক্তের ২য় মন্ত্রের ব্যাখ্যার সন্তুষ্ট না হয়ে আমার উপর (মুসলমান বলে) হিংসার ভাব পোষণ করবেন তারা দেখুন– বেদের মন্ত্র ভুল কি না। কে সে রথবাহক মহাপুরুষ?

"এষ ঋষয়ে মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ।
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গণাম" ॥ ৩ ॥

[বেদ কুন্তাপসূক্ত। ৩য় মন্ত্র]

"তিনি 'মামহ' ঋষিকে একশত স্বর্ণমুদ্রা, দশটি ফুলমালা, তিনশত ঘোড়া ও দশ হাজার গরু দান করিলেন।"

'মামহ' অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। 'মহ' ধাতু হতে উৎপন্ন। মুহাম্মদ ও মামহ এ দু'টি শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নেই। এ ছাড়া 'মামহ' ঋষি বা দেবতা বলে ভারতে কেউ আখ্যায়িত হন নি। কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে পারবে না। প্রশংসিত ব্যক্তি বিশ্বের বুকে একজনই মুহাম্মদ (দঃ)।

---

1 টীকা–১। কোরআন। সূরা।

পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত মন্ত্রে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার ভাবার্থ মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনের সঙ্গেই সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। ইতিহাস তা প্রমাণ করে।

মক্কায় কোরেশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে একশত নব-দীক্ষিত মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজন রেখে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। খাদযুক্ত সোনা পুড়িয়ে যেমন বিশুদ্ধ সোনা করা হয় তেমনি জালিমদের অত্যাচারে জর্জরিত এ একশত মুসলমান ধৈর্য ও ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খাঁটি সোনারূপে আখ্যায়িত হন। এদের জ্বালানো পোড়ানোর কাহিনী শুনে আবিসিনিয়াবাসীরা স্তম্ভিত হয়। সত্য ধর্ম ইসলামের জন্য তাঁদের এমন ত্যাগ লক্ষ্য করে সেখানে বহুলোক মুসলমান হয়। এ একশত প্রথম যুগের খাঁটি মুসলমানকে স্বর্ণ মুদ্রা বলে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

দশ ফুলমালা ঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সবার জন্যই ফুলমালা একটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ধন-দৌলত গলায় পরিয়ে দিয়ে সম্মানে ভূষিত করা যায় না। জ্ঞানী, মানী, ঋষি, মহাঋষি, দেবতা সবাই এ ফুলে তুষ্ট। ফুল মালায় দেবতা খুশি। নবীরাও ফুল ভালবাসতেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নারী, ফুল, সুগন্ধি ও বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

মন্ত্রে বর্ণিত 'দশ ফুলমালা'-র ভাবার্থ অতি সুন্দর। বেহেশতের সুসংবাদ নিয়ে জিব্রাইল হযরতকে উপহার দিলেন দশটি ফুলমালা– (১) হযরত আবু বকর, (২) হযরত ওসমান, (৩) হযরত ওমর, (৪) হযরত আলী, (৫) তালহা, (৬) জুবায়ের, (৭) আবদুর রহমান বিন আউফ, (৮) সা'আদ বিন আবি আক্কাস, (৯) সা'আদ বিন জায়েদ, (১০) আবু উবায়দ।

আল্লাহর নিকট হতে দশ ফুলমালার এমন উপহার কোন নবীর ভাগ্যেই জোটে নি। এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় নেই।

তিনশত ঘোড়া ঃ মন্ত্রে বর্ণিত **"ত্রীণি শতান্যর্বতাং"** অর্থাৎ তিনশত ঘোড়া। অর্ববত অর্থ আরব দেশীয় ঘোড়া। এ ঘোড়া অধিক শক্তিশালী, দ্রুতগামী ও জগৎ বিখ্যাত।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে বিধর্মীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার আর মুসলমানদের ছিল ৩১৩। নারী ও শিশু বাদে যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল মোট তিনশত। এই তিনশত যোদ্ধা যাঁরা শক্তিশালী ও বিশ্বাসীরূপে খ্যাতিলাভ করে জগৎ বরেণ্য হয়েছেন তাঁদেরকেই আরব ঘোড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দশ হাজার গরু ঃ গরুর অপর নাম গো। এই 'গো' 'গম্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন। গম্ অর্থ যাত্রা করা যুদ্ধে। বেদমন্ত্রে ষাঁড় ও গাভীকে যুদ্ধের ও শান্তির প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়। যে বীরপুরুষ যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে তাকে ষাঁড় বলা হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫ ঃ ২ ঃ ৪, ১৩) এবং তৈত্রেয়তে (২ ঃ ২ ঃ ৫, ২) গরুকে ধ্বংসের প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঋগ্বেদে গরুকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যেমন–

"ধনলিপ্সু অসমান বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব আমরা গরুর ন্যায় একত্রে বাস করি।"

[ঋগ্বেদ ১০ ঃ ২, ৩]

[সংগৃহীত–'বেদ পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)' পৃষ্ঠা– ১১৪ কৃত–পূর্বে বর্ণিত]

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরে বর্ণিত দশ হাজার গুরু দ্বারা হযরতের অনুচরদের বুঝাচ্ছে। এই দশ হাজার সহচরসহ তিনি মদিনা হতে মক্কা বিজয়ে যান এবং বিনা যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করেন। ঋগ্বেদে ৫, ২৭, ১ নং মন্ত্র পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা উপরে বর্ণিত বিশ্লেষণকে মনগড়া ও কাল্পনিক বলে ধারণা করেন তারা একবার নিবিষ্টমনে চিন্তা করুন, এবং দেখুন হযরতের বিভিন্ন যুদ্ধের বিজয় কাহিনী কত ভাবেই না বেদের বিভিন্ন অংশে গর্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় আছে? মহাযোদ্ধা মুহাম্মদ (দঃ)-এর বিজয় কাহিনী শুনুন ঃ-

"মে ত্বা অমদন্ তানি বৃষ্ণযা তে সোমাসো বৃত্র হত্যেষু সতপতে।
যত কারবে দশ বৃত্রাযপতি বহিষ্মতে নি সহস্রানি বর্হযঃ" ॥ ৬ ॥

[অথর্ব বেদ ২০ ঃ ২০ , ৬]

অর্থাৎ "হে সত্যবাদী প্রভু! এই পানীয়, এই বীরত্ব এবং এই উদ্দীপক যুদ্ধ-নিনাদ আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আমোদ দান করিয়াছে- যখন প্রার্থনাকারী উপাসকের দশ সহস্র শত্রুকে আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন।" [হিন্দু টীকাকার]

বেদের উপরে বর্ণিত মন্ত্র হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিখা যুদ্ধ বা আহজাবের যুদ্ধের সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরছে। শত্রুদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার আর মুসলমানরা ছিল তিন হাজার। সংখ্যালঘু মুসলমানগণ অভিনব এক পন্থা উদ্ভাবন করলেন। মদিনা শহরকে রক্ষা করতে এর চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হলো। ইহুদী, খ্রীষ্টান, কোরেশ সবাই মিলে মদিনার নিকটবর্তী স্থানে তাঁবু স্থাপন করল। তাদের ধারণা ছিল একদিনেই মদিনা দখল করবে। মুসলমানদের মধ্যেও পড়ল এক ব্যাপক সাড়া। যুদ্ধের উন্মাদনায় এরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করল। মদিনাকে রক্ষা করতে তারাও প্রতিজ্ঞা করল। শত্রুকে পরাজিত করতেই হবে। শত্রুদের অভিযানে তারা ভীত হয় নি বরং যুদ্ধ নিনাদে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। শত্রুরা মুসলমানদের উল্লাস ও শৌর্য-বীর্য লক্ষ্য করে প্রমাদ গুণল। এরপর প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে যখন শত্রু-শিবির ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন প্রাণ রক্ষার্থে স্বদেশের দিকে তারা পালিয়ে গেল। চার হাজার বৎসর পূর্বে হযরতের এ বিজয় কাহিনী উল্লিখিত থাকবে বেদ-মন্ত্রে এটা ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে। এ জগৎগুরুর আগমন-বার্তা, চরিত্র-মহানুভবতা, অলৌকিক ক্ষমতা ও ধর্ম প্রচারের কাহিনী সবই আমরা সেখানে দেখতে পাই।

যজুর্বেদে লিখিত আছে, "যাহার নামের আদিতে 'ম' ও শেষে 'দ' হইবে সেই দেব সদা বৃষ মাংস (গো-মাংস) ভক্ষণ করেন।"

বেদ বহু প্রাচীন গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্যও বটে। যারা বেদবাণী দেখেন নি, পড়েন নি এবং শুনেন নি, তাদের হয়ত সন্দেহ থেকেই যাবে। মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর আস্থা আনতে শীঘ্রই মন চাইবে না। কেননা মনেরও যে একটি ট্রেনিং হয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত মনকে এদিক ওদিক হেলান কঠিন। এটা যে তাঁর শিক্ষা। যাহোক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও বিশ্বাসী পাঠকবৃন্দ, আসুন আমরা **'ভবিষ্য পুরাণ"** হতে মহর্ষি বেদব্যাসের বাণীগুলো দেখি ও বেদের সত্যতা প্রমাণ করি।

মহর্ষি বেদব্যাস বলেছেন ঃ

এত স্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ[১] আচার্য্যেণ সমন্বিতঃ।
মহামদ[২] ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥
নৃপশ্চৈব মহাবেদং মরুস্থল নিবাসিনম্।
গঙ্গাজলৈশ্চ[৩] সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য[৪] সমন্বিতৈঃ।
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ্চ্য তুষ্টাব মনসা হরম ॥ ৬ ॥
ভোজরাজ উবাচ[৫] নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে।

টীকা-১। ম্লেচ্ছ অর্থ বিদেশী। মহর্ষি বেদব্যাস যেহেতু ভারতবাসী তাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর নিকট বিদেশী। এ অর্থেই এ ম্লেচ্ছ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ম্লেচ্ছ শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেদব্যাস লিখেছেন- "ম্লেচ্ছ কর্ম্মে সৎ, বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ ও প্রখর, আধ্যাত্মিক ব্যুৎপত্তিতে উচ্চস্তরে সমাসীন, দেবভক্ত।"

টীকা-২। মুহাম্মদ ঃ হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) বেদব্যাস এই 'মহামদ' নামে উচ্চারণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নাম উচ্চারণে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কোথাও 'মহামত' কোথাও "মেহোমেট", কোথাও 'মামহ'- কোথাও মোহামেড, কোথাও বা মৈত্রেয়, সবগুলোর একই অর্থ, প্রশংসিত। ভবিষ্য পুরাণে বার বার এই নামই উচ্চারিত হয়েছে ঃ যেমন- প্রতিসর্গ ১২, ১৪, ১৭। ১০-২৭ নং প্রতিসর্গে মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় ও সাহাবীদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ধর্মাবলম্বীরা যে মুসলমান নামে পরিচিত হবে সে কথারও উল্লেখ আছে শেষের লাইনগুলোতে।

টীকা-৩। গঙ্গাজলৈশ্চঃ গঙ্গানদী ভারতবর্ষে প্রবাহিত। আরব দেশে এ নদ প্রবাহিত নয়, তবুও ব্যাসজী এ গঙ্গানদেরই নাম উল্লেখ করেছেন এবং এ নদের পানিতে পবিত্র হবার কথাই বলেছেন। উপমা ও তুলনা করতে এরূপ বহু শব্দের আশ্রয় নেওয়া হয়; এ শুধু মানুষকে একটি সম্যক ধারণা দেওয়ারই উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক কোরআনে বেহেশতের ফল হিসাবে আঙ্গুর, আঞ্জির, খেজুর এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। কোথাও কলা, আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, পেয়ারা, নারিকেলের কথা বলা হয় নি। তাই বলে কি এগুলো বেহেশতে নেই? যারা কাঁঠাল দেখেন নি তাদের উপমা দিয়ে বুঝাতে হলে কাঁকরোলের কথা বলতে হবে। যেখানে মেওয়া ফল নেই সেখানে আতা ফলের কথাই বলতে হবে। যে দেশে জেব্রা নেই সে দেশের মানুষকে জেব্রার পরিবর্তে ঘোড়ার উপমাই দিতে হবে। টিক্‌টিকির পরিবর্তে গুইসাপ- ঘুঘুর পরিবর্তে কবুতর, আর কুমিরের পরিবর্তে এলিগেটরই বলতে হবে। এ হিসাবে ব্যাসজীর উপমা অত্যন্ত সুন্দর। কেননা হিন্দুরা গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত। গঙ্গাজল তাদের কাছে অতি পবিত্র। এ পবিত্র জলে অবগাহন করে তারা যেমন নিষ্পাপ বলে মনে করেন তেমনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) জমজমের পানিতে ওজু ও গোসল করে নিষ্পাপ ও পবিত্র হবেন এটাই ছিল বেদব্যাসের বলবার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সত্যি সার্থক হয়েছে। এজন্য আমরা মুসলমান তাঁকে অন্তর থেকেই ধন্যবাদ জানাই।

টীকা-৪। পঞ্চগব্য ঃ দই, দুধ, ঘি, গোবর ও গোচোনা এই পাঁচটির সমাবেশকেই পঞ্চগব্য বলে এবং এটাই গাভীর প্রকৃত পরিচয় ও মূল্য তুলে ধরে। হযরতের নির্দেশিত পাঁচবার নামাজ ও পাঁচবার ওজু হয়ত এ উপমার প্রকৃত বিষয়বস্তু। এছাড়া হযরতকে নিয়ে তাঁর চারজন শিষ্য যারা ইসলামের প্রাণ তাদের প্রতিও এ ইঙ্গিত হতে পারে। আরও একটি অর্থে 'পঞ্চগব্য' শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। যেমন হযরত এক সময় নজরানের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে পাঞ্চতনসহ গমন করেন। খ্রীষ্টানগণ তাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। এতে হযরতের যেমন মনস্তুষ্টি হয় ইসরামেরও তেমনি বিজয়কেতন উড়ে। এ পাঞ্চতন ছিলেন এই (১) হযরত নিজে, (২) হযরত আলী, (৩) হযরত ফাতেমা, (৪) হযরত হাসান, (৫) হযরত হুসাইন।

টীকা-৫। ভোজরাজ ঃ উপরে বর্ণিত ৭নং মন্ত্র হতে আমরা 'ভোজরাজের' নাম দেখতে পাই যিনি মুহাম্মদ (দঃ)-এর চরণতলে স্থান পাবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এই ভোজরাজের পরিচয় জানতে পাঠকবৃন্দ মাত্রই উদগ্রীব হবেন, তাই সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি।

যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলায় 'ভোজপুর' নামে একটি স্থান আছে। সেখানে মাঠের মধ্যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রিপুরা সুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্ত্তিনে ॥ ৭ ॥
ম্লেচ্ছগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
তং মাং হিং বিস্করং বিদ্ধি শরণার্থমুপাগত ॥ ৮॥
লুত উবাচ– ইতিশ্রুতা স্তবং দেবং শব্দমাহনৃপায়তম।

ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। প্রস্তরফলকে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের বহু মূল্যবান মন্ত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোজরাজ সেখানকার রাজা ছিলেন। রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীও ছিল ঐখানে। এই রাজা ছিলেন পুণ্যবান ও আধ্যাত্মিক বলে বলিয়ান। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পরদিন সকালে তিনি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের ডেকে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন এবং গুপ্ত ভেদ বর্ণনা করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেন। পণ্ডিতগণ গণনা করে একমত হয়ে বলেন ঃ

"আমাদের গণনা অনুসারে আমরা বুঝতে পারছি যে আরবদেশে এক মহাবতারের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সর্ব ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে এবং এই ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিনত হবে। তিনিই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন।"

এতদ্শ্রবণে ভোজরাজ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আরবদেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ভারত ও আরবদেশের মধ্যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলত। ঐতিহাসিকগণ এ প্রমাণ দিয়েছেন। দূতগণ দেশে ফিরে ভোজরাজকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা ও হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানালে ভোজরাজ এবং ঐ দূতগণ একসঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে প্রজাগণ এবং তাঁর বংশধর বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে উপদ্রব করতে থাকলে তিনি গুজরাটের 'ধারওয়ার' নামক স্থানে গমন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তাঁর মুসলিম নাম ছিল শেখ আবদুল্লাহ। গোরক্ষপুর নিবাসী মৌলানা সোবহানুল্লাহ সাহেবের পাঠাগারে এ ভোজরাজার ইতিহাস আজও রয়েছে।

আর্যধর্মের পণ্ডিত ও সাহিত্যিক লালা হংসরাজ ভারতে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভোজরাজের এ তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন। এক প্রাচীণ মন্দির হতে সংস্কৃত ভাষায় রাজ্য কর্তৃক লিখিত একটি ইতিহাস তাঁর হস্তগত হয়। কেন রাজা মুসলমান হলেন স্পষ্টভাবে তা লেখা রয়েছে। রাজা লিখেছেন, "আমি একদা রাত্রিকালে আকাশে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখলাম এবং তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হলাম। আমি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের এর গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করতে আহ্বান করলাম। তাঁরা তদুত্তরে বললেন,

"আরবদেশে এক মহাপুরুষ দৈবশক্তি বলে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ করেছেন। তাঁর দেশের (আরবের) প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তারা এই দাবী উত্থাপন করেছে যে যদি তিনি চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করতে পারে, তবে তারা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করবে। সেজন্য তিনি এ কাজ করেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইহলোক ও পরলোকে মুক্তির আশ্বাস দান করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে।"

'ভোজরাজা' একাধারে ছিলেন প্রতাপশালী রাজা, আর অন্যদিকে ছিলেন মহাবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, ধর্মপরায়ণ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞানসম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি যার প্রভাবে ৭ জন দূতসহ বহু গণ্যমান্য হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হন। আজও এ মহান ব্যক্তির উদ্ধৃতি হিন্দু সমাজ দিয়ে থাকে এইভাবে।

"কাঁহা রাজাভোজ আর কাঁহা গঙ্গারাম তেলী"।

গুজরাটে এই ভোজরাজের সমাধি আজও বিদ্যমান রয়েছে।

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হবার ঘটনা ভোজরাজকে যেমন স্তম্ভিত করেছিল চোদ্দশ' বছর পরে আবার তেমিন অবাক করে দিল যুক্তরাষ্ট্রের নভোচারী নীল আর্মস্ট্রংকে। চন্দ্রে অভিযান করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন চন্দ্রের দ্বি-খণ্ডিত হবার চিহ্ন। তাই আগ্রহান্বিত হয়ে চন্দ্র হতে এনেছিলেন যোগসূত্রের ঐ সব পাথর ও অন্যান্য উপাদান। এগুলো পরীক্ষা করে যখন বৈজ্ঞানিকগণ ঘোষণা করলেন– "চোদ্দশ' বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে' তখন চিৎকার দিয়ে নীল আর্মস্ট্রং তৌহিদ বাণী মুখে এনে মুসলমান হলেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মিল আল্লাহর নবী সত্য, আল্লাহ্ সত্য, কোরআন সত্য, ইসলাম ধর্মও সত্য।

গন্তব্যং ভোজরাজেন মহাকালেশ্বরে স্থলে ॥ ৯ ॥
ম্লেচ্ছৈস্তু দূষিতা ভূমির্ব্বাহিকা নাম বিশ্রুতা।
আর্য্যধর্ম্মা হি নৈবাত্রবাহিকে দেশদারুণে ॥ ১০ ॥
বাভুবাত্র মহামায়ী যোহসৌ দগ্ধময়া পুরা।
ত্রিপুরো বলিদৈত্যেন প্রেষিতঃ পুনরাগতঃ ॥ ১১ ॥
অযোনিঃস বরো মত্তঃ প্রাপ্তবান্দৈত্য বর্দ্ধেনঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ পৈশাচ কৃতিতৎপরঃ ॥ ১২ ॥
নাগন্তব্যং তয়া ভূপ পৈশাচে দেশধূর্ত্তকে।
মৎপ্রসাদেন ভূপাল তব শুদ্ধি প্রজায়তে ॥ ১৩ ॥
ইতিশ্রুত্বা নৃপশ্চৈব স্বদেশান্ পুনরাগতঃ।
মহামদশ্চ তৈঃ সার্ধং সিন্ধুতীর মুপায়য়ৌ ॥ ১৪ ॥
উবাচ ভূপতিং প্রেম্ণা মায়ামদ বিশারদঃ।
তব দেব মহারাজো মম দাসত্বমাগত ঃ ॥ ১৫ ॥
মমোচ্ছিষ্টং সভুং জীয়াঘথা তৎপশ্যভো নৃপঃ।
ইতিশ্রুত্বা তথাদৃষ্টা পরঃ বিস্ময়মাগতঃ ॥ ১৬ ॥
ম্লেচ্ছাধর্ম্মে মতিশ্চাসীত্তস্য ভূপস্য দারুণে ॥ ১৭ ॥
তচ্ছুত্বা কালিদাসস্তু রুষা প্রাহ মহামদম।
মায়াতে নির্ম্মিতা দূর্ত্ত নৃপমোহন হেতবে ॥ ১৮॥
হনিষ্যা মিদুরাচারং বাহিকং পুরুষাধম মম্।
ইতুক্তাস জিহ্বঃ শ্রীমান্নবার্ণজপ তৎপরঃ ॥ ১৯ ॥
জপ্তা দশ সহস্রংচ তদৃশাংশ জুহাব সঃ।
ভস্ম ভূত্বা স মায়াবী ম্লেচ্ছো দেবত্বমাগতঃ। ॥ ২০ ॥
ভয়ভীতাস্ত তচ্ছিষ্যা দেশং বাহিকমায়য়ূঃ।
গৃহীত্বা স্বগুরোর্ভস্ম মদহীন মাগতম ॥ ২১ ॥
স্থাপিতং তৈশ্চ ভুমধ্যেত ত্রোষুর্মদ তৎপরাঃ।
মদহীনং পুরং জাতং তেষা তীর্থং সমং স্মৃতম্ ॥ ২২ ॥
রাত্রৌস দেবরূপশ্চ বহুমায়া বিশারদ।
পৈশাচঃ দেহমাস্থায় ভোজরাং হি সোহব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥
আর্যধর্ম্মো হিতে রাজস্বর্বধমোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ঈশাজ্ঞয়া করিষ্যামি পৈশাচং ধর্ম্মদারুণম্ ॥ ২৪ ॥
লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষক।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনোমম ॥ ২৫ ॥
বিনা কৌলং চ পশবস্তোষাং ভক্ষ্যা মতা মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
তস্মাম্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্মদূষকাঃ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ। ॥ ২৭॥

[ভবিষ্য পুরাণ –মহর্ষি ব্যাস]
[প্রতিসর্গ পর্ব ৩ ঃ ৩, ৩ ঃ ৫–২৭]

pdf By Syed Mostafa Sakib

বঙ্গানুবাদ ঃ (অর্থ)

মুহাম্মদ নামে খ্যাত একজন ম্লেচ্ছ (বিদেশী) ধর্মগুরু শিষ্যগণ সহ আবির্ভূত হইবেন। তিনি মরুভূমির (আরব মরুভূমির) নিবাসী মহাদেব নৃপতি। তিনি গঙ্গাজলে পঞ্চগব্যসহ স্নান করিয়া মনস্তুষ্টি করিবেন। ভোজরাজ কহিলেন, "হে মরুস্থলবাসী গিরিজানাথ! তোমায় নমস্কার করি। তুমি পাপিষ্ঠ শয়তানকে নাশ করিবার বহু উপায় জান। ম্লেচ্ছ বিরোধী হইতে তুমি বিমুক্ত।" স্তুতি পাঠক (ভোজরাজ) কহিলেন, "হে মানব শ্রেষ্ঠ মহাপ্রভু! আমি তোমার দাস। তোমার চরণ-তলে আমাকে স্থান দাও।"

ম্লেচ্ছ সুপ্রসিদ্ধ দেশ কলুষিত করিয়াছে। আর্যধর্ম সে দেশে লোপ পাইয়াছে। পূর্বে এক পাপিষ্ঠ বিপথগামী আগমন করিয়াছিল; আমি তাহাকে প্রাণে বধ করিয়াছি। সে পুনরায় এক প্রবল শত্রু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই শত্রুদিগকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য এবং উত্তম নির্দেশ দিবার জন্য বিখ্যাত মুহাম্মদ (মোহাম্মদ দঃ) মম প্রদত্ত ব্রহ্মা নাম ধারণ করিয়া পিশাচদিগকে সত্যপথে আনয়নের কার্যে ব্যস্ত আছেন।

"হে রাজন! তোমাকে নির্বোধ পিশাচের দেশে যাইতে হইবে না। আমার কৃপাগুণে তুমি যে স্থানে অবস্থান করিতেছ, সেই স্থানেই পবিত্র হইবে।"

রাত্রিকালে সেই স্বর্গদূত স্বভাব সুচতুর দেব পিশাচের রূপ ধারণ করিয়া ভোজরাজকে কহিলেন,

"হে রাজন ! তোমার আর্যধর্ম সর্বধর্মের উপর উত্তমরূপে গন্য হইবে বা সর্বোপরি জয়ী হইবে। প্রভুর আদেশে আমি মাংসভোজীদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিব। আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বকচ্ছেদন (খতনা) করিবে। সে উচ্চস্বরে প্রার্থনাধ্বনি (আজান) করিবে। সে সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করিবে; সে শূকর মাংস ভক্ষণ করিবে না। সে পূত তৃণলতা দ্বারা পবিত্র হইবার সন্ধানে থাকিবে না, বরং যুদ্ধ দ্বারা পবিত্র হইবে। ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সে মুসলমান নামে পরিচিত হইবে। আমার দ্বারা এই মাংসাহারীদের ধর্ম স্থাপিত হইবে।"

পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'ভবিষ্য পুরাণে' মহর্ষি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর যে স্তুতি গান করেছেন তা হিন্দু ভাইয়েরা অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তারা হয়ত নিজ ধর্মের খাতিরেই হোক অথবা গোঁড়ামীর আশ্রয় নিয়েই হোক বিকৃত অর্থ করে প্রকৃত অর্থ দূরে ঠেলে দেবেন। কিন্তু কোন চিন্তাবিদ পণ্ডিত বা ধর্মপরায়ন হিন্দু মনীষী বেদ বাণীকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। তাই শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাধ্য। রাজা রামমোহন রায়, মিঃ গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, গোকুলচন্দ্র গোস্বামী, গুরু নানক, নেহেরু প্রভৃতি মনীষীদের উক্তি তুলে ধরেছি। সেখান থেকে দেখতে পাবেন কোন্ মহান গুরু এ বিশ্বের বুক আলোকিত করেছেন। তবুও যাদের মনে সন্দেহের বীজ শিকড় গেড়ে বসে থাকে তঁরা মহর্ষি বেদব্যাসের আরও স্তুতিগান শুনুন। দেখুন তিনি কি বলেছেন?

'ভাবিকালে মহামত জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার নিদর্শন এই যে, মেঘখণ্ড তাঁহাকে ছায়াদান করিবে। তাঁহার শরীরের কোন ছায়া থাকিবে না। সাংসারিক ভোগ বিলাসের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হইয়া সর্বদা পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। আরব দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার শত্রুতা করিবে। তিনি প্রভুর প্রিয় হইবেন। প্রভু তাঁহাকে ত্রিশ অধ্যায় বিশিষ্ট পুরাণ দান করিবেন।" [ভৌতিক পুরাণ– মহর্ষি ব্যাস]

মহর্ষি ব্যাস রচিত 'পুরাণ' হিন্দুদের নিকট অতি পবত্রি। পুরাণ বেদের মত দুষ্প্রাপ্য নয়। সর্বত্রই এ গ্রন্থ মেলে এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য। পুরাণে বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনা দেবতাদের জীবন ইতিহাস ও আর্য জাতির জীবন ব্যবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

পুরাণকে ১৮টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যেমন, ১। ব্রহ্ম, ২। পদ্ম, ৩। বিষ্ণু, ৪। অগ্নি, ৫। ব্রহ্মাণ্ড ৬। গরুড়, ৭। ব্রহ্মবৈবর্ত, ৮। শিব, ৯। লিঙ্গ, ১০। নারদ, ১১। স্কন্ধ, ১২। মার্কণ্ডেয়, ১৩। মৎস্য, ১৪। কূর্ম, ১৫। বরাহ, ১৬। বামন, ১৭। ভবিষ্য ও ১৮। কল্কি।

এই ভবিষ্য ও কল্কি পুরাণে হযরত (দঃ)-এর বহু গুণগান করা হয়েছে এবং তাঁর নিখুঁত পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দু ভাইয়েরা নিশ্চয় এসব তত্ত্ব জানেন। তবু কেন হযরতকে নবী-সম্রাট বা বিশ্বনবী বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেন তা সত্যি আশ্চর্য।

যারা ইতিহাস পাঠ করেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে মহর্ষি ব্যাস হাজার হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁর শরীরের কোন ছায়া ছিল না। আবু তালেবের সঙ্গে যখন তিনি সিরিয়া ভ্রমণে যান তখন মেঘ যে তাঁকে ছায়া দান করেছিল এ অলৌকিক ঘটনা বিশ্বের প্রতিটি ঐতিহাসিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদেরই স্তম্ভিত করেছিল।

'তিরিশ অধ্যায় বিশিষ্ট পুরাণ তাঁকে প্রভু দান করিবেন– কথাটি কত সত্য। তিরিশ পারা কোরআনই এর অর্থ। কেননা অন্য কোন নবীর উপর তিরিশ অধ্যায় বিশিষ্ট কোন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি। দুনিয়ার প্রতিটি জাতিই এ বাস্তবকে মেনে নিয়েছে এবং অনেকেই এ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মন্থন করে ধন্য হয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণে হযরতের আগমন বার্তার কথা আমরা দেখলাম। কল্কি পুরাণে তাঁর জন্মকালীন সময় ও আড়ম্বর পূর্ণ জন্মোৎসবের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। এ শ্লোক দেখে নিয়ে ইতিহাসের পাতা উল্টান। দেখতে পাবেন আপনাদের ঋষি মনীষীরা দিব্য চোখে তাঁর কি আলোকময় রূপ দেখেছেন।

"দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মামি আধবঃ।
জাতে দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ" ॥ ১৫ ॥

[কল্কি পুরাণ–১৫। মহর্ষি ব্যাস]

অর্থাৎ– "বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে কলির অবতার জন্মগ্রহণ করিলে তদ্দর্শনে তাঁহার পিতৃকুল হৃষ্টচিত্ত হইলেন।"

এর উপর ব্যাখ্যাদানের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের ১২ তারিখে এ কলির অবতারের জন্ম তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। হযরতের জন্ম তারিখ আমরা জানি ১২ই রবিউল আউয়াল, ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

পরবর্তী শ্লোকগুলোতে বলা হয়েছে যে সূর্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পরে তিনি জন্মলাভ করবেন এখানে হয়ত পাঠকবৃন্দের কিছুটা ধাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। কেননা আমরা সবাই জানি "সোবেহ-সাদেক' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্ম হয়।

ভৌগোলিক জ্ঞান যাদের আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে জাপানে যখন সূর্যোদয় হয় তখন বাংলাদেশ ও ভারতে রাত থাকে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সময়ের পার্থক্যই প্রায় এক ঘণ্টা। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হযরতের জন্মের যে সময় নির্দেশ করেছেন (সূর্যোদয়ের দু ঘণ্টা পর) তা আরবের সময়ের সঙ্গে মিল করলে দেখা যায় সম্পূর্ণ সত্য। কেননা ভারত ও আরবের সময়ের পার্থক চার ঘণ্টা। তাই ভারতের সূর্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পর মুহূর্তে আরবের সূর্যোদয়ের দু-ঘণ্টা পূর্ব মুহূর্ত অর্থাৎ সোবেহ-সাদেক। (রাত্রি ও দিনের ক্রান্তি লগ্ন)। তাঁর জন্মদিনে কোরেশ বংশের সবাই কিরূপ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ইতিহাস এর সাক্ষী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবারে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করব। কল্কি-পুরাণে বলা হয়েছে–

"শম্ভলে বিষ্ণুযশস্যে গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্
সুমত্যাং মাতরি বিভো কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ।" ॥ ৫ ॥

অর্থাৎ কলি বলছেন ঃ– "আমি শম্ভলনগরে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতি নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে আবির্ভূত হইব।"

হিন্দুজাতি কলির অবতারের প্রতিক্ষা করছেন। তারা মনে করেন এ অবতারের এখনও জন্ম হয়নি। শম্ভলনগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে। এবারে শুনুন– কে সে অবতার। তাঁর আগমন ঘটেছে কিনা। ঘটে থাকলেই বা কিভাবে ঘটেছিল। তাঁর পরিচয়ই বা কি?

'শম্ভল'–অর্থে সাগরতীর বুঝায়। আরব দেশ চতুর্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত। পারস্য উপসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ভুমধ্যসাগর এর চতুর্দিকে বিরাজ করছে। এছাড়া শম্ভলদ্বীপ শাল্মল দীপের অপভ্রংশ। শাল্মল অর্থ শিমূল গাছ। শিমূল গাছের প্রাচুর্য হেতুই এরূপ নামকরণ হয়েছে। এই শম্ভল দ্বীপের প্রধান নগর মক্কা– এখানেই জন্ম হয় কলির অবতার হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর।

প্রাচীনকালের হিন্দু পণ্ডিতগণ সমগ্র পৃথিবীকে ৭টি মহাদ্বীপ বা স্থলভাগ ও ৭টি মহাসমুদ্রে ভাগ করেছেন। যেমন– (১) জম্বুদ্বীপ, (২) শাক-দ্বীপ, (৩) কুশদ্বীপ, (৪) ক্রৌঞ্চদ্বীপ, (৫) প্লক্ষদ্বীপ, (৬) পুষ্করদ্বীপ, (৭) শম্ভলদ্বীপ।

এই শম্ভলদ্বীপের কথাই পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে 'কলির' পিতার নাম হবে 'বিষ্ণুযশা'–ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ও মাতার নাম 'সুমতাং' বা সুমতি।

মহর্ষি ব্যাস ভারতবাসী ছিলেন। ভারতের ভাষার সঙ্গেই ছিলেন পরিচিত। তাই গঙ্গানদ, বিষ্ণুযশ, সুমতাং প্রভৃতি শব্দযোগেই প্রকৃত রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এবারে আমরা বিচার করি বিষ্ণুযশ-এর অর্থ কি এবং কোন্ মহাপুরুষকেই বা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

'বিষ্ণু'–আল্লাহর এক গুণবাচক নাম বিশেষ। যশ অর্থ বান্দা বা দাস। আরবী শব্দে হযরতের পিতার নাম আমরা জানি আবদুল্লাহ্–এর অর্থ আল্লাহর দান। হযরতের পিতা আবদুল্লাহ্ আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই ব্রাহ্মণ বংশে বিষ্ণুযশার জন্ম কোরেশ বংশের আবদুল্লাহকেই বুঝায়। অন্য কাউকেই নয়। ভারতীয় হিন্দুদের সহজে বোধগম্য হবার জন্যই 'আবদুল্লাহর' পরিবর্তে সংস্কৃতের এ বিষ্ণুযশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এবারে দেখি **'সুমতি'** কে?

সু-মতি যাহার, তিনিই সুমতি– অর্থাৎ সুস্বভাবা, বিশ্বাসভাজনা। হযরতের মাতাকে আমরা আমিনা বলে জানি। এ আমিনার অর্থও সুশীলা ও বিশ্বাসভাজনা। তাহলে দেখা যায় বাংলা শব্দের 'সুমতি', সংস্কৃতের 'সুমিতাং' ও আরবীর 'আমিনা' একই নারী। [কলির মাতা– হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জননী এবং আবদুল্লাহর স্ত্রী]।

এই কলির অবতারের শিক্ষার দয়িত্ব কে গ্রহণ করেন কোথায় কি ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হন– সে ঘটনা আমরা দেখতে পাই মহর্ষি ব্যাসের বাক্য হতে। তিনি বলেছেন –

"মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতো রামঃ সমানীয়া শ্রমং প্রভু ॥ ১ ॥
প্রাহ ত্বং পাঠয়িষ্যামিং গুরুং মাং বিদ্ধি ধর্ম্মতঃ।"

[মহর্ষি ব্যাস, কল্কি পুরাণ। প্রথম অংশ। তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ]

অর্থাৎ–"মহেন্দ্র পর্বতস্থিত (হেরা পর্বতস্থিত) প্রভাবশালী পুরুষরাম[১] তাঁহাকে (কল্কিকে) স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাকে অধ্যয়ন করাইব'। ধর্মতঃ তুমি আমাকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে।"

হেরা পর্বতের গুহায় হযরতকে শিক্ষা দিলেন হযরত জিব্রাইল (আঃ)। আল্লাহর সর্বপ্রথম যে বাণী জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে শিক্ষা দিলেন তা ছিল এই ঃ

"এক্‌রা বে ইস্‌মে রাব্বিকাল্লাজি খালাক। খালাকাল এনসানা মেন আলাক ... ... ।" [কোরআন]

দুনিয়ার কোন মানুষ হযরতকে শিক্ষা দিতে পারেনি। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমেই তাঁকে শিক্ষাদান করে সুপণ্ডিত করে গড়েছিলেন। এ তত্ত্বমূলক আলোচনা আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে করব।

কোরআনেও বলা হয়েছে ঃ– "অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাইব। তৎপর তুমি বিস্মিত হইবে না"।

এ কলি তরবারির সাহায্যে জয়লাভ করেন এবং ন্যায়ের মূলোৎপাটন করে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন এ কথাও কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে।

"রত্নং সরুং করালঞ্চ করবালং মহাপ্রভম্।
গৃহাণ গুরুভারায়া ঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্"।। ২৭ ॥

[কল্কিপুরাণ–প্রথামাংশের তৃতীয় অধ্যায়– শ্লোক নং–২৭)

অর্থাৎ–মহাদেব কলিকে বলিতেছেন, "এই করাল করবাল দিতেছি, গ্রহণ কর। ইহার মুষ্টি রত্নময়। ইহা অতীব প্রভাবশালী। করবালই গুরুভারা পৃথিবীর ভার হরণের প্রধান সহায়"। করালঞ্চ করবালং– অর্থ করাল করবাল বা ধারাল অস্ত্র।

হযরতের কয়েকখানি তরবারি ছিল। এর মধ্যে জুলফিকার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যা তিনি হযরত আলীকে দান করেছিলেন।

'করাল করবালের'–আর একটি অর্থ হতে পারে 'কোরআন'–আল্লাহর বাণী। এ বাণীও ছিল ধারাল অস্ত্র স্বরূপ। এ বাণীর সাহায্যেই সমস্ত অধর্ম লোপ পায়।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন বার্তার যে শুভ সংবাদ বেদব্যাস দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। তাঁর নিকট হতে চলুন আমরা হযরতের আরও কিছু পরিচয় নিই এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে দেখি সে সব সত্য কিনা এবং হযরতের জন্য প্রযোজ্য কিনা। তিনি বলেছেন ঃ

"কল্কিং পুরস্তাদতি সূর্য্য বর্চ্চসম্"।

(কল্কিপুরাণ। তৃতীয় অংশ–অষ্টম অধ্যায়। শ্লোক নং–৪৫)

অর্থাৎ– "কল্কি সূর্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন"। যে সব উপাধিতে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) ভূষিত করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ছিল– "শামছুদ্দোহা'–অর্থাৎ 'তেজোপ্রাপ্ত সূর্য; সূর্য যেমন অন্ধকারকে ভেদ করে দিবস আনন করে তেমনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বের কলুষ

টীকা–১। পুরুষরাম অর্থে (পুরুষ–রাম) আল্লাহর আত্মা বুঝায়, পুরুষ অর্থ রুহ বা আত্মা।
রাম– হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে রা'–অর্থ বিশ্ব এবং 'ম'–অর্থ ঈশ্বর। তা' হলে 'রাম'–শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিশ্ব+ঈশ্বর=বিশ্বেশ্বর।
'পুরুষ রাম'–এর সম্পূর্ণ অর্থ এ অনুযায়ী হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মা। ইসলামী মতে জিব্রাইলের অপর নাম, 'রুহুল আমিন'– এ শব্দের অর্থও 'আল্লাহর আত্মা'। কলির অবতারকে যিনি শিক্ষা দিলেন তিনিই হলেন 'পরুষরাম'–অর্থাৎ জিব্রাইল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কালিমা ও পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত মানব জাতিকে আলোকদান করে সহজ, সরল ও সুন্দর পথে তুলে দেন। জীবজন্তু উৎফুল্ল হলো, জগতে শান্তি এলো, আর অধর্মের বাতি নিভে গেল। এ কথাও আমরা পাই ব্যাসমুনির মুখনিঃসৃত বাণীর মাঝে। তিনি বলেছেন–

"বেদো ধর্ম্ম ঃ কৃতযুগৎ দেবা লোকাশ্চরাচরা ঃ।
হৃষ্টা পুষ্টা সুসন্তুষ্টা কলকৌ রাজনি চাভবন্!'

(কল্কিপুরাণ। তৃতীয় অংশ। ১৬ অধ্যায়। শ্লোক নং–২)

অর্থাৎ–"কল্কি সিংহাসনে উপবেশন করিলে বেদধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীবগণ হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হইলেন"।

কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে যে এ মহাপুরুষ যানবাহনে যাতয়াত করবেন। অনেকেরই ধারনা তিনি হয়ত ট্রেন, ট্রাম, বাস, মোটর, এরোপ্লেনে এখানে সেখানে যাতায়াত করবেন 'কল্কি'– বা কলির অবতার যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তা আমরা প্রমাণ করেছি। তিনি যানবাহন পছন্দ করতেন এটাও সত্য কথা। কেননা ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যানেই অর্থাৎ উষ্ট্র ও অশ্বেই তিনি চলাফেরা করেছেন। এছাড়া আর একটি শ্লোকে এ ধাঁধাঁর অবসান করেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কল্কি শ্বেত অশ্বে আরোহণ করবেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর দুলদুল নামে একটি শ্বেত অশ্ব ছিল যা তাঁকে নিয়ে চলাফেরা করত।

সন্দেহের বীজ কি আরও আছে? মনের দ্বিধা সংকোচ কি এখনও দংশন করে? নিস্তার নেই। এ মহামানবের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে না জপলে মুক্তির আশা নেই। এ বিশ্ব তাঁর জন্যই ধন্য। বিশ্বের সমুদয় বস্তু তাঁর পবিত্র নূর হতেই সৃষ্ট। হযরত সে কথাই বলেছেন ঃ

"আনা মেন্ নূরুল্লাহে ওয়া কুল্লো শাইয়েম মেন নূরী"

অর্থাৎ–'আমি আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছি। আর আমার নূর হতে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।'

মহর্ষি ব্যাস এ কথারই সাক্ষ্য দিলেন এই বলে– কল্কি বলছেন ঃ–

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ কার্য্যমিদং মম" ॥ ২॥

অর্থা– "সমুদয় জীব ও সমুদয় পদার্থ আমা হতে সৃষ্টি হয়েছে।"

(কল্কিপুরাণ। প্রথম অংশ, চতুর্থ অধ্যায়। দ্বিতীয় শ্লোক)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছাড়া এ বিশ্বের বুকে আর কেউ কি এমন কথা বলবার সাহস পেয়েছে? কেউ পায়নি। কেউ পাবেও না। বহু আকঙ্ক্ষিত ও বহু প্রতীক্ষিত এ কল্কি–হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যার নামে এ বিশ্ব পাগল।

মহর্ষি বেদব্যাস মুনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন তার সামান্য কিছুটা পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরলাম। বেদ-পুরাণ হিন্দুদের অতি পবিত্র। এ সব গ্রন্থ অধ্যায়ন করার সৌভাগ্য মুসলমানদের ত নেই, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য হিন্দুদের হয়ত নেই। ধর্মগ্রন্থ তালা-চাবি দিয়ে সিন্দুকে আবদ্ধ থাকবে, কেউ তা জানতে পারবে না– এটা জাতির জন্য শুভ নয়, একদিন না একদিন তা প্রকাশ হবেই। আর প্রকৃত বিষয়বস্তু যখন মানুষ জানতে পারবে তখন ঐ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সমাজ যারা নিজেদের স্বার্থে মহাবাণীকে এমনিভাবে গোপন রেখে হাজার হাজার বছর ধরে অন্যের কাঁধে বসে পরগাছার মত খাচ্ছিল তাদের কি ক্ষমা করতে পারবে? বর্ণ-হিন্দুরা শিখাতে না চাইলেও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমানগণ যারা একদিন এ অভিজাত হিন্দু ভাইদের হাতে উঠে পড়ে মার খাচ্ছিল– অস্পৃশ্য বলে দিনরাত শুধু গালি শুনছিল তারা কি চুপ থাকবে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের

যুগ–কল্কি অবতারের যুগ– ইমাম মেহেদীর যুগ। এ যুগে সত্যের আগমন ঘটবে, মিথ্যার কবর রচিত হবে, স্বৈরাচারী সমাজ শ্রেণীর পতন হবে।

মহর্ষি ব্যাস যিনি সত্যের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত, মুহাম্মদের জয়গানে উল্লসিত, তিনি আমাদের নিকটও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। এবারে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু তুলে ধরছি।

ইনি বেদের সংগ্রহকারী ও বিভাগকর্তা মুনি। তাঁর পিতার নাম ছিল পরাশর ও মাতার নাম মৎস্যগন্ধা। তিনি দ্বাপরযুগে একটি দ্বীপে জন্মলাভ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলে তাঁর অপর নাম ছিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। ইনিই সর্বপ্রথম বেদ সংগ্রহ করেন ও ভাগ করেন, এর জন্য তাঁকে বেদব্যাস বলা হয়। তিনি ঐ যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি ও হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় গুরু ছিলেন। অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত তাঁরই রচিত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থ রচনার পর তিনি আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করেছিলেন তা নিম্নরূপ –

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো।
ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তত্যানির্বাচনীয় তাহাখিলগু রোদূরীকৃতা জন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং
ভগবতো যতীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকল তাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

(ভবিষ্য পুরাণ। চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ– "তুমি রূপ বিবর্জিত, আমি ধ্যান তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্বাচনীয়তা দূর করিয়াছি। তুমি সর্বব্যাপী কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি; অতএব হে জগদীশ! তুমি আমার এই বিকলতা দোষত্রয় ক্ষমা কর।

(তর্জমা– সুবল চন্দ্র মিত্রের সরল বাংলা অভিধান)

পারসী ধর্মনেতা বলেছেন –

"আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জয়থুস্ত্র পবিত্র আহমদ নিশ্চয়ই আসিবেন যাঁহার নিকট হইতে তোমরা সৎচিন্তা, সৎবাক্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

(জিন্দাবেস্তা। ১ম পরিচ্ছেদ, অনুবাদ– ম্যাক্স মুলার। ২৬০ পৃষ্ঠা।)

বৌদ্ধ ধর্মনেতা গৌতম বুদ্ধ বলেছেন ঃ

"মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, তাঁহার নাম "মৈত্রেয়' অর্থাৎ শান্ত ও করুণার বুদ্ধ।"

আনন্দ যখন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার তিরোধানের পর কে আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন? বুদ্ধ তখন প্রতি-উত্তরে বলেন–

I am not the first Buddha who came on the earth nor shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one endowed with wisdom in conduct. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim.

Ananda said, 'How shall we know him?'

The blessed one said,

"He will be known as MAITREYA"

অর্থাৎ– "আমিই জগতের প্রথম এবং শেষ বুদ্ধ নই। এক সময় এই পৃথিবীতে অন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

একজন বুদ্ধের আগমন হবে, যিনি আমার চেয়েও পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত ও অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারী। তিনি আমার মত এক পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্কলুষ ধর্মমত প্রচার করবেন।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কিরূপে তাঁকে চিনব?"

বুদ্ধ বললেন, "তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়।" মৈত্রেয় অর্থাৎ "শান্তি ও করুণার বুদ্ধ" অর্থাৎ মুহাম্মদ। (দিঘা-নিকায়া। সংগৃহীত–'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফা)

ধর্মনেতা গুরু নানক বলেছেন ঃ

"বেদ ও পুরণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।"

সাধু, সংস্কারক, গাজী, পীর, শেখ ও কুতুবগণ অশেষ উপকার কুড়াবেন যদি তাঁরা পবিত্র নবীর উপর দরুদ (আল্লাহর নেয়ামত) পাঠান।

"মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং দোযখে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।"

(সংগৃহীত এস. এ. সিদ্দিকী, বার-এট-ল রচিত–'সত্য সমাগত'। পৃঃ ৬৯।)

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

বিশ্বমানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে সত্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তার সাক্ষ্য মেলে। মুহাম্মদের উম্মাত না হয়েও, ইসলামে দীক্ষিত না হয়েও কেমন সুন্দরভাবে স্যার উইলিয়াম মুইর এই মহামানবের কৃতিত্ব, চরিত্র ও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই পরিচয়ে ঘুমন্ত মুসলিমের যেমন চেতনা আসবে তেমনি চেতনা আসবে সজাগ ধর্মপ্রাণ বিজাতিদের। তিনি বলেছেন,

"মুহাম্মদের অনুশাসনগুলি যেমন ছিল স্বল্পসংখ্যক, তেমনি ছিল সহজবোধ্য। তাঁর শিক্ষা ছিল অলৌকিক এবং মহোৎকর্ষ দ্বারা সম্পাদিত। আদিম খ্রীষ্টধর্ম সুপ্ত জাতিকে সজীব করতে প্রয়াস পেয়েছিল এবং পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সত্য কথা, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ, ধর্মের জন্য এমন ত্যাগ এবং বিবেকের জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যকে এরূপ সানন্দে গ্রহণ করতে পারে নি।"

[W. Muir. Life of Mehemat, Volume II, Page—269-70]

ফরাসী লেখক আলফ্রেড দে লা মার্টিন তাঁর তুর্কীর ইতিহাস গর্বভরে লিখেছেন–

"উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপায় উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা যদি এই তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয় তা হলে ইতিহাসের জন্য কোন মহামানবকে এনে মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাথে তুলনা করবে এমন সাহস কার আছে?

দার্শনিক, বক্তা, ধর্মপ্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম-পদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা– দেখ এই মুহাম্মদকে (দঃ)। **মানুষের মহত্ত্বের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে?"১**

(Parts from the Holy Prophet. Page—110-111)

টীকা–১। 'সংগৃহীত ইসলাম প্রসঙ্গ'– ডক্টর শহীদুল্লাহ। পৃষ্ঠা ২০৫ এবং ২১১।

মনীষীরা মহামনীষীদের গুণে মুগ্ধ। তাঁরাই তাঁদের প্রকৃত ভক্ত। তাঁদের শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রেরণা যোগায় এবং ভক্তিভরে মাথা নত করে দেন এই মহাপুরুষদের শিক্ষার ও চরিত্রের কাছে। জাতিভেদ, ধর্মভেদ এবং কৌলিন্যভেদকে তাঁরা লাথি দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। এসব চিন্তাশীল লেখক বিজাতি হলেও স্বজাতির চাইতেও আপন। মহামনীষীদের পাশেই হবে তাঁদেরও আসন। কেননা যুগ যুগের ইতিহাসে তাঁরা হবেন অমর, অক্ষয়। সর্বযুগের সর্বজাতি তাঁদের এ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যকে ভক্তিভরে মানতে বাধ্য। আর না মেনে উপায় কি? একজন দু'জন নয়। ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, ধর্মতত্ত্ববিদ ব্যক্তিরাই শুধু নন, বিপ্লবী বীর সৈনিক আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ও বিশ্ববিশ্রুত মহামতিগণও একবাক্যে হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে শান্তির রাজ্য স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি মুসলমানের পক্ষ হতে এমন নির্দেশ হতো তা হলে বলতাম যে নিজধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে তাঁরা অতিরঞ্জিত করে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) শীর্ষস্থানে তুলে ধরেছে; কিন্তু তা নয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মনীষীরা সে ধারণারও সমাধি রচনা করেছেন নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন :—

"মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন এমন রাজা, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুসলমানগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করেন। উহারা ১৫ বৎসরে অধিকতর আত্মাকে মিথ্যা দেব-দেবী হইতে ছিনাইয়া আনে, অধিকতর দেবমূর্তিগুলি ধুলিসাৎ করে, অধিকতর পৌত্তলিক মূর্ত্তি ধ্বংস করে যাহা পনর শত বৎসরেও মুসা এবং যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণকারিগণ করিতে পারে নাই। মুহাম্মদ একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে বস্তুত একজন ঈশ্বর বলা যাইতে পারিত যদি তিনি যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তুতি ঘটনাচক্র দ্বারা না ঘটিত। যখন তিনি আবির্ভূত হন তখন আরবগণ বহু বৎসর ধরিয়া ঘরোয়া যুদ্ধে জর্জরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অন্য জাতিরা যাহা কিছু বড় দেখিয়াছে, তাহারা সেই সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া তাহাই দেখিয়াছিল যাহাতে তাহাদের দেহ ও আত্মা সমভাবে পুনরায় নবীনত্ব লাভ করিয়াছিল।"১

BONAPARTE L'ISLAM, Page No. 109

পাদরী বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন :

"ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে— মুহাম্মদ একাধারে তিনটির স্থাপয়িতা— একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।"২

MUHAMMED AND MOHAMMEDANISM

মহামতি কার্লাইল বলেছেন :

"তিনি ছিলেন তাঁহাদের একজন যাঁহারা প্রত্যেক জিনিস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করিয়া তৃপ্ত হন না। প্রকৃতি স্বয়ং তাঁহাকে সারল্যের প্রতিমূর্তি করিয়া গড়িয়াছিলেন। অপরে যখন বাধাগত এবং জ্ঞানশ্রুতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করিত তখন এই ব্যক্তি নিজকে বাধাগতের আড়ালে গোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের আত্মা ও বস্তুর বাস্তবতাই ছিল তাঁহার একমাত্র সহচর এবং আলোচ্য বিষয়। জীবনের বিরাট রহস্য উহার

টীকা—১-২। সংগৃহীত—'ইসলাম প্রসঙ্গ' ডক্টর—শহীদুল্লাহ। পৃষ্ঠা ২০৫ এবং ২১১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্তর্নিহিত আশঙ্কা ও ঔজ্জ্বল্যসহ তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইল।"

[CARLYLE'S WORKS Vol. VI, Page No. 225]

ফিলিপ কে, হিট্টি বলেছেন :

"মুহাম্মদ তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে অনুল্লেখযোগ্য জাতির মধ্য থেকে এমন একটি জাতি ও ধর্মের পত্তন করলেন যার ভৌগোলিক প্রভাব খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের অতিক্রম করে গেল। মানব জাতির বিপুল অংশ আজ তাঁর অনুসারী।"

(ফিলিপ কে, হিট্টি— দি হিস্ট্রি অব দি এরাব্স। ম্যাকমিলন এ্যান্ড কোঃ লিমিটেড, লন্ডন ১৯৫৩ ইং)

আর্থার এন, ওয়ালস্টন বলেছেন :

"মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি (মুহাম্মদ [দঃ]) ছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে কেউ কোনদিন আর তা অতিক্রম করতে পারে নি। কিংবা কেউ তাঁর সমপক্ষ হতে পারে নি।"

[আর্থার এন. ওয়ালস্টন—Half Hour with Prophet]

ডব্লু মন্টোগোমারী ওয়েট বলেছেন :

"তিনি (মুহাম্মদ [দঃ]) ছিলেন কুশলী শাসক। শাসনকার্যের জন্য লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।" (Mohammad—Prophet and Statesman)

সি. ডব্লু. সি. ওমান বলেছেন :

"ইতিহাসে প্রথম ও শেষ বারের মত আরবভূমিতে জগৎ সম্মোহনকারী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি তদানীন্তন ঘটনাপ্রবাহকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন গোটা মহাদেশীয় জীবনে।"

(দি বাইজানটাইন এম্পায়ার)

প্রফেসর স্টিফেন্স বলেছেন :

"মহাবিজ্ঞতা প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগে তিনি একই সঙ্গে তাঁর দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।"[১]

ডক্টর মার্কোস উড বলেছেন :

"ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায় সম্পদ-হারা হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন। কিন্তু কোন প্রাচুর্যের মোহ, কোন হুমকি কিংবা প্রলোভনই তাঁর ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি।"[২]

ডক্টর গুস্টভি উইল বলেছেন :

"তিনি রক্তপিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তির আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বকালীন আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

[প্রফেসর স্টিফেন্স, ডক্টর মার্কোস উড, ডক্টর গুস্টভি উইল, হোরেস শিপ এবং ডি. জি. হাগারথ-এর মন্তব্যগুলো ১৯৭৪ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা থেকে গৃহীত]

তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি ক্রীতদাসের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও এতিমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।" ৩

হোরেস শিপ বলেছেন :

"তিনি (মুহাম্মদ [দঃ]) আরবকে দেখতে পেয়েছিলেন পৌত্তলিকতা অধ্যুষিত গোত্র-বিভক্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজশক্তির ভয়ে সদা-আতঙ্কিত একটি ভূখণ্ড হিসাবে। তিনি একে রেখে গেলেন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং মহান এক ধর্মের ধারক হিসাবে। তিনি পৃথিবীতে নিয়ে এলেন বিপ্লব-শক্তির আধার এক একত্ববাদী ধর্মকে।"[৪]

(Faith That Moved the World)

ডি. জি. হোগারথ বলেছেন :

"তাঁর দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সব কিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে যা আজও কোটি কোটি মানুষ সজ্ঞানভাবে মেনে চলেছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোন অংশ নির্ভুল মানুষ হিসাবে আর কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা চলে না।"[৫] (A History of Arabia)

এডওয়ার্ড গিবন বলেছেন :

"তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিশাল, তাঁর রসিকতা ছিল শালীন ও সদাপ্রস্তুত, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উন্নত ও মহৎ; তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল পরিষ্কার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী, চিন্তা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সাহস ছিল অসীম।"

[Decline and Fall of Roman Empire)

এ. লিউনার্ড বলেছেন :

"এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি কখনও ঈশ্বরকে দেখে থাকেন, কোন মানুষ যদি কখনও সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বরের কাজে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী মুহাম্মদ (দঃ)।"

(His Moral and Spiritual Value)

ঐতিহাসিক ড্রেপার (Draper) বলেছেন :

"তিনি নিজেকে অনাবশ্যক ধর্মতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করেন নি; কিন্তু ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতাচারিতা এবং নামায রোযা সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুগামীগণকে সামাজিক উন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি বদান্যতা দেখানো এবং তাদের জন্য দান-ধ্যান করাকে সবার উপরে স্থান দিলেন। যে সহনশীলতা ও উদারতা সাধারণত আজকাল দেখা যায় না তার পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, **যাঁরা যথার্থ সৎকর্মে নিয়োজিত, তাঁরা যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন মুক্তিলাভ তাঁরা করবেনই।** ... মানবগণের মধ্যে মুহাম্মদ মানব জাতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।"[১]

টীকা—১ সংগৃহীত—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব ও ধর্ম। কৃত মোঃ আবেদ আলী, বি. এ. অনার্স এম. এ. বি. টি (ভারত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ (Dr. Tara Chand) লিখেছেন :

"বিশ্বাসের সরল সূত্র উত্তমরূপে বর্ণিত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের গঠনতন্ত্রীয় তত্ত্ব নিয়ে ইসলাম দৃশ্যপটে উপস্থিত হলো। .... যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছেন তা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল। এ ধর্মে খুব কমসংখ্যক উপদেশাবলী ও আচার অনুষ্ঠান বর্তমান, কারণ কোরআন অনুসারে 'আল্লাহ্ মানবের ভাবকে হালকা ও সরল করতে চেয়েছেন। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় কেন্দ্রীয় উপদেশ হল ঈশ্বরের একত্ব এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধর্মানুষ্ঠান দৈনন্দিন প্রার্থনা, উপবাস (রোযা), তীর্থযাত্রা (হজ্ব), দান (যাকাত) এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তাঁর প্রতি (মুহাম্মদ দঃ) বিশ্বাসই হল এই ধর্মের প্রধান প্রধান স্তম্ভ। সামাজিক দিক থেকে এ ধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রভাবনীয় বৈশিষ্ট্য হল— মুসলমানগণের মধ্যে একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা এবং পুরোহিত শ্রেণীর অনুপস্থিতি।"*

প্যারাডাইজ লস্টের কবি জন মিল্টন বলেছেন :

"কনস্ট্যানটাইনের কালের বহু আগে অধিকাংশ খ্রীষ্টান তাদের মতবাদ ও আচরণ উভয়েরই অনেকখানি আদিম শুচিতা ও ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে বসেছিল। পরবর্তীকালে যখন চার্চের সমৃদ্ধি সাধন হয়েছে, তারা তখন সম্মান আর রাজকীয় ক্ষমতার প্রেমে পতিত এবং খ্রীষ্টধর্ম ভরাডুবির প্রান্তে উপনীত। মুহাম্মদ আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও মিশরের অনেকাংশ থেকে। সর্বাংশেই আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত। প্রবক্তাদের মনের উপর মুহাম্মদের ধর্মশক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাবে। অতীতে অন্যান্য সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থা। সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে স্থাপন করার অভিজ্ঞতা লাভে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবু তাঁর অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে আনাকে ঠেকিয়েছে এবং কোন দৃষ্টিগোচর মূর্তি দ্বারা উপাস্যের জ্ঞানালোকিত ভাবরূপকে কখনও কলঙ্কিত না করেই তারা গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছে। **আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহয় এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদে।**— এই হলো ইসলামের সহজ অপরিবর্তনীয় ঘোষনা।"[১]

এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন :

"উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই সমস্ত মহৎ গুণের অধিকারী হওয়ার দরুণ মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রকার মানুষের অন্তরেই স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।"[১*]

(An Outline of the History)

---

* সংগৃহীত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব ও ধর্ম। কৃত মোঃ আবেদ আলী, বি. এ. অনার্স এম. এ. বি. টি (ভারত)

টীকা—১ সংগৃহীত সত্য সমাগত। কৃত এস. এ. সিদ্দিকী। পৃষ্ঠা নং ৮২

২* চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি; সীরাত স্মরণিকা, ঢাকা, ১৯৭৪

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন :

"হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম, এর সত্যতা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়-নীতি, পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রানিত করে। কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ একদিকে শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। ... তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

"মুহাম্মদ ছিলেন সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর।"[৩]

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন :

"ইসলাম তার গৌরবময় দিনগুলোতেও অসহিষ্ণু ছিল না। তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে উদিত হলো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল স্বস্তি। ইসলাম একটা মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহলে আমার মতই তারাও একে ভালবাসবেন।

অনুচরদের জীবনী থেকে আমি খোদ নবীর জীবনী অধ্যয়নে উপনীত হলাম, দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ করলাম যখন, তখন দুঃখিত হলাম এ জন্য যে সেই মহৎ জীবন সম্পর্কে আর কিছু পড়ার রইল না আমার। আগের যে কোন সময়ের চেয়ে আমার বিশ্বাস জন্মাল যে, তরবারী নয় যার সাহায্যে ওই সময়ে জীবনের পরিকল্পনায় ইসলামের আসন অর্জিত হয়েছিল, তা ছিল নবীর কঠোর সারল্য, সম্পূর্ণ অহম বিলোপ, চুক্তির প্রতি সযত্ন সম্মান, বন্ধুজন ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর নির্ভীকতা।

পুরোহিত প্রথা আর নয়— নবী মুহাম্মদ অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিলেন পুরোহিত প্রথার যাদু। আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝখানে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না ইসলামে। আরম্ভ থেকেই তা ছিল এক গণতান্ত্রিক ধর্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি কোন প্রথা। কোরআন পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই প্রবেশ অধিকার ছিল ঐশী বাণীতে যা ব্যাখ্যা হতো মুক্তভাবে, ধর্মসভার স্বেচ্ছা-সীমিত করণ ব্যতিরেকেই। এই দিক থেকে ইসলাম খ্রীষ্ট-ধর্মের অনুরূপ কোন সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে নি, বস্তুত যে গণতান্ত্রিক ধারণা ইসলামে প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে, খ্রীষ্ট-ধর্মে তার আরম্ভ হলো মাত্র জাতীয়তাবাদ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-বিপ্লবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে।"

[Quoted in the Vindication of the Prophet of Islam. pp. 26-27]

৩—Swami Vivekananda's Works Vol-I, IV The Great Teacher of the World. Page 129—130

pdf By Syed Mostafa Sakib

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন :

"I joined Lincon's Inn because there on the main entrance, the name of the prophet was included in the list of the great law-givers of the world' *

অর্থাৎ 'লিকন-ইন' আইন কলেজের প্রবেশপথের উপরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান রচয়িতাগণের তালিকার মধ্যে পয়গম্বরের নাম উল্লেখ ছিল বলে আমি এই আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম।

মিঃ হোমি জে. রুস্তমজি, বার-এট-ল, লিখেছেন :

"ইসলামের পয়গম্বর হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি উচ্চ-নিচের পার্থক্য দূরীভূত করে মানব জাতিকে সত্য ও সাম্যের বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি মানব জাতির পরিচালক। নৃপতিগণের মধ্যে তিনি মহোত্তম নৃপতি ও নিরহঙ্কারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নিরহঙ্কার। আমি যতদূর জানি, ইসলাম সাম্যের যে শিক্ষা দিয়েছে অন্য কোন ধর্মে তা দেখা যায় না।"*

স্যার পি. সি. রামস্বামী আয়ার বলেছেন :

"মুহাম্মদের ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে সামান্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতির অহঙ্কার, হীনমন্যতার প্রবণতা, সাদা-কালো বাদামী বর্ণের অহঙ্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি অন্য কোন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাই না। দেখতে পাই ইসলামেরই শুধু এমন কোন অহঙ্কার নাই।"*

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন :

[১৯৮০ খ্রীঃ বিশ্বনবীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন]

"হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষেরই উচিত তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা।"*

দেওয়ান বাহাদুর এস. পি. সিং. এম. এল. এ. লিখেছেন :

"ইসলামের পয়গম্বর একজন মহান রাষ্ট্রশাসনবিদ ও নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফলকাম নেতা ছিলেন। যেহেতু কোরআন যীশুখ্রীষ্টকে উচ্চ প্রশংসা করে কাজেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হেতু আমি ইসলামের পবিত্র পয়গম্বরকে সম্মান করতে বাধ্য। যখন একদল খ্রীষ্টান প্রতিনিধি এই পবিত্র পয়গম্বরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর মসজিদের পবিত্র স্থানটি তাঁদের প্রার্থনা করার জন্য ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলমান শাসনকর্তাদের আমলে খ্রীষ্টানদের গীর্জাগুলি পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়েছে। এই পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার উদাহরণ এই দেশে অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে।"*

---

* চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলো "সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব ও ধর্ম" থেকে সংগৃহীত।

এম. এন. রায় লিখেছেন :

'মুহাম্মদের কঠোর একেশ্বরবাদ, আরবীয় মুসলমানদের তরবারী সঞ্চালনে এমন অজেয় ক্ষমতা দান করল যে, তা' শুধু আরব উপজাতিগুলির দূষিত পৌত্তলিকতাকেই নষ্ট করল না, জরথুষ্ট্রীয় অপপ্রচার থেকে, আচার-ভ্রষ্ট খ্রীষ্টধর্মের অঘটন ও অন্ধবিশ্বাস থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র সহায় হয়ে রইল। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁদের তরবারি মানব জাতির সেবায় তথা মনাবতার অগ্রগতির পথেই চালিত হয়েছিল। ...

ইসলাম অবদান রাখল আদর্শগত ব্যবস্থা নির্মাণে যা' নিয়ে এলো পরবর্তী সামাজিক বিপ্লব। ... ... ইসলাম ইউরোপকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে দিল মুক্তি, আর তার সঙ্গেই গড়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ।'*

[The Historical Role of Islam]

স্যার গোকুল চান্দ নারঙ (বার-এট-ল) বলেছেন :

"আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিল এক নতুন জীবন তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক আর শিক্ষা ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে আরম্ভ করল একদিকে বাংলা অন্যদিকে স্পেনের উপর।"

[এস. এ. সিদ্দিকী, বার-এট-ল রচিত— 'সত্য সমাগত'। পৃষ্ঠা ৬৯-৭০]

প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম বলেছেন :

"মুহাম্মদের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণাঙ্গ ও কলঙ্কহীন এবং কতক ব্যাপারে যীশু-খ্রীষ্টের চেয়ে উন্নততর। মুহাম্মদ কখনো নিজেকে ভগবানের সমান মনে করেন নি। তাঁর অনুসারীরা কখনো একবারের জন্যও বলে না যে তিনি শুধু একজন মানুষের বেশি আরও কিছু ছিলেন। তারা কখনো তাঁর উপর ঐশী সম্মান আরোপ করেন না।"

"নবী সব সময়ই ভগবানের প্রেরিত পুরুষ বলেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কতক দিক থেকে যীশুখ্রীষ্টের চেয়ে মুহাম্মদ মানুষের কাছে উন্নততর দৃষ্টান্ত। পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষ নেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদী জীবনযাপন করে গেছেন। যীশুখ্রীষ্টের বৈপরীত্যে তিনি কঠোর পরীক্ষাতেও কখনো অভিযোগ করেন নি। কখনো ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসের একটি শব্দও উচ্চারণ করে বলেন নি—

"হে প্রভু! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করছ!" মুহাম্মদ তাঁর সহচরগণকে শিখিয়েছিলেন পুণ্যকে ভালবাসতে এবং পাপকে ঘৃণা করতে।

খ্রীষ্টান জগৎ ভাল করবে যদি তারা স্মরণ করে, মুহাম্মদের ধর্মমত তাঁর অনুসারীদরে মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এমন এক উদ্দীপনা যা যীশুর নিকট অনুসারীদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিফল হবে। যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অরক্ষিত এবং মরণের মুখে অসহায় রেখে ফেলে যায়। এর বিপরীতে মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁদের উৎপীড়িত নবীর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শত্রুর উপরে বিজয় লাভ করে। সুতরাং— **আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (দঃ) অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ার অধিকতর মঙ্গল করে গেছেন।"***

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রফেসর সাধু টি. এল. বাস্বনী বলেছেন :

"দুনিয়ার অন্যতম মহৎ বীর হিসাবে মুহাম্মদকে (দঃ) আমি অভিবাদন জানাই। মুহাম্মদ (দঃ) এক বিশিষ্ট শক্তি। আল্লাহ্ রহমানুর রহিমের মহৎ বাণী নিয়ে ইসলাম অগ্রসর হয়েছে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার মশাল বহন করে নিয়ে গেছে আফ্রিকা, চীন, মধ্য-এশিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া ও ভারতবর্ষে। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল কর্ডোভার বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় যা সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন অংশের খ্রীষ্টান শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করত; সেই সব শিক্ষার্থীদেরই একজন যথাসময়ে রোমের পোপ হয়েছিলেন। যে সময় ইউরোপ ছিল অন্ধকার তখন স্পেনে মুসলিম পণ্ডিতেরা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোকবর্তিকা।"*

মেজর জেনারেল ফার্লঙ বলেছেন :

"তাঁর প্রকাশিত ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ ও ত্রুটির, তাঁর কাল ও পারিপার্শ্বিকতার সুদীর্ঘ পরিপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন অধ্যয়নের পর (যে অধ্যয়ন চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ে ব্যাপ্ত) এবং সকল শ্রেণী ও জাতির মুসলমানদের সঙ্গে নিকট-সম্পর্কযুক্ত হলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক ও ইতিহাস স্রষ্টাদের তালিকায় এই নবীর স্থান খুব উচ্চে। শিবিরে ও পরামর্শ সভায় সমভাবে, মানুষের শাসনকর্তা, প্রশাসক এবং সাহসী ও হাঙ্গামাকারী উপজাতি বা সুস্থিত জাতির সংগঠক হিসাবে একইভাবে রাজনীতিজ্ঞ, বন্ধু এবং শত্রুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মুহাম্মদ। ব্যক্তিগতভাবে ও জনসাধারণের মধ্যে যাঁরাই তাঁকে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁদের সকলের ভালবাসা, খ্যাতি ও শ্রদ্ধাই তিনি লাভ করেছেন।"*

[Short Studies in the Science of Comparative Religion]

প্রফেসর স্নাউক হারগ্রোনজে বলেছেন :

"মানবীয় জাতিসংঘের আদর্শ অন্য কোন ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুহাম্মদের ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানবজাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।"*

প্রফেসর ল্যা মারটিন বলেছেন :

"দার্শনিক, সুবক্তা, স্বর্গীয় দূত, আইন প্রণয়নকারী, যোদ্ধা, ধারণায় বশীভূতকারী, যুক্তিপূর্ণ মতবাদের মূর্তিবিহীন ধর্মীয় প্রথার পুনঃ-সংস্থাপনকারী বিশটি আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা— এই ছিলেন মুহাম্মদ! যা দিয়ে মানবীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে তার সকল মানের বিচারেই আমরা যথার্থই এই প্রশ্ন করতে পারি— **মুহাম্মদের চাইতে মহত্তর কোন ব্যক্তি কি আছেন ?**

"মুহাম্মদ বিনম্র, তবু নির্ভীক; শিষ্ট, তবু সাহসী; ছেলেমেয়েদের মহান প্রেমিক— তবুও বিজ্ঞজন পরিবৃত; তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, প্রতিকূল ঘটনায় বা সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা

দারিদ্র্যে, শান্তিকালে বা যুদ্ধে অবিচলিত, দয়ার্দ্র, অতিথিপরায়ণ এবং উদার, নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনি, কুৎসাকারী, অপব্যয়ী ও অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এ জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে। ধৈর্যে, বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায়, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা (নামায) অনুষ্ঠানে তিনি এক মহান ধর্ম প্রচারক।"*

[History of Turkey]

জর্জ বার্নাডশ' বলেছেন :

"আমি বিশ্বাস করি : সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সংস্কারকৃত মুহাম্মদবাদ গ্রহণ করবে।"

কথাটাকে নিশ্চিত করার জন্য জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, "সব সময়েই আমি মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে, তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির জন্য উচ্চ শ্রদ্ধা পোষন করে এসেছি। এটাই একমাত্র ধর্ম যা আমার কাছে অস্তিত্বের পরিবর্তনীয় স্তরসমূহের ঐকান্তিক ধারক বলে মনে হয়েছে, নিজেকে তা প্রত্যেক যুগের কাছেই তা অনুভূতি জাগ্রতকারী রূপে সাজিয়ে নিতে পারে, আমার মতে বিখ্যাত লোকদের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর দুনিয়া অবশ্যই সন্দেহাতীত উচ্চ তাৎপর্য আরোপ করবে। মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে আরম্ভ করেছে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীবর্গ হয় অজ্ঞতা, নয় গোঁড়ামির মাধ্যমে মুহাম্মদবাদকে কৃষ্ণতম রঙে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা মানুষ মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম উভয়কেই ঘৃণা করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের কাছে মুহাম্মদ ছিলেন খ্রীষ্ট-বিরোধী। আমি তাঁকে— এই আশ্চর্য মানুষটিকে, অধ্যয়ন করেছি এবং আমার মতে, খ্রীষ্ট-বিরোধী বলা ত দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার উদ্ধারকারীই বলতে হবে।"

"আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত কোন ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি।"*

(.... I belive, if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of this modern world he could succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness.)

(Getting Married) পুস্তকের ১৯২৯ সংস্করণ

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বহিরা বলেছেন :

"এই ত সেই বিশ্বমানবদের পথপ্রদর্শক! এই ত সেই যীশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা। আল্লাহ উহাকেই ত সকল জগতের আশীর্বাদ স্বরূপ পাঠাইয়াছেন।"

[বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা।]

---

* চিহ্নিত মন্তব্যগুলি এস. এ. সিদ্দিকী বার-এট-ল'র "সত্য সমাগত" থেকে সংগৃহীত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বালক হযরত যখন তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের সঙ্গে সিরিয়া ভ্রমণে যান এবং বসোরা নগরে উপস্থিত হন তখন এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। কথিত আছে যে আবু তালেব এই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর মঠের নিকটেই তাঁবু করেছিলেন। বহিরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সন্ন্যাসী ছিলেন। বাইবেলের উপর তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। বাইবেলে বর্ণিত হযরতের আগমনবার্তা দেখে তিনি বেশ কিছুদিন থেকে এ মহাপুরুষের সন্ধান করছিলেন। হযরত যখন সেখানে উপস্থিত হন তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন, নৈসর্গিক চিহ্ন প্রভৃতি দেখে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে তিনিই বিশ্বের কল্যাণ— জগদ্‌গুরু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

হযরতের সম্মানার্থে তিনি এক ভোজসভার আয়োজন করেন এবং আবু তালেব ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেন। হযরতের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি শেষ পয়গম্বর। তাই তিনি আবু তালেবকে সতর্ক করে দেন যেন ইহুদীরা এ বালকের প্রকৃত পরিচয় না পায়। কেননা ইহুদীরা জানতে পারলে হযরতকে নিশ্চয়ই খুন করবে। আবু তালেব এ উপদেশ পেয়ে হযরতকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসেন এবং সযত্নে তাঁকে প্রতিপালন করেন।

ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে হযরত মুহাম্মদের আসন সর্বোপরি। চলুন আমরা পয়গম্বরদের মতামত নিয়ে এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করি।

পয়গম্বরগণের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

আল্লাহর বন্ধু— হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বলেছেন :

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে ইহা গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতে একদলকে তোমার অনুগত করিও; এবং আমাদিগকে প্রার্থনাপ্রণালী প্রদর্শন ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হও; নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। হে আমাদের প্রতিপালক আর তাহাদিগ হইতে তাহাদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করিও— যিনি তাহাদের সমক্ষে তোমার নির্দশনাবলী পাঠ করিবেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"[১]

খ্রীষ্ট ধর্মনেতা হযরত ঈসা (যীশু) বলেছেন :

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না, কিন্তু যদি আমি যাই তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন। পাপের সম্বন্ধে কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না। ধার্মিকতার সম্বন্ধে কেননা আমি পিতার নিকট যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। বিচারের সম্বন্ধে কেননা এ জগতের অধিপতি বিচারিত হইয়াছেন। তোমাদের বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[২]

অন্যত্র বলেছেন :

"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে কিন্তু সমস্ত জগৎ আনন্দিত হইবে। তোমরা দুঃখার্ত হইবে কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে। প্রসবকালে নারী দুঃখ পায় কারণ তার সময় উপস্থিত কিন্তু সন্তান প্রসব করিলে পর, জগতে একটি মনুষ্য জন্মিল এই আনন্দে তাহার ক্লেশ থাকে না।"[১]

টীকা—১ সূরা বকর। (আয়াত ১২৭-১২৯)। কাবার ভিত্তি দেবার পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) হযরত ইসমাইল-সহ হাত তুলে আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করেন।
২ বাইবেল। যোহন—জগৎ ও সত্যের আত্মাশীর্ষক ১৬ নং ৭ হইতে ১৩ ও ২০।
টীকা—১, ২ ও ৩ বাইবেল। যোহন—জগৎ ও সত্যের আত্মাশীর্ষক ১৬ নং ৭ হইতে ১৩ ও ২০।
পৃষ্ঠা ২৪৫ ১৪ নং ২৫ ও ২৬; ২৯ ও ৩০। পৃষ্ঠা—২৪২

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" [২]

"আর এমনটি ঘটিবার পূর্বে তোমাদিগকে বলিলাম যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের সহিত আর কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন।"[৩]

"এখন হইতে ঘটিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর যে আমিই তিনি। সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই; তাঁহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে গ্রহণ করে— যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"[৪]

যোহন বলেছেন :

"আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাহাকে তোমরা জান না।

তিনি সেইজন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি তাহার জুতার ফিতা খুলিবার যোগ্য নহি।"[৫]

ইহুদী ধর্মনেতা হযরত মুসা কি বলেছেন :

'সদা প্রভু আমাকে কহিলেন, "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তিনি উহাদিগকে তাহাই বলিবেন। আর তিনি আমার নামে আমার যে সকল কথা বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।"[১]

'তওরাত'-এ (পুরাতন বাইবেল) উদ্ধৃত বাণী হতে অনেকেরই এ ধারণা জন্মাতে পারে যে হযরত মুসা (আঃ) যে নবীর ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন তিনি হয়ত পরবর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ) অর্থাৎ 'যীশুখ্রীষ্ট' এ ধারণা খ্রীষ্টানদের করা স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথার উপরই বিচার করা চলে যে মুসার সদৃশ নবী হযরত ঈসা (আঃ) নন। কেননা তাঁর প্রচারপ্রণালী ও জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সঙ্গে— হযরত ঈসার সঙ্গে নয়। এ ছাড়া প্রতিশ্রুত নবী বলতে হযরত মুহাম্মদকেই (দঃ) বুঝায়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব।

৪—বাইবেল, যোহন—১৩ নং (২০) এবং ১ নং ২৬-২৭ পৃঃ ১১৯
৫—বাইবেল, যোহন—১৩ নং (২০) এবং ১ নং ২৬-২৭ পৃঃ ১১৯
১—ঐ—তওরাত। দ্বিতীয় বিবরণ ১১/ ১৮-১৯

আল্লাহ্ কী বলেছেন?

বিশ্বের দরবারে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আসন সর্বোপরি— এ সাক্ষ্য দিয়েছেন বিশ্বমনীষীরা। এবারে দেখি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সম্বন্ধে কি বলেছেন?

তিনি বলেছেন :

(১) হে মুহাম্মদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে কস্মিনকালেও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করতাম না।

(২) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করতাম না।

(৩) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে ওহে আদম! তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না!

(৪) যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তবে আমি নিজে পালনকর্তারূপে প্রকাশ হতাম না।

(৫) আমি গুপ্ত ছিলাম। যখন চাইলাম নিজেকে প্রকাশ করতে তখন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করলাম তোমাকে। [হাদিসে-কুদসী]

বিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্য আল্লাহর বাণী থেকে আমরা খুঁজে পেলাম। হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সৃষ্টি না করলে এ বিশ্বের কোন কিছুই যে সৃষ্টি হত না— তাঁকে কেন্দ্র করেই যে জানা-অজানা যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি— এ কথা উপর্যুক্ত বাণী আমাদের শিখিয়ে দিল। যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হযরত আদমকে বেহেশতচ্যুত হতে হয়েছিল সে ভুল তাঁর নিজের নয়— ইচ্ছাকৃত নয়। আজাজিল শয়তানের পিছনেও যে ছিল এক উদ্দেশ্য সেটাও যেন এ বাণী পরিষ্কার করে দিল।

আল্লাহ্-পাক নিজেই বলেছেন যে তিনি ছিলেন অজ্ঞাত। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছেতেই মুহাম্মদকে (দঃ) পাঠালেন, আর তাঁকেই ভূষিত করলেন 'আহম্মদ' খেতাব দিয়ে। তাঁর গবেষণার জন্যও সৃষ্টি করলেন এক বিশাল ল্যাবরেটরী যাকে সুসজ্জিত করা হলো চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষরাজি, সাগর, মহাসাগর ও অজস্র উপাদানে। এগুলোই হলো এ মহাবিজ্ঞানীর চিন্তার উপকরণ। তাঁকে সাহায্য করতে এলেন যুগে যুগে বিজ্ঞ অভিজ্ঞ মহামনীষীবৃন্দ। সৃষ্টিকর্তা সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ। ল্যাবরেটরীর মহাপরিচালক হযরত মুহাম্মদ (দঃ)—তাঁর নবী-পয়গম্বর।

চলুন, আল্লাহর বাণী ধরে এ মহাপরিচালকের সঠিক পরিচয় আমরা বহন করি এবং হৃদয়কোণে তাঁকে যত্নের সঙ্গে গেঁথে রাখি।

আল্লাহ বলেন :

"এই সকল রাসুল— আমি যাহাদের কাহারো উপর কাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি— তাহাদের মধ্যে কাহারো সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদের কাহাকেও পদমর্যাদায় সমুন্নত করিয়াছেন এবং আমি মরিয়ম-নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করিয়াছি এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদের পরবর্তীগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আসিবার পরে তাহারা সংগ্রাম করিত না; কিন্তু তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিয়াছিল— যেহেতু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছিল; এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, পরন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন।"[১] (২ : ২৫৩)

উপর্যুক্ত কোরআনের বাণীগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মতামত যাচাই করব এবং রাসুলুল্লাহর (দঃ) প্রকৃত আসন দেখব। আমরা মুসলমান— আল্লাহ এবং রাসুলের উপর বিশ্বাসী। হিংসা-দ্বেষ এবং অপর জাতির নিন্দা আমরা করতে রাজি নই। কেননা প্রতিটি জাতির মুক্তিকামী মহাপুরুষদের চরিত্রই ছিল উন্নত। প্রত্যেকেই সরল এবং সুপথ দেখিয়ে মানব জাতিকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। তাই কোন মহাপুরুষকেই হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরাট মতভেদ ছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের উপর তারা যে সন্দেহ পোষণ করছিল কোরআন তার অবসান করে দিয়েছে। ইহুদীদের ধারণা ছিল হযরত মুসা (আঃ) ইসরাইল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং হযরত দাউদ (আঃ) সর্বগুণে গুণান্বিত মহাপুরুষ। অসাধারণ শক্তি ও সাহসের অধিকারী এই নবী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ইহুদীদের এ গৌরব মেনে নিতে রাজি ছিল না। তাদের দাবী যে হযরত ঈসা (আঃ) অর্থাৎ যীশু-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব। এদিকে মুসলমানগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত এবং কোরআন হাদিসের তত্ত্ব হতে জানত যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন পয়গম্বরদের নেতা—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। এই দ্বন্দ্বের অবসান করেছে কোরআন। কোরআন পূর্বোক্ত নবীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাবের কারণ যেমন স্পষ্ট করে বিশ্বমানবের সম্মুখে তুলে ধরেছে তেমনি পূর্বোক্ত নবীদের উপরও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। সূরা বাকারার উদ্ধৃত আয়াতসমূহ এবং নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে।

"অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে তাহার পরে তদ্বিষয়ে যে তোমার সহিত কলহ করে তবে তুমি বল— এস আমরা আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণকে এবং আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের জীবনসমূহ ও তোমাদের জীবনসমূহকে আহ্বান করি— তৎপর প্রার্থনা করি যে অসত্যবাদীগণের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, নিশ্চয় সেই আল্লাহই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কার্যকারীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন।"[১] (৩ : ৬১-৬৩)

উক্ত কোরআনের বাণী অবতীর্ণ হবার পিছনে যে রহস্য ছিল তা নিম্নরূপ—

নজরানের খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ যখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ইসলাম ধর্মের গৌরব মাহাত্ম্যে সন্দেহ করছিল তখন রাসুলুল্লাহ (দঃ) একদিন এর সুমীমাংসার জন্য এক সুন্দর পন্থা অবলম্বন করলেন। এ পন্থা আর কিছুই নয়— আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আনয়ন করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও প্রার্থনা করা, এই বলে :—

টীকা—১ কোরআন। সূরা বাকারা—আয়াত-২৫৩ নং
টীকা—১ সূরা আল ইমরান। আয়াত ৬১-৬৩।

"যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক এবং তারা ধ্বংস হোক।"[২]

কথিত আছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর বিশ্বাসী জামাতা— হযরত আলী, প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা এবং আদরের দৌহিত্রদ্বয় হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে নিয়েই এমন কঠিন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরতের এরূপ দৃঢ় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস দেখে খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ প্রমাদ গুণতে থাকে। তাদের ধ্রুববিশ্বাস জন্মেছিল যে এরূপ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁরা নবীর কাছে একদিনের সময় প্রার্থনা করেন। পরীক্ষার দিন দেখা গেল অনেকেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মান রক্ষার্থে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, আর বাকি অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। কোরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিকে মোবাহিলা বলা হয়।

ইহুদী, খ্রীষ্টান ও আরব পৌত্তলিকবাদীদের ধারণা ছিল যে, তারা আদি পিতা হযরত ইব্রাহিমের বংশধর। তাই তারাই প্রকৃত ধর্মের অনুসারী এবং সত্যধর্মের পর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্-পাক তাদের এ ধারণার অসারতা প্রমাণ করে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে :—

"নিশ্চয় সেই সকল লোক ইব্রাহিমের নিকটতর যাহারা তাহার ও এই নবীর অনুগামী হইয়াছে ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক"[১] (৩ : ৬৮)

হযরত ইব্রাহিম ইহুদী বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। পৌত্তলিকতাবাদেরও ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ ছাড়া ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় হযরত ইব্রাহিমের নির্দেশিত পথ মেনে চলেছে একথা দাবী করতে পারে না। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবান করে আত্মত্যাগের যে নিদর্শন রেখে গেছেন একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ই তাঁর পথকে অনুসরণ করে প্রতি বছর কোরবানি দেয়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) পবিত্র কা'বাগৃহে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে আহ্বান করেছিলেন প্রতি বছর সেখানে আল্লাহর আরাধনা করতে। কাবায় রক্ষিত মূর্তিগুলিকে তাই নিজ হাতে ধ্বংস করে কা'বার হেফাজত করেন। কোরআনেও এ কথার উল্লেখ আছে।

বিশ্বজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যধাম এই কাবা (আল্লাহর ঘর) হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কর্তৃক এই কাবার সংস্কার হয়। এই পবিত্র গৃহকে সৌভাগ্যযুক্ত ও বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করা হয়। কোরআন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে সূরা বাকারায় (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)।

বিশ্বের প্রতিটি জাতিই জানে যে হযরত ইব্রাহিম ছিলেন সত্যধর্ম প্রচারক। তিনিই ছিলেন ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুলমানদের আদি পিতা। তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তাঁর সম্বন্ধে বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে। হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাইল, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা, হযরত ঈসা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এই বংশেই জন্মলাভ করেন। এ বিষয়েও কোন জাতির দ্বিমত নেই যে তিনিই ছিলেন মানবকুল-শিরোমণি। তাই

টীকা—২। সংগৃহীত—কোরআনের তর্জমা। মোহাম্মদ আলী হাসান ও অন্যান্য। দালায়েলে নবুয়ত—আবু নইম।
টীকা—১। কোরআন-সূরা আল ইমরান। ৬৮ আয়াত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর বংশ গৌরবপ্রাপ্ত ও আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত। এতদসত্ত্বেও কেন ইহুদীরা জেরুজালেমকেই কেবলা অর্থাৎ লক্ষ্যস্থল বলে মনে করেন এ কথাও বুঝা কঠিন। 'জেরুজালেম' প্রতিষ্ঠিতি হয়েছিল ইব্রাহিম (আঃ)-এর পরে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সময়। ' জেরুজালেম' ও কা'বার মধ্যে লক্ষ্যস্থল কোন্‌টি এ নিয়ে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হলে আল্লাহ্-পাক পরিষ্কারভাবে কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

"নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর জন্য যে 'আদিগৃহ' নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহা মক্কার অন্তর্ভুক্ত, উহা সৌভাগ্যযুক্ত ও বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শক। তন্মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ— 'মাকামে ইব্রাহিম' অবস্থিত এবং যে উহার মধ্যে প্রবেশ করে সে শান্তিপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহে হজ্ব করা সেই সকল মানুষের কর্তব্য যাহারা তদ্দিকে পথাতিক্রমে সমর্থ; এবং যদি কেহ অবিশ্বাস করে তবে আল্লাহ্ বিশ্বজগতের উপর নির্ভরশীল নন।"[১] (৩ : ৯৬)

মাকামে ইব্রাহিম : ইব্রাহিমের স্থান— উহা একখানি প্রস্তর বিশেষ। হযরত ইব্রাহিম ঐ প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কা'বা গৃহ নির্মাণ করিতেন— এবং উহাতে তাঁহার পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

তাহলে দেখা যায় যে ইহুদী বা খ্রীষ্টানগণ তাদের আদি পুরুষকেই মানতে রাজি নয়। কেননা হযরত ইব্রাহিমের নির্মিত (যিনি সবার আদি পিতা) কা'বাকে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যধাম বলে স্বীকার করে না। তাই মুসলমানদের মত নির্দিষ্ট সময়ে হজ্ব পালনও করে না; অথচ আল্লাহর নির্দেশ সর্বজাতির সকল বিশ্বাসী মানব সন্তানকেই এই কা'বা তওয়াফ করতে হবে এবং এখানেই আল্লাহকে সেজদা দিয়ে শান্তি ও সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় হযরত মুসাকে (আঃ) [মোশী] ও হযরত ঈসাকে (আঃ) [যীশু] সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে স্বীকার করে কিন্তু তাহদের নবীর আদেশ মানে না। অথচ হযরত মুসা ও হযরত ঈসা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকেই অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। এমন কি এ কথাও বলেছেন যে যারা তাঁর পথ অনুসরণ করবে না তাদের তিনি প্রতিশোধ নেবেন। হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর উপদেশ বাণী আমি এ পুস্তকেই পৃথকভাবে দেখিয়েছি। ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে ঐ বাণীগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে কোরআনের সুস্পষ্ট ও সত্যবাণী ধরে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে যাচাই করতে অনুরোধ করছি। কেননা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর অবতীর্ণ এই কোরআনে কোন ভুল ত্রুটি নেই। ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির সত্যতা প্রতিপাদনকারী। সুস্পষ্ট ভাষায় কোরআন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে—

"তিনি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন— যাহা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী; এবং তিনি ইহার পূর্বে মানবমণ্ডলীর জন্য পথপ্রদর্শক তৌরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ফোরকান অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে; এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"[১] (৩ : ৩ - ৫)

টীকা—১ কোরআন। সূরা আল ইমরান—৯৬ আয়াত।
টীকা—১. কোরআন সূরা আল ইমরান—৩, ৪ ও ৫ আয়াত।

"তিনি তোমার প্রতি'— এ কথায় পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এই মহাসত্যের বাণী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপরই অবতীর্ণ হয়েছে যা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সত্যতা বহন করে। কোরআনকে এখানে ফোরকান বলা হয়েছে। এই গ্রন্থের সম্বন্ধে আবার বলা হয়েছে ইহা সকল গ্রন্থের জননীস্বরূপ।

"তিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, উহাতে সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ আছে— **উহা গ্রন্থের জননীস্বরূপ এবং অবশিষ্ট অস্পষ্ট,** অতএব যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, ফলতঃ তাহারাই অশান্তি উৎপাদন ও মিথ্যা বিশ্লেষণের জন্য অস্পষ্টের অনুসরণ করে। এবং আল্লাহ ব্যতীত উহার অর্থ কেহই অবগত নহে; এবং যাহারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহারা বলে আমরা উহাতে বিশ্বাস করি, উহাদের সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।"[২] (৩ : ৭)

দুটো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এই বাণীর মধ্যে ব্যবহার করা আছে, যেমন—

— মেন্‌হু আয়াতুন 'মুহকামাতুন' হুন্না উম্মুল কেতাবা ওয়া উখারু 'মোতাশা বেহাতুন'।

কোরআনকে 'মুহকামাতুন' এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে 'মোতাশা বেহাতুন' বলা হয়েছে।

'মুহকামাতুন'—এর অর্থ স্পষ্ট সুদৃঢ় ভিত্তি, দৃঢ়তা, স্পষ্ট বর্ণনা।

'মোতাশা বেহাতুন'— এর অর্থ অস্পষ্ট, মিলিত, মিশ্রিত, অস্পষ্ট অর্থবাচক।

আল্লাহর গ্রন্থের উপর কোন সমালোচনা চলে না। কেননা যে গ্রন্থই কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা বিশ্ব মানবের মহাকল্যাণ উদ্দেশ্যেই হয়েছে। অথচ আল্লাহ-পাক কেন নিজেই ঘোষণা করেছেন যে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ অস্পষ্ট, মিলিত, মিশ্রিত এবং পূর্ণ অর্থবাচক নয়। তাই সেগুলি অনুসরণ না করতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথাও উল্লেখ আছে—

"অতএব যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে, ফলতঃ তাহারাই অশান্তি উৎপাদন ও মিথ্যা বিশ্লেষণের জন্য অস্পষ্টের অনুসরণ করে।" (কোরআন)

"তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে? তাহারা বিপথ ক্রয় করিয়াছে এবং ইচ্ছা করে যে তুমিও পথভ্রান্ত হও।"[১] (৪ : ৪৪)

'মোতাশা বেহাতুন' এর অর্থও বুঝা যায় যে মিলিত, মিশ্রিত— মুসলমানগণ এ কথা বলে থাকে যে বাইবেল (তৌরাত ও ইঞ্জিল) বিশুদ্ধ নয়। কেননা পরবর্তীযুগে ধর্মযাজকগণ ইহাকে অনেক কাটছাঁট করে প্রকৃত মর্মার্থ হতে দূরে রেখেছেন। আল্লাহর কোরআন থেকে মুসলমানদের কাছে এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। তাছাড়া খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ধর্মযাজকগণ যারা নিজ হস্তকৃত কর্মদ্বারা 'বাইবেল' যোগ-বিয়োগ করে বাইবেলকে প্রাণহীন করেছেন তারাই কোরআনের দৃষ্টিতে অশান্তি উৎপাদনকারী— মহাপাপী।

তাদের কঠোর শাস্তির কথাও কোরআন ঘোষণা করেছে। এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় উহুদী ও খ্রীষ্টানদের নেই। কেননা আল্লাহর কোরআন এবং হযরত মুসার বাণী প্রমাণ দিচ্ছে যে এই অসৎকর্মশীল লেখকগণ 'বাইবেলকে' ধ্বংস করেছে।

"তাহাদের জন্য আক্ষেপ যাহারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে— যাহারা বলে যে উহা আল্লাহরই নিকট হইতে সমাগত। এতদ্বারা তাহারা সামান্য মূল্য অর্জন করিতেছে; তাহাদের

—২. কোরআন-সূরা আল ইমরান। ৭ আয়াত।
টীকা—১. কোরআন-সূরা নেসা। আয়াত ৪৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হস্ত যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি আক্ষেপ— এবং তাহারা যাহা উপার্জন করিতেছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি আক্ষেপ।"[২] (২ : ৭৯)

"অতএব তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হেতু আমি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন করিয়াছিলাম। তাহারা যথাস্থান হইতে বাক্যাবলী পরিবর্তন করিয়াছে এবং যদ্বিষয়ে তাহারা বিবৃত হইয়াছিল তাহার একাংশ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।" (হযরত মুহাম্মদের অংশটুকু বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।)

"তুমি বল, কে ঐ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মুসা মানবমণ্ডলীর জন্য জ্যোতি ও উপদেশ স্বরূপ আনয়ন করিয়াছিলেন যাহা তোমার বিক্ষিপ্ত পত্রের রক্ষা করিয়া উহার কিছু প্রকাশ করিতেছ এবং বহুলাংশ গোপন করিতেছ।"[৩]

মুসা (আঃ) বলেছেন :

'তোমার আপন আপন বংশের সমস্ত প্রাচীন বর্গকে একত্রিত কর; আমি তাহাদের কর্ণগোচরে এই সকল কথা বলি এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করি। কেননা আমি জানি আমার মরণের পরে তোমরা একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে এবং আমার আদিষ্ট পথ হইতে বিপথগামী হইবে; আর উত্তরকালে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে কারণ সদা প্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা করিয়া তোমরা আপনাদের হস্তকৃত কার্যদ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিবে।"[১]

"যারা দাবি করেন যে বাইবেল নিষ্কলুষ তাঁরা দেখুন বাইবেলে কি উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। সৎকর্মশীল লেখকগণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন তাই মোশীয় প্রকৃত বাণীই তুলে ধরেছেন। এ বাণী যদি অসৎকর্মশীল লেখকদের চোখে পড়ত তবে নিশ্চয়ই তা মুছে ফেলে নতুন বাণীর সংযোজনা করত এতে সন্দেহ নেই। বিশ্বাসী খ্রীষ্টান এবং ইহুদীরা এবারে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী, অপপ্রচারকারী লেখক এবং ধর্মযাজকদের প্রতারণা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবেন এবং কোরআনের বাণীগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে মুক্তির পথ প্রশস্ত করবেন।

উপরে উদ্ধৃত সূরা আন্-আম হতে দেখা যায় যে মুসার বাণীকে সম্পূর্ণ তওরাতে স্থান দেওয়া হয় নি। বিক্ষিপ্ত পত্রে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হতো। উহা হতে কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে; বাকি অংশগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই চাপা দেওয়া হয়েছে। তাঁর বাণী এভাবে চাপা দেওয়া হবে এ কথা মুসা (আঃ) জানতেন বলেই তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের সাবধান করে দিয়েছেন। তওরাত ও ইঞ্জিলের অর্থাৎ বাইবেলের প্রকৃত কথাগুলোর সঙ্গে কোরআনের গরমিল নেই। উপর্যুক্ত কোরআন ও বাইবেলের উদ্ধৃত বাণী হতে এ কথাও প্রমাণিত হলো।

উপরে বর্ণিত কোরআন ও বাইবেল হতে প্রমাণিত হলো যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক ও ধর্মযাজকগণ বাইবেলের অনেক স্থলে কাটছাঁট করে ইচ্ছামত তাঁদের কথা সংযোজন করেছেন। বহু শতাব্দীর পর হলেও এ সত্য উদ্ঘাটিত হলো ইহুদী, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের উক্তি থেকেই। দেখুন, সত্য কিভাবে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।

—২. কোরআন-সূরা বাকারা। আয়াত ৭৯।

—৩. সূরা আন-আম, আয়াত ৯১ এর শেষাংশ।

১— বাইবেল দ্বিতীয় বিবরণ। তৌরাত- মোশীর ৪র্থ বক্তৃতা ৬১ নং ৩২২ পৃঃ।

বিখ্যাত মনীষী ও ধর্মযাজক সেন্ট পল (St. Paul)— লিখেছেন :

'কিন্তু আমার মিথ্যা দ্বারা ঈশ্বরের সত্যের গৌরব যদি বৃদ্ধি পায় তবে আমিও বা পাপী বলে বিচারিত হইব কেন?"

[বাইবেল রোমীয় ৩-৭, পাপাধীনতায় সার্বত্রিক দূরবস্থা পরিচ্ছেদ]

বিশপ **Eusebius** লিখেছেন :

'I have related whatever might be ebounded to the glory and I have suppressed all that I could tend to discharge of our religion.'

অর্থাৎ 'যা কিছু আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে সে সকল আমি বাইবেলে সন্নিবেশিত করেছি এবং যা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের হানি হতে পারে সে সকলকে গোপন করেছি।'

'Christian Mythology Unveiled' নামক Casaubon পুস্তকে লিখেছেন :

I am much grieved to observe in the early ages of the Church that there were very many who deemed it praiseworthy to assist the divine world with their own fictions that their new doctrine might find a ready admittance among the wise men of the Gentiles." (80-82)

অর্থাৎ, লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি যে প্রাথমিক যুগে বিজ্ঞ অখ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হবার আশায় খ্রীষ্টমণ্ডলীর অনেকেই নিজেদের কল্পিত মিথ্যা কাহিনী রচনা দ্বারা স্বর্গীয় বাণীর সাহায্য করাকে গৌরবজনক কাজ বলে মনে করতেন।

John William Burgon B. D. তাঁর 'The causes of the corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

'These persons ..... evidently did not think it at all wrong to tamper with the inspired Text. If any expression seemed to them to have a dangerous tendency, they altered it, or transplanted it or removed it bodily from the sacred page.'

অর্থাৎ 'এই সকল ব্যক্তি ধর্ম পুস্তকগুলিতে বিকৃত করা যে আদৌ কোন দোষের কাজ তা স্পষ্টতঃই মনে করতেন না। ঐ সকল পুস্তকের কোন উক্তি তাদের নিকটে বিপদজনক মনে হলে, তাঁরা তা বদলে ফেলতেন, স্থানান্তরিত করতেন অথবা সম্পূর্ণ পদটা ধর্মগ্রন্থ থেকে একেবারে অপসারিত করে ফেলতেন।'

মর্মান্তিক পিকথল সাহেব লিখেছেন :

"অন্যান্য সকল ঐশীবাণী, মূলত যতই স্পষ্ট হোক বিভিন্ন আকারে সেগুলিকে নকল করা হয়েছে এবং সম্ভবত কোন কোন ক্ষেত্রে সদুদ্দেশ্যে প্রভাবিত হয়েই নির্বোধ ব্যক্তিরা এতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এই মনে করে যে এতদ্বারা তারা এর উন্নতি সাধন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতে পারবে অথবা যাতে তাদের মতের সমর্থনে ভবিষ্যতে এর থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। এই মনে করে তারা এই ঐশীবাণীগুলি নিজ মতামত ও বিশ্বাসের রঙে রঞ্জিত করেছে। এই কারণে ইহুদী ধর্মশাস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে অসংখ্য পুরোহিত বচন; কালে যা মোজেস, ডেভিড, সলোমান ও অন্যান্য নবীদের গ্রন্থকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে এবং বিবেচিত হয়েছে প্রভুর বাণীর চেয়েও বেশি কিছু। মুহাম্মদের সময়ে আরবে এযরা নবীর একটা রূপকথা, যেটি পবিত্র গ্রন্থের কোথাও পাওয়া যায় না, ইহুদীদের মধ্যে এত প্রাধান্য লাভ করে যে, তাদের অনেকেই এযরাকে সেই উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিল যে উচ্চ মর্যাদায় খ্রীষ্টানেরা যীশুকে উন্নীত করেছিল। এমনকি আজ পর্যন্তও প্রাচ্য দেশীয় ইহুদীদের কুসংস্কারকে যে কেউ ধারণা করতে সমর্থ হবে না যে তাদের সংস্পর্শে না এসেছে। তাদের সময়ের প্রধান অংশই ব্যয়িত হয় বলে মনে হয় মোহিনীশক্তি, যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য মন্ত্রাচারের সাহায্যে খারাপ আত্মার তুষ্টিসাধনে বা দূরীকরণে; শিশুকাল থেকে তাদের জীবন এক অন্ধকার ঐতিহ্যে আচ্ছাদিত ও শৃঙ্খলিত যা অর্গল-বদ্ধ করে আলোককে। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রকেও পরিবর্তিত করা হয়েছে, যার খবর কোরআন তের-শ' বছর আগে আমাদেরকে জানিয়েছে আর তা বিখ্যাত সমালোচকগণ বহু শতাব্দী পর খুঁজে পেয়েছেন; এছাড়া এ শাস্ত্র সন্দেহে পরিপূর্ণ (বাইবেল)। নকল থেকে এসে বহু মতবাদ খ্রীষ্টীয় মতবাদ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে—যেমন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, আদি পাপ বা একে তিন ও তিনে এক। চারিটি গসপেলের বিষয়বস্তু থেকে যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক পরিষ্কারভাবে এগুলি সম্বন্ধে কৃত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উক্ত গসপেলগুলির তারিখ তাদের গ্রন্থকার এবং ঐগুলির গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহ যার উপর সংস্থাপিত বিরাট খ্রীষ্টধর্মীয় গাঁথুনি তার যেকোন কিছু সম্পর্কেই সন্দেহ রয়েছে।"[১]

স্বজাতি, বিজাতি সবাই চলুন দেখি কিভাবে বাইবেলকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী জনাব আবেদ আলী, বি.এ. অনার্স, এম. এ. বি. টি. তাঁর **'মানব জাতির আদি ইতিহাস'** গ্রন্থে লিখেছেন—

"খ্রীষ্ট পূঃ ৫৮৭ শতকে ব্যবিলনের কালদীয় রাজা দ্বিতীয় নেবুকাদনেজার ফিলিস্তান (প্যালেস্টাইন) আক্রমণ করে জেরুজালেম জয় করেন এবং শহরটিতে অগ্নিপ্রদান পূর্বক আদি বাইবেল ও সাহিত্যাদি ধ্বংস করে বহু ইহুদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে আসেন। এর প্রায় ৫৫ বৎসর পরে পারস্য সম্রাট সাইরাস (কুরুস) ব্যবিলন আক্রমণ করে ব্যবিলন পদানত করেন এবং বহু ইহুদীকে মুক্তিদান করেন। এঁদের মধ্যে ধর্মগুরু এযর ব্যবিলন থেকে জেরুজালেমে এসে ইহুদীদের সামনে কতকগুলি পত্র পেশ করে বলেন যে এগুলি মোজেসের পঞ্চ পুস্তক। আর **নহিমিয়া** নামে আর একজন ধর্মগুরু বাইবেলের দ্বিতীয় ভাগ **নবিম** রচনা করে মোজেসের বাণী বলে বাইবেলে সন্নিবেশিত করেন।

আবার ১৬৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আন্তাকিয়ার রাজা এন্টিনিউস জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহুদী ধর্মশাস্ত্রগুলিকে ভস্মীভূত করেন এবং ইহুদী ধর্মশাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়ে জেরুজালেমে জয়ীশ দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে জয়ীশ দেবতার পূজা চলতে থাকে। কয়েক বৎসর পরে ইহুদী মাকাবীর হাতে এন্টিনিউসের পরাজয় ঘটলে ইনি এযরা ও

টীকা—১ সংগৃহীত—'সত্য সমাগত'। পৃষ্ঠা-১১১-১২।

নহিমিয়ার নামে কতকগুলি কাগজপত্র দাখিল করে সেগুলিকে উক্ত ধর্মগুরুদ্বয়ের সংকলিত বলে ঘোষণা করেন এবং **কাতবিম** নামে আর একখণ্ড এর সঙ্গে সংযোজন করেন।

এরপর ৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর রোমানরাজা টাইটেস সমগ্র জেরুজালেম ধ্বংস করে এদের ধর্মপুস্তকগুলি নিজ রাজ্যে নিয়ে যান এবং ইহুদীগণকে দেশান্তরিত করে সেখানে অন্য জাতীয় লোকদের বসিয়ে দেন। ফলে বিক্ষিপ্ত ইহুদীরা বহু কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, উপকথা যাজক কথিত বিবরণ, অনুমান ও কল্পনাকে আশ্রয় করে 'তওরাত' বা Old Testament গ্রন্থ সংকলন করেন। এর ফলে এদের মধ্যে দুটো দলের সৃষ্টি হয়। প্রথম দল সাদুকীরা বলতে থাকেন যে মোজেসের পঞ্চপুস্তক ছাড়া আর কিছু মানব না। আর দ্বিতীয় দল ফরিশিয়রা মোজেসের পঞ্চপুস্তক ছাড়া অন্যান্যগুলি যে Old Testament এর অংশ—তা দাবী করতে থাকেন। এই সকল কারণে দেখা যায় ইহুদী ধর্মপুস্তকগুলিতে যাজকেরা নিজেদের মনমত বহু কাহিনী, আদি ঐশীবাণীর বহু ওলট-পালট, সংযোজন, বিয়োজন করে পরে একটা ধর্মপুস্তকরূপে খাড়া করেছেন।

আর বর্তমানে এপোক্রাইফ নামে পরিচিত যে ৩৫ খানা পুস্তকের নাম করা হয়েছে প্রটেসট্যান্ট পণ্ডিতগণ সেগুলিকে জাল বলে বর্জন করেছেন। এই ৩৫ খানা পুস্তকের মধ্যে আবার বহু পুস্তকের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়েছে। Charles রচিত 'Apocryphy' Oxford Press, 1913.

আর ইঞ্জিল বা 'New Testament' সম্বন্ধে বলা যায় যে বর্তমানে এর মধ্যে ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু **'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়ার'** এপোক্রাইপেল লিটারেচার থেকে জানা যায় যে New Testament-এর মধ্যে ৩৬ খানা পুস্তক ও ১১৩ টি পত্র ছিল। তবে বর্তমানে এটা ৬ টা পুস্তকে ও ২১ খানা পত্রে এসে দাঁড়িয়েছে একটা কৌতুকপ্রদ নির্বাচনের ফল থেকে। এতে অনেক জাল পুস্তক ও পত্র প্রবেশ করেছে বলে যখন মতবিরোধ উপস্থিত হয় তখন ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিসিও কাউনসিলে একটা বেদী তৈরি করা হয় এবং সেই বেদীর উপর এলোমেলো ভাবে বই ও পত্রগুলি রেখে দেবার ফলে যে পুস্তক ও পত্রগুলি পড়ে গিয়েছিল সেইগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। আর এই সভায় ধর্ম সম্বন্ধে বিরোধ ভোটের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস ইহার প্রমাণ স্বরূপ সরকারি ছাপ মেরে দেন। এর ফলে ৩২৫ বৎসর পর্যন্ত ২৮ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র সম্বলিত বাইবেল প্রামাণ্য বলে নির্ধারিত হয়। এই হলো অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের ইতিহাস।

এরপর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অগস্টাস সাহেব হেগেলের ইতিহাস ও দর্শনানুসারে ইঞ্জিলে যীশুর জন্মকথা ও অন্যান্য বিষয়গুলিকে কল্পিত উপকথা বলে ঘোষণা করলে খ্রীষ্টান জগতে একটা আলোড়ন দেখা দেয়। ফলে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের ক্যান্টা রবোরী নগরে খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের এক সভায় স্থির করা হয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা অভিনব আবিষ্কারের ফলে প্রথম জেমসের সময় ৬১১ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেলের যে ইংরাজী সংস্করণ বের হয়েছিল তা সংশোধন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে এই সভায় ২৭ জন পণ্ডিতকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয় এবং এরা পূর্ণ দশ বৎসর পরিশ্রম করে ১৮৮২ সালে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। ইহাই এখন New Testament-এর Revised Version নামে পরিচিত।

ইতিমধ্যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রোনোবায়স' তাঁর ক্রিস্টস নামক পুস্তকে প্রচলিত New Testament-এর বিবরণগুলিকে ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য বলে ঘোষণা করেন এবং যীশুর উপদেশ Sermon on the Mount প্রভৃতি যে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণের উক্তির হুবহু নকল তাও ঘোষণা করেন।

এই সকল কারণে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গীর্জায় পাঠের জন্য লন্ডন থেকে 'The British and Foreign Bible Society' কর্তৃক যে বাইবেল প্রকাশিত হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে Old Testament-এর মোট ৩৯ খানা এবং New Testament-এর মোট ১৭ খানা বই স্থান পেয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, বাইবেল কিরূপভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।'

চোদ্দশ' বছর পূর্বে কোরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে দুষ্কর্মশীল লেখকগণ বাইবেলে কাটছাঁট করেছে। বাইবেলের বহু স্থান থেকে আদি কথা গোপন করা হয়েছে। এ কথা আমরা বুঝাতে গিয়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের শত্রু হয়েছি। তাদের কাছে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছি। আজ সারা বিশ্বের মনীষীরা দেখুন বাইবেলকে নিয়ে যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে কি খেলাই না খেলা হয়েছে। যারা অশালীন এ খেলা খেলেও আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি ও হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন তাঁরা আজ আপন জাতির কাছে কি জবাব দেবেন? পবিত্র বাইবেলকে আমরা বিশ্বাস করি, ভক্তি করি কিন্তু বাইবেলে সংযোজিত অদ্ভুত কথাগুলোর প্রতি আস্থা আনতে পারি না। যেমন—

"পরে লোট (হযরত লুত পয়গম্বর) ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ সংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদিগকে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই; আইস আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপনাদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট (লুত আঃ) টের পাইলেন না। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম, আইস আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাহার পিতার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লোট টের পাইলেন না। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই আপনাদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল। পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তাহার নাম 'মোয়াব' রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীদের আদি পিতা। আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তাহার নাম 'বিন-অম্মি' রাখিল। সে এখনকার অম্মোন সন্তানদের আদি পিতা।"

[বাইবেল। Genesis—আদি পুস্তক। সদোম ও ঘমোরার বিনাশ। লোটের শেষ গতি ১৯/৩০-৩৮]

একজন পয়গম্বরের চরিত্রকে এমনভাবে কলুষিত করা হয়েছে যার তুলনা বিরল। নিজ কন্যাদ্বয় পিতার সঙ্গে সহবাস করেছে—পিতাকে মদ্যপান করিয়ে অথচ পিতা লোট (লুত আঃ) কিছুই বুঝলেন না। কি আশ্চর্য। কি মিথ্যা সংযোজন।

এমন জঘন্য কথা কোরআনে নেই। বৃদ্ধ পিতা হযরত লুতকে মদ্যপান করাইয়া দুই কন্যা পর পর দুই রাত্রিতে তাহার সহিত ইচ্ছেমত সহবাস করে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে এবং ঐ সহবাসের ফলেই দুই কন্যা পুত্র লাভ করে বংশ রক্ষা করবে এমন ইতিহাস মুসলমানদের নেই। পরবর্তী সময়ে যখন কন্যাদ্বয় গর্ভবতী হলো, তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন না এবং বুঝলেন না কোন পুরুষ দ্বারা কন্যাদ্বয় গর্ভবতী হয়েছে। আল্লাহর নবীর জন্য এমন উদ্ভট ঘটনার সংযোজনা কলঙ্ক ও লজ্জাজনক। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু আমরা মুসলমান এমন ঘটনা চিন্তা করতেও লজ্জা পাই এবং শোনাকে পাপ মনে করি।

প্রাচীন হিন্দু পুরাণ হতে আমরা অবশ্য ব্যভিচারের বহু কল্পিত কাহিনী শুনে থাকি—যেমন দেবরাজ ইন্দ্র আপন গুরুপত্নী অহল্যাদেবীর সঙ্গে, ব্যাসদেব তার ভ্রাতৃবধু অম্বিকার সঙ্গে, বশিষ্ঠদেব সৌদানন্দনের স্ত্রী দময়ন্তির সঙ্গে, চন্দ্র দেবতা গুরু বৃহস্পতি মুনির স্ত্রী তারার সঙ্গে, সূর্যদেব কুমারী কুন্তির সঙ্গে, বৃহস্পতি দেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতয় দেবের স্ত্রীর সমতার সঙ্গে এবং শ্রীকৃষ্ণ আয়ান বধু শ্রীরাধা ও গোপীগণের সঙ্গে ব্যভিচার করে সন্তান উৎপাদন করেছেন, কিন্তু পিতা ও কন্যার মধ্যে ব্যভিচার হয়েছে বলে কোন গ্রন্থে উল্লেখ করে নি। এদিক থেকে দেখা যায় যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কল্পিত কাহিনী সংযোজনায় হিন্দুদের হার মানিয়েছে।

কোরআন ও হযরত মুসার ভবিষ্যৎবানী প্রমাণ করতে আমাকে অনেক কিছু লিখতে হল, অবশ্য পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন মনগড়া বা কাল্পনিক কোন কথা বলে আমি পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করি নি। পবিত্র বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমাণ করেছি। হিন্দুভাইদের কটাক্ষপাত করেও মনগড়া ও মিথ্যা উদ্ধৃতি দিই নি, এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করবেন। তাদেরই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনে এমন ঘটনা ঘটে নি। আপন কন্যা তো দূরের কথা, পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানোকেই মহাপাপ বলে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র মায়ের গর্ভে তিনি জন্মলাভ করেছেন পবিত্র পিতার ঔরসে। পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে কোন সন্তানও উৎপাদন করেন নি। এদিক থেকে তিনি নিষ্কলঙ্ক, পূর্বের নবী, পয়গম্বর, ঋষি, মহাঋষি, দেব-দেবতা সবাইকে হার মানিয়ে জগদ্‌গুরুর শ্রেষ্ঠতম আসন দখল করে আছেন এবং চিরদিনই থাকবেন। চলুন, এ মহাপুরুষ ও তাহার ধর্ম সম্বন্ধে দেখি কোরআন কি বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন বলে ঃ

"এবং যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসরণ করে ফলতঃ উহা কখনই তাহার নিকট হইতে পরিগৃহীত হইবে না এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে।"[১]

(৩ : ৮৫)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণপূত করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করিয়া দিলাম।"[২] (৫ : ৩)

"অতএব তোমরা তোমাদের আনন আল্লাহর স্বাভাবিক সুদৃঢ় ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যেহেতু তিনি উহারই উপর মানবমণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নাই। ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানবই অবগত নহে।[৩] (৩০ : ৩০)

"এবং যাহারা তোমার ধর্মের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত বিশ্বাস করিও না, তুমি বল—আল্লাহর পথই যাহা তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যকেও প্রদত্ত হইতে পারে।"[৪] (৩ : ৭৩)

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট ধর্ম এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর তাহারা পরস্পর বিদ্রোহ ব্যতীত বিরোধ করে না; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে; তবে নিশ্চয় আল্লাহর সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।"৫ (৩ : ১৯)

"অতঃপর যাহার অন্তঃকরণ ইসলামের জন্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে পরন্তু সে আল্লাহর জ্যোতির উপরও রহিয়াছে।"[৬] (৩৯ : ২২)

" হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ। তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহের অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"৭ (২ : ২০৮)

"হে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ, তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হইও না।"[৮] (৩ : ১০২)

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম—কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় অমুসলিম ভাইয়েরা কি বুঝেন? আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা স্ব স্ব ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফাকে (দঃ) শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে কার্পণ্য করেন তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ করা উচিত। পারবেন? যদি করতে পারেন তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন আপনাদের নাম উজ্জ্বল ফলকে লেখা থাকবে যেমন আছে কারুন, ফেরাউন, নমরূদ, সাদ্দাদ, আদ ও সমুদ জাতির নাম।

টীকা—১ কোরআন। সূরা আল ইমরান। আয়াত ৮৫।
টীকা—২ কোরআন। সূরা মায়েদা। আয়াত ৩-এর অংশ।
টীকা—৩, ৪, ৫- সূরা রুম-আয়াত ৩০। সূরা আল ইমরান। ৭৩ আয়াতের অংশ। সূরা আলে ইমরান। আয়াত ১৯।
টীকা—৬। সূরা জোমর। ৭। সূরা বাকারা-আয়াত ২০৮।
৮। আয়াত ২২। সূরা আল ইমরান। আয়াত—১০২।

নিজকে আল্লাহ বলে ঘোষণা করে ফেরাউন সদলবলে সাগর সলিলে সমাধি রচনা করেছে। খোদাকে মারতে গিয়ে নমরূদ সামান্য মশকের দংশনে প্রাণলীলা সংবরণ করেছে। সাদ্দাদ আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে বেহেশত রচনা করেছিল সেই বেহেশতের দ্বারপ্রান্তেই অন্তিম বাসনার অবসান ঘটিয়েছে। ধনের গর্বে কারুন আল্লাহকে অস্বীকার করে জীবন্ত অবস্থায় ভূতলে আশ্রয় নিয়েছে। আর আদ ও সমুদ জাতি ঝঞ্ঝা-প্লাবনে ও বিদ্যুৎ প্রবাহে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ সকল ঘটনা কিন্তু মিথ্যা নয়। কোরআন এবং বাইবেলের পরিষ্কার বাণী তা প্রমাণ করে।

"নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে আদর্শসমূহ অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব পৃথিবী বিচরণ কর, তৎপর লক্ষ্য কর যে অসত্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে? ইহা মানবমণ্ডলীর জন্য উজ্জ্বল বিবরণ এবং ধর্মভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।"[১] (৩ : ১৩৭-১৩৮)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে অনেক কিছুই লিখেছি। এবারে আমরা তাঁর সম্বন্ধে অবতীর্ণ প্রত্যক্ষ বাণীগুলি তুলে ধরে আবার বিশ্লেষণ করছি।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন যখন তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে রাসুল প্রেরণ করিয়াছেন—যে তাহাদের নিকট তাঁহার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাহাদিগকে নির্মল করে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করে; এবং নিশ্চয় ইহার পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"[২] (৩ : ১৬৪)

"অনন্তর কি দশা হইবে—যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী আনয়ন করিব এবং তোমাকেই সাক্ষী করিব? যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে—যেন ভূমণ্ডল তাহাদের সহিত সমতল হয়; এবং আল্লাহর নিকট তাহারা কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।"[৩] (৪ : ১৪১-৪২)

"ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইব্রাহিম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছি।"[১] (৪ : ৫৪)

"অনন্তর আল্লাহ যাহাকে পথ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তাহাদের হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে বিপথগামী করিতে ইচ্ছা করেন তাহার হৃদয় রুদ্ধ ও সংকীর্ণ করিয়া থাকেন—যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে।"[২] (৬ : ১২৫)

"ইহুদীগণের মধ্যে কেহ কেহ যথাস্থান হইতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে যে আমরা শ্রবণ করিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম; এবং তাহারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করিয়া ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে যে, 'শোন'—শোনা যায় না ও 'রায়েনা'; এবং যদি তাহারা বলিত যে, আমরা শুনিলাম ও স্বীকার করিলাম— এবং শোন ও 'উনজোরনা'— তাহা হইলে ইহা তাহাদের পক্ষে উত্তম ও সুসঙ্গত হইত; কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অবিশ্বাস হেতু তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; অতএব তাহারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করিবে না।"[৩]

(৪ : ৪৬)

টীকা—১, ২, ৩ কোরআন। সূরা আল ইমরান। আয়াত ১৩৭, ১৩৮, ১৬৪। সূরা নেসা, আয়াত ৪১, ৪২ ও ৫৪-এর শেষাংশ।
টীকা—১। সূরা আনআম, ১২৫ আয়াতের প্রথমাংশ।
টীকা—২। সূরা নেসা, আয়াত ৪৬।
টীকা—৩। কোরআন-সূরা বাকারা। আয়াত ৬২, ১১১-১১২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর পথ থেকে যারা বিচ্যুত তারাই আল্লাহর প্রেরিত রাসুলকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রচনা করে ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁর মহৎপ্রাণে আঘাত দেয়। এরূপ ঘটনা শুধু হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) জীবনেই ঘটে নি, প্রত্যেক নবীর জীবনেই ঘটেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী ও জৈন ধর্মাবলম্বী বলে কোন কথা নয়— এক শ্রেণীর অসৎ প্রকৃতির লোক প্রতিটি সমাজের মধ্যেই দেখা যায়। যারা সৎ— আল্লাহ, রাসুল ও পরকালে বিশ্বাসী, তাঁরা যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন মুক্তি পাবেই। আমরা গোঁড়ামি করে এ কথা বলতে চাই না যে শুধু মুসলমানই মুক্তি পাবে। মুসলমান হয়েও যারা অবিশ্বাসী, অসৎ, অত্যাচারী ও পরোপকারী নয়, তাদের মহাশাস্তি ভোগ করতে হবে। মহাবিচারক আল্লাহর চোখে সবাই সমান। কর্মের উপরই হবে কর্মীর পরিচয়। মানে নয়, ধনে নয়, সম্মানে নয়, যশ ও খ্যাতিতে নয়। কর্মের প্রতিদান হবে কর্মীর অবিমিশ্র সাধনার উপর। তাই কোরআন ঘোষণা করেছে :

"নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খ্রীষ্টানগণ ও সাবেইগণের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকার্য করিতেছে— বস্তুত তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।"[১] (২: ৬২)

"এবং তাহারা বলে যে— যে ব্যক্তি ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান— তদ্ব্যতীত কেহই স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট হইবে না। ইহাই তাহাদের বাসনা; তুমি বল— যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্বীয় আনন সমর্পণ করিয়াছে এবং যে সৎকর্মশীল হইয়াছে ফলতঃ তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান আছে এবং তাহাদের জন্য কোন আশঙ্কা নাই ও তাহারা সন্তপ্ত হইবে না।"[২] (২ : ১১১-১১২)

এ কথা সত্য এবং ধ্রুব সত্য যে, যে কোন জাতির যে কোন বিশ্বাসী মানুষই পরকালের বিচারে পুরস্কার পাবে। তবে সেই সম্প্রদায় নয় যারা হিংসা-দ্বেষ ও বিশ্বাসের অভাবে কোরআন এবং তার বহনকারী রাসুলকে 'রায়েনা' ও 'উনজোরনা' বলে (হে মূর্খ!) সম্বোধন করে আল্লাহর অভিসম্পাত কুড়িয়েছে। সে মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বের খ্যাতি, মানব জাতির গৌরব, আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যাকে আল্লাহ মহাবিপদের দিনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সম্মুখে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করে বিচার করবেন (সূরা নেসার ৪১ ও ৪২ আয়াতে যা উদ্ধৃত করা হয়েছে) তিনিই কি নেতাদের নেতা নন? এখনও কি আপনারা বিশ্বাসের অভাবে অবিশ্বাসী হয়ে নিজের মাথায় কুঠারাঘাত করবেন? দেখুন সমস্ত পূর্ববর্তী নবীদের সার কথা নিয়ে এ বিশ্বমানবের আবির্ভাব হয়েছিল কিনা।

"এবং আল্লাহ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে দান করিবার পর তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে— তাহার সত্যতা প্রতিপাদনকারী একজন রাসুল আগমন করিবে, তখন তোমরা অবশ্য তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহার সাহায্যকারী হইবে; তিনি আরও বলিয়াছিলেন— তোমরা কি ইহাতে স্বীকৃত হইলে এবং আমার শর্ত গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিয়াছিল আমরা স্বীকার

টীকা—১, ২। কোরআন-সূরা বাকারা। আয়াত ৬২, ১১১-১১২

করিলাম; তিনি বলিলেন তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।"[৩] (৩ : ৮১)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রতিশ্রুত নবী এ কথা আমি পূর্বেও লিখেছি। কোরআনের উপর্যুক্ত বাণী আমার এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে। পূর্ব পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাণী হতে বুঝা যায় যে, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ-পাক মানবাত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। এ সব আত্মা সমূহের মধ্যেই ছিল নবীদের পবিত্র আত্মা। বিশ্বমানবের কল্যানের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল এ সব নবীদের যারা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন একটা দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করতে। এ সব নবীর সম্মুখেই আল্লাহ-পাক অঙ্গীকার করেছিলেন এক বিশিষ্ট নবী পাঠানোর যিনি পূর্ববর্তী নবীদের সারমর্ম নিয়েই হাজির হবেন। এ নবীর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতেই তাঁদের উপদেশ দেওয়া হলো। তাঁরাও স্বীকার করলেন এবং আল্লাহর সম্মুখে অঙ্গীকার করলেন তাঁকে সাহায্য করবেন বলে—

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যেসব নবী সাহায্য করবেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দান করলেন তাঁরা কিন্তু এ নবীর অনেক পূর্বেই আগমন করেছিলেন এবং হযরতের আগমনের পূর্বেই এ ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁরা কি তবে তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি? অমুসলিমগণ হয়ত মনে করতে পারেন যে— কোরআনের এ বাণীর মর্ম তাঁরা পালন করতে পারেন নি এবং তাঁদের পক্ষে এটা রক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। এবারে চলুন আমরা কয়েকজন নবীর শেষ বাণীগুলি দেখি এবং বিচার করি যে সত্যি তাঁরা তাঁদের এ প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কিনা।

"এবং ইব্রাহিম ও ইয়াকুব স্বীয় সন্তানগণকে উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন— হে আমার বংশধরগণ; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিও না।"[১] (২ : ১৩২)

উক্ত আয়াত হতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে— মুসলিম জাতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ জন্যই উপদেশ বাণী দিয়ে গেছেন পরবর্তী বংশধরদের জন্য যেন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন বা অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম হতে বিচ্যুত না হয়। [আল ইমরানেও এ কথা বলা হয়েছে। ১১৯ ও ১২০ আয়াত]

'ইসলাম' অর্থ শান্তি বা আত্মসমর্পণ। যে ধর্মের মহাপুরুষ নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে এক মহাশক্তির কাছে সমর্পণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যে সব অনুগামীরা তাঁর এ সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করেছেন তাঁরাই মুসলমান— প্রকৃত বিশ্বাসী। এ ধর্মের মূলমন্ত্র— 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই'। এ বাণী হাতে নিয়েই হযরত আদম (আঃ) হতে আরম্ভ করে প্রতিটি নবীই এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর হাতেই পূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম প্রচার করতেই নবীগণ এসেছিলেন। তৌহিদের এমন মহান শিক্ষা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মই দিতে পারে নি এবং পারবে না। পৌত্তলিকতাবাদ, অংশীবাদ, ত্রিত্ববাদ, নাস্তিকতাবাদ ও কুসংস্কারবাদে

৩। কোরআন—সূরা আল ইমরান। ৩য় পারা। আয়াত ৮১।
টীকা—১। কোরআন-সূরা বাকারা। আয়াত ১৩২ ১ম পারা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পৃথিবীর অনেক জাতিই জড়িত। তাই এ সব জাতি আল্লাহর অপছন্দনীয় এবং ইসলামই একমাত্র মনোনীত।

ইসলামী দীক্ষায় দীক্ষিত হবার উপদেশ দিয়ে পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়া আমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ইহুদী বা খ্রীষ্টান ছিলেন না। কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দেয়।

"এবং তাহারা বলে যে তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হও— তবেই সুপথ প্রাপ্ত হইবে। তুমি বল—বরং আমরা ইব্রাহিমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি এবং সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[১] (২ : ১৩৫)

হযরত মুসা (আঃ) কি বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন?

"সদা প্রভু আমাকে কহিলেন; আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তিনি উহাদিগকে তাহাই বলিবেন। আর তিনি আমার নামে আমার যে সকল কথা বলিবেন, তাহাতে যে কহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।"[২]

কোরআনের বাণী ধরে আমরা হযরত মুসার (আঃ) উক্তিটির সারবত্তা প্রমাণ করব। খ্রীষ্টানগণ অবশ্য যুক্তি এবং প্রমাণ ছাড়াই প্রমাণ করতে চায় যে মুসার এ বাণী লক্ষ্য করে হযরত ঈষা (আঃ) অর্থাৎ যীশুকে। কোরআন বলে ঃ

"এবং আমি মুসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহাকে ইসরাইল বংশের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমা ব্যতীত প্রতিভূ গ্রহণ করিও না।"[৩]

হযরত মুসার আবির্ভাব হয়েছিল ইসরাইল বংশের মুক্তি সাধনে। এ কথার আর কোন প্রতিবাদ চলে না। কারণ বাইবেল, কোরআন ও ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। ইসরাইল বংশ (বর্তমান ইহুদী জাতি) হযরত ইব্রাহিমের পুত্র ইসরাইল হতে সমুদ্গত। এই ইসরাইলের ভ্রাতা ছিলেন ইসমাইল। এই ইসমাইল বংশেই জন্মলাভ করেছিলেন পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

"উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব ....।" এ বাণীতে কি খ্রীষ্টান ভাইদের পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না যে ইসমাইল বংশের সেই ভাববাদী মহাপুরুষ কে? ইনিই কি হযরত ঈসা (যীশু) না হযরত মুহাম্মদ (দঃ)? হযরত মুসা (আঃ) সৃদশ কি হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন? হযরত মুসা ছিলেন নির্ভীক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে করেছেন সংগ্রাম। চপেটাঘাতে এক মিসরীয়কে হত্যা করে যেমন জনৈক ইসরাইলের জন্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন ফেরাউনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে যেমন সাগর সলিলে তাঁকে নির্বাসিত করেছিলেন, হযরত ঈসা (আঃ) তেমন করেন নি।

টীকা—১। কোরআন-সূরা বাকারা। আয়াত ১৩৫।
টীকা—২। বাইবেল যোহন—দ্বিতীয় বিবরণ। ১৮ নং ১৮ ও ১৯।
টীকা—৩। কোরআন—সূরা বনি ইসরাইল। আয়াত ২।

তিনি ছিলেন মায়াপ্রবণ ও অত্যধিক শান্ত। নম্রতা, ভদ্রতা ও মমতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বতে আরোহণ করে ঐশীবাণী শ্রবণ করেছিলেন এক রহস্যময় যবনিকার অন্তরাল হতে; আর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন 'পবিত্র আত্মা' যোগে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করেছিলেন। কোরআন এ সাক্ষী বহন করে। হযরত মুসা (আঃ) পিতার ঔরসে তাঁর মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করেন কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পিতার ঔরস ছাড়াই মাতা মরিয়মের গর্ভে জন্মলাভ করেন। (বাইবেল ও কোরআন এর সাক্ষী)। তাই তাঁদের জীবনচরিতে দেখা যায় বহুল ব্যবধান। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গভীরভাবে আলোচনা করলে নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হয় যে হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মুসার (আঃ) সাদৃশ্য ছিলেন না। এ ছাড়া হযরত মুসা এবং ঈসা একই ইসরাইল বংশ হতে সমুদ্গত— সুতরাং উহাদের 'ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে' কথাটিরও পরিষ্কার অর্থ বুঝায় ইসমাইল বংশ। এই ইসমাইল বংশের গৌরবজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মুহাম্মদকেই (দঃ) যে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে এর মধ্যে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা তাঁর সঙ্গে হযরত মুসার (আঃ) কার্যাবলী ও নবুয়ত প্রাপ্তির মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত মুহম্মদকে (আঃ) সত্যধর্ম প্রচার করতে নিজের মাতৃভূমি আরব হতে মদিনায় যেতে হয়েছিল— আর হযরত মুসাকেও মাতৃভূমি মিশর ত্যাগ করে পূর্বাঞ্চলে মদায়েন শহরে যেতে হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করবার উদ্দেশ্যে যেমন শত্রুগণ তাঁর পিছনে দিবারাত্র চেষ্টা করত, হযরত মুসাকে খুন করবার উদ্দেশ্যেও ফেরাউনের চর তাঁর পিছনে তেমনি দিবারাত্রি লেগে থাকত। হেরা পর্বতের গুহায় যেমন হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ঐশী জ্যোতিঃ লাভ করলেন— তুর পর্বতের চূড়ায় তেমনি হযরত মুসা (আঃ) 'আল্লাহ্র নূর' দেখতে পেলেন। হযরত মুসা যেমন আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করলেন,

"হে মুসা! নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্।"[১] (২৮:৩০)

হযরত মুহাম্মদও (দঃ) তেমনি আল্লাহ্র দূত মারফত শুনতে পেলেন,

"তুমি পাঠ কর তোমার সেই পবিত্র আল্লাহ্র নাম যিনি তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন।"[২] (৯৬:১)

শৈশবে হযরত মুসা (আঃ) যেমন ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হলেন তেমনি হযরত মুহাম্মদও (দঃ) প্রতিপালিত হলেন হালিমার গৃহে। হযরত মুসা (আঃ) যেমন শোয়েব নবীর কন্যা সফুরাকে বিবাহ করে সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তেমনি হযরত মুহাম্মদও (দঃ) খাদিজাকে বিবাহ করে সাংসারিক ও বৈষয়িক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁদের বিবাহের ঘটনাও একরূপ। হযরতের যেমন বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন 'আবুবকর', হযরত মুসারও তেমনি বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন 'হারুণ'। এরূপ বিভিন্ন ঘটনার সাদৃশ্য এ দু'জন নবীর মধ্যেই মাত্র দেখা যায়।

যদি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপরে না থাকত তা'হলে হযরত মুসা বা হযরত ঈসার পরে আর কোন নবীর আবির্ভার হতো না। তাঁর সর্বশেষ আবির্ভাব এটাই প্রমাণ করে যে পূর্বে প্রেরিত নবীগণ তাঁদের জীবনের আকাঙ্খা পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁরা

টীকা—১ কোরআন—সূরা কাছাছ। আয়াত ৩০
,, —২ সূরা আলোক। ১ম আয়াত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বের মানবমণ্ডলী কেন, নিজেদের স্বজাতিকেও উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁদের মৃত্যুর পর ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় যে বহুল বিভক্ত হ'য়ে পড়বে এবং নবীদের আদর্শ হতে সম্পূর্ণ স্খলিত হবে এ কথা এ মহাপুরুষদ্বয় জানতেন বলেই পরিষ্কার ভাষায় ইঙ্গিত দিয়েছেন। মোশী (মুসা) বলেছেন,

"আমার মরণের পরে তোমরা একেবারে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"[৩]

আর যীশু (ঈসা) বলেছেন ঃ

"আমি আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলিব না কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছেন।"[৪]

ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবার দেখুন এবং বিচার করুন কোন মহাপুরুষ মোশী-যীশুর তিরোধানের পরে জগতের অধিপতি হয়ে এসেছেন?

বিশ্বাসী হতে হলে, আল্লাহর উপর প্রগাঢ় ভক্তি আনতে হলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নবীদের আদর্শ ও চরিত্রকে যেমন অনুসরণ করতে হবে, তেমনি করতে হবে তাঁদের উপদেশ বাণীগুলোরও সদ্ব্যবহার। ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাদের নবীদের স্বীকার করে কিন্তু তাঁদের চরিত্রের বিপরীত চরিত্র অনুসরণ করে এবং উপদেশ বাণীর উল্টা অর্থ করে— অন্য জাতির সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। পরন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মূলমন্ত্রের প্রতি সবাই এক। আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি সবাই সমানভাবে আকৃষ্ট। ওহাবী, হানাফী, লা মজহাবী প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হলেও আল্লাহর কোরআন বিকৃত করে নি এবং উপদেশ বাণীগুলোর কাটছাঁট করে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রকৃত মর্যাদার হানি করেন নি। যারা করেছে এবং করে থাকে তারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত হলেও প্রকৃতপক্ষে অমুসলিমের চাইতেও নিকৃষ্ট। মুসলমানের সংজ্ঞায় তারা পড়ে না। তাদের উদাহরণ দিয়ে রাসুলের শ্রেষ্ঠত্বকে খাট করা যায় না।

বিশ্বের পথ প্রদর্শক— মানব-দানবের মশালবাহক, সত্যের ধ্রুব জ্যোতি, কল্যাণের মূর্তিমান মহাপুরুষ, আল্লাহর চোখেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে আমাকে ফাঁকিবাজীর কোন আশ্রয় নিতে হবে না। ধোঁকাবাজীর কোন কথা বলে বিভ্রান্ত করতে হবে না! আল্লাহর কোরআন সম্মুখে রেখেই আমি চলেছি এ পথে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিসরে এ বিশ্লেষণ দিতে। আমার যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে নয়, আমার চিন্তাধারায় বিপাকে পড়তে নয়— আপনারা যাঁরা বিশ্বাসী সম্প্রদায় তাঁরা দেখুন স্বয়ং আল্লাহ এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কি বলেন।

"অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ, তাহারা কখনই বিশ্বাসস্থাপনকারী হইতে পারিবে না— যে পর্যন্ত তোমাকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে। তৎপর তুমি যে বিচার করিবে তাহা তাহাদের অন্তরে বিঘ্নকর না হয় এবং উহা শান্তভাবে পরিগ্রহ না করে।"[১] (৪ : ৬৫)

"এবং আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রাসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"[২] (৪ : ৭৯)

,, —৩। বাইবেল, তওরাত দ্বিতীয় বিবরণ।

,, —৪ বাইবেল যোহন পরিচ্ছেদ।

টীকা—১,২ কোরআন-সূরা নেসা। আয়াত ৬৫ ও ৭৯ আয়াতের শেষাংশ

"ইহা কি মানবমণ্ডলীর জন্য বিস্ময়কর যে আমি তাহাদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে তুমি মানবমণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শন কর।"[৩] (১০ : ২)

"আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানবই অবগত নহে।"[১] (৩৪ : ২৮)

কোরআনের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা সত্ত্বেও যদি বিজাতীয়রা মনে করেন যে মোশীর জন্য ইসরাইল জাতি, যীশুর জন্য খ্রীষ্টান জাতি, বুদ্ধের জন্য বৌদ্ধ জাতি, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্য মুসলিম জাতি তাহলে তারা শুধু ভুলই করবেন না, নিজ নিজ সম্প্রদায় ও পরিবারের জন্য অন্যায়ের পথ প্রদর্শন করবেন।

'তোমাকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছি'— এরূপ ঘোষণা বাইবেলের কোন অংশেই নেই। অর্থাৎ তৌরাত ও ইঞ্জিলের (নতুন ও পুরাতন বাইবেল) বাণীবাহক হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরআনে যা বলা হয়েছে তা আমি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছি যে, তারা শুধু তাদের স্ব স্ব জাতির মুক্তির জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন— এবং 'আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট' সূরা নেসার ৭৯ আয়াতের এই অংশটুকু উপর্যুক্ত ঘোষণার সাথে জড়িত হওয়ায় রাসুলুল্লার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহাতীতরূপে। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ আল্লাহ নিজে সাক্ষী হয়ে যেখানে দিচ্ছেন সেখানে অন্য কোন সাক্ষীর কি প্রয়োজন আছে? তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী হয়ে কেউ কি দাঁড়াতে পারবে? এতটুকু আস্পর্ধা কোন সম্প্রদায়ের, কোন মানবসন্তানের কি হবে?

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, চারিত্রিক ও মানসিক ব্যাধিতে যারা বিকারগ্রস্ত তাদের দ্বন্দ্বের অবসান করতে ও সুপথ দেখাতে সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ হাতে নিয়েই এসেছিলেন এ মহানবী। এ মহাবিচারক ন্যায়ের নিক্তিতে ন্যায়বাদী হয়ে বিচার করলেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর।

এ বিচারের পাল্লায় ধরা পড়ল বিচারহীন সমাজের বিষাদময় কলঙ্ক। যারা হযরত ইব্রাহিমকে (আঃ) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল— যারা ইউসুফকে অন্ধকার কূপে ফেলে দিয়েছিল— যারা মুসাকে যাদুকর বলে বিতাড়িত করেছিল, যার ঈসাকে (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল, তাদের যেমন চিহ্নিত করলেন তেমনি চিহ্নিত করলেন বিশ্বাসী, ন্যায়বাদী, ধর্মপরায়ণ ও পূত চরিত্রের অধিকারী পুণ্যবানদের।

কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এ মহাবিচারকের বিচারের শরণাপন্ন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মূল বিরোধের অবসান হবে না এবং প্রকৃত বিশ্বাসীরূপে গণ্য হবে না। এখান থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ পক্ষপাতহীন— ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সুদৃঢ়, অমিয় শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহাপুরুষ জীবনে কোনদিন ভুল করেন নি, কোন অবস্থাতেই ভুল সিদ্ধান্ত দেন নি এবং সমগ্র জীবনে কোনদিন অকৃতকার্য হন নি। কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

টীকা—৩ সূরা ইউনুস। আয়াত ২।

টীকা—১ সূরা সা'বা। আয়াত ২৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তোমাদের বন্ধু মুহাম্মদ (দঃ) কখনও ভুল করেন না বা কখনও অকৃতকার্য হন না।"[১] (৫৩ : ২)

শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ নিদর্শন আর কেউ দিতে পারবে বলে আমি জানি না। মহাবিচারকের আসনে বসে এমন সিদ্ধান্ত আর কেউ দিতে পারবে বলেও আমরা ধারণা করতে পারি না। চির সত্যের বাণী নিয়েই এ মহাজ্যোতির আবির্ভাব হয়েছিল। যে কোন শ্রেণীর যে কোন মানুষ তাঁর পথ অনুসরণ করলে মহাকল্যাণের অধিকারী হবে। এর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই: কেননা আল্লাহ পাক নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন—

"হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে সত্যসহ রাসুল আগমন করিয়াছেন; অতএব বিশ্বাস কর তোমাদের কল্যাণ হইবে।"[২] (৪ : ১৭০)

"হে লোক সকল, তোমাদের প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিয়াছি।'[৩]

"হে গ্রন্থানুগামীগণ তোমাদের নিকট আমার রাসুলগণ আসিয়াছিল— তাহারা তোমাদিগকে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল যাহা তোমরা গ্রন্থ হইতে গোপন করিতেছ এবং তিনি তোমাদিগকে বহু বিষয়ে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর সন্নিধান হইতে তোমাদের নিকট জ্যোতিঃ ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ আসিয়াছে এতদ্বারা আল্লাহ যে তাঁহার প্রসন্নতার অনুসরণ করে তাহাকে শান্তির পথে পরিচালনা করেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় আদেশে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে পথ প্রদর্শন করেন। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা বলে যে মরিয়ম-নন্দন মসীহ (ঈসা) আল্লাহ। তুমি বল— যদি তিনি মরিয়ম নন্দন মসীহ ও তাঁহার মাতা এবং ভূমণ্ডলে যাহা আছে তৎসমূদয় ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহর উপরে কি কাহারও কিছুমাত্র অধিকার আছে? এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা আছে তাহাতে তাঁহারই আধিপত্য; তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; এবং আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান। এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলে যে আমরাই আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। তুমি বল— তবে কেন তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন? বরং তোমরাও তাঁহার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মানব। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহাতে আল্লাহরই আধিপত্য এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন। হে গ্রন্থানুগামীগণ! রাসুলগণের আবির্ভাব ধারার অবসানে আমার রাসুল তোমাদের নিকট আগমনপূর্বক বর্ণনা করিতেছে—যেন তোমরা না বল যে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক আগমন করেন নাই কিন্তু নিশ্চয় তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক আসিয়াছে এবং আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি শক্তিমান।"[১] (৫ : ১৫-১৯)

টীকা—১। কোরআন সূরা নজম, আয়াত ২। সূরা নেসা ১৭০ আয়াত
টীকা—২। কোরআন সূরা নজম, আয়াত ২। সূরা নেসা ১৭৪ আয়াত।
টীকা—৩। কোরআন সূরা নেসা, আয়াত ১৭৪।
টীকা—১, কোরআন—সূরা মায়েদা। ১৫-১৯ আয়াত।

কোরআনের উপর্যুক্ত পরিষ্কার বাণীর মাধ্যমে এ কথা সবার কাছেই ধরা পড়ে যে সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)— যিনি শুধু মুসলমানের পথ প্রদর্শকই নন, সমগ্র জাতির কল্যাণকারী কীর্তিমান মহাপুরুষ। যে জাতি তাঁর পথ ধরবে, যে জাতি তাঁর অমিয়বাণী মধু মনে করে পান করবে সে জাতিই সবল ও সুন্দর হবে। বাদলের ধারা যেমন বিশুষ্ক ভূমিকে সরস করে তোলে, বসন্তের মৃদু সমীরণ যেমন নির্বাক কোকিলের কণ্ঠে সুরের ঝঙ্কার তুলে দেয়, শরতের নীলাকাশ যেমন তাবুকের প্রাণে দোলা দিয়ে সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উন্মোচন করবার উপকরণ যোগায়, পরশমণির স্পর্শে এসে লোহা-তামা-সীসা যেমন স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়— তেমনি এ মহামানবের মধুর বাণীতে দুনিয়ার সমস্ত ঘুমন্ত জাতিও নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পায়। এমন সুযোগের সন্ধান পেয়েও, এমন মহাজ্যোতির আলোকে পথ আলোকিত দেখেও যারা অলস, অন্ধ ও বধির হয়ে হিংসার বশে মুসলমানকে ঘৃণা করে, ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শান্তির ছায়ায় নীড় রচনা করতে কার্পণ্য বোধ করে তারাই অবিশ্বাসী ও অশান্তি উৎপাদনকারী। আল্লাহ সত্যি বলেছেন—

"বস্তুত তুমি দেখিবে যে, যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, উহারা তাহাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বলে— আমাদের আশঙ্কা হয় যে আমরা বা কালের আবর্তে পতিত হই।"[২] (৫ : ৫২)

এই অবিশ্বাসী ও কপটবিশ্বাসীদের মধ্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি অন্যতম। তারা একে অপরের শত্রু। কারো ধর্মকে কেউ বিশ্বাস করে না। কারো নবীকেই কেউ নবী বলে প্রাধান্য দিতে চায় না। অথচ তারা মিলিতভাবেই ইসলামের শত্রুতা করে এবং ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানতে অস্বীকার করে। এ দু' জাতি তাঁর উপর যে অকথ্য বিদ্রূপ ও অন্যায় আচরণ করেছে ইতিহাস কোনদিনই ভুলে যাবে না। এ কপটবিশ্বাসী সম্প্রদায় কোনদিনই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না— তাদের কাছে বন্ধুসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করতে পারে না। আল্লাহ রুষ্ট হয়ে তাই ঘোষণা করেছেন :

"হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ— তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে তবে নিশ্চয় সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"[১] (৫ : ৫১)

খ্রীষ্টানগণ একটা মারাত্মক ভুল ধারণা সম্মুখে রেখে হযরত ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর শরীক করেছে। যেহেতু পবিত্র আত্মা যোগে হযরত ঈসার জন্ম, পিতার ঔরস ছাড়া মাতা মরিয়মের গর্ভে তিনি স্থান পেয়েছেন তাই তাদের ধারণা তিনি 'খোদার পুত্র'। ইসলাম খ্রীষ্টানদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে মোটেই স্বীকার করে না। তারা 'লা শরীক আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর কোন শরীক নেই এই মূলমন্ত্রেই বিশ্বাসী। মুসলমানদের এ সত্য বিশ্বাস অসত্যের মাথায় যেমন কুঠারাঘাত করেছে তেমনি চির দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটিয়েছে। কোরআনের বাণী 'লাম ইয়ালেদ ওয়ালাম ইউলাদ' তারা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করে আল্লাহর একত্ববাদকে প্রচার করেছে এবং করছে। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র এ কথা হযরত নিজেও অস্বীকার করেছেন, আল্লাহ-পাকও সেটা তেমনি ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছেন :

টীকা—২, কোরআন—সূরা মায়েদা। ৫২ আয়াতের প্রথম অংশ।
টীকা—১। কোরআন সূরা মায়েদা, ৫১ আয়াত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং যখন আল্লাহ বলিলেন,—হে মরিয়ম নন্দন ঈসা—তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতামে দুই উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে—তুমি পরম পবিত্র, আমার কি হইয়াছিল যে যাহাতে আমার অধিকার নাই আমি তাহাই বলিব?[২] (৫:১১৬)

"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের আদি স্রষ্টা, কিরূপে তাহার সন্তান হইতে পারে— যখন তাহার কোন সহযোগিনী নাই এবং তিনি সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ।"[৩] (৬:১০১)

আল্লাহর মহাবাণী কোরআনে কোথাও উল্লেখ নাই যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। খ্রীষ্টানদের এ ভ্রান্ত ধারণা মুছে দিতে কোরআনে বহুস্থানে নির্দেশ দেওয়া আছে যে আল্লাহর কোন শরীক নেই অর্থাৎ উত্তরাধিকারী বলে কেউ নেই। যদি আল্লাহর পুত্রসন্তান থাকত তবে সে পুত্রসন্তানের গৌরব হযরত মুহাম্মদই লাভ করতেন। কোরআনে এ কথাও পরিষ্কারভাবে বলা আছে :

"তুমি বল, যদি সর্ব প্রদাতার পুত্রসন্তান হইত তবে আমি সর্বাগ্রে উপাসনাকারী হইতাম।"[১] (৪৩ : ৮১)

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়! এবার কোন মিথ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন? আল্লাহর সন্তান নেই প্রমাণিত হলো তাঁর বাণী থেকেই। এ কথাও প্রমাণিত হলো যে যদি তাঁর সন্তান থাকত তবে সে সন্তান হযরত ঈসা (আঃ) হতেন না— হতেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)— বিশ্বের নবী। এবার আপনাদের মিথ্যা অহঙ্কারের কবর দিন এবং হযরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা ধরুন। তবেই হবে মুক্তি, তবেই পাবেন প্রকৃত পথ।

উপরে উদ্ধৃত সূরা মায়েদা হতে পরিষ্কারভাবে এ কথা বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) [যীশু] কোনদিনই নিজকে খোদার পুত্র বলে দাবী করেন নি এবং তাঁর মাতা মরিয়মকে পূজা করতে নির্দেশ দেন নি। যীশুর বাণীর অপপ্রচারকারী ধর্মযাজকদের দল এমন মিথ্যা ঘোষণা করে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য কবর রচনা করেছেন। খোদার পুত্র যীশু [ঈসা] এ কথায় সাময়িকভাবে তাঁরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেও এবং অন্ধভাবে পরকালের মুক্তির পথ কামনা করলেও— সে কামনা মরুভূমির মরীচিকার মতই মিথ্যা। যে সব পাদ্রী এবং যাজককুল বিশ্বের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে যুগ যুগান্তরের জন্য ভুল ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেল— আল্লাহর একত্বের প্রশ্নে শিরায় উপশিরায় সন্দেহের বীজ রোপণ করল, আল্লাহর কাছে তাদের জবাব কোথায়?

অনেকেই হয়ত বলতে পারেন যে, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায় দুনিয়া হতে মুছে যায় নি বা ধুলিসাৎও হয় নি। দিন দিন ব্যাপক আকারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং আমার ব্যবহৃত বিশেষণগুলি অর্থহীন। অর্থহীন নয়— মানুষ যখন নৈতিক চরিত্রকে হারিয়ে ফেলে, ধর্মকে খেলা ও তামসার জিনিস বলে মনে করে, নারীকে চোদ্দশ' বছর পূর্বের অসভ্য আরব জাতির মত যদিচ্ছা ব্যবহার করে, লোভ লালসা ও ধনের মোহে মত্ত হয়ে যায়, আকাশে-

---

২। কোরআন—সূরা মা'য়েদা, ১১৬ আয়াতের প্রথমাংশ।
৩। কোরআন—সূরা আনআম, আয়াত ১০১।
টীকা—১। ঐ ,, জোখরোফ, আয়াত ৮১।

বাতাসে সভ্যতার নামে বিষাগ্নারের ব্যূহ রচনা করে, তারা কি নবীদের অনুসরণকারী? না,— তারা অনুসরণকারী নয়, অবাধ্যচারী। আল্লাহ এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"তুমি বল— হে গ্রন্থানুগামীগণ, যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে স্থির প্রতিষ্ঠিত না হও— তোমরা কিছুরই উপর নহে। এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হইবে, অতএব তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিষণ্ন হইও না।"[১] (৫ : ৬৮)

"তুমি বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে আমিই সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করিব এবং কদাচ অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব না।"[২] (৬ : ১৪)

"তুমি বল— নিশ্চয়ই আমি স্বীয় প্রতিপালকের সমুজ্জ্বল প্রমাণের উপর আছি এবং তোমরা উহাতে অসত্যরোপ করিয়া থাক। তোমরা যাহাতে তৎপর— তাহা আমার নিকট নাই, আল্লাহ ব্যতীত সুবিচার নাই— তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী।"[৩] (৬ : ৫৭)

উপর্যুক্ত মহাবাণী এ কথা প্রমাণ করছে যে নিখুঁত সত্যের সাধক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই রচনা করেছেন 'ইসলাম'। নিজের আত্মাকে কলুষমুক্ত করে সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে যে সমুজ্জ্বল প্রমাণ দিয়ে এর সারবত্তা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। অসত্যারোপকারীগণ অবিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু তাদের স্ব স্ব ধর্মের উপর চ্যালেঞ্জ দিয়ে মুক্তির পথ প্রশস্ত করবেন এরূপ সাহস তাদের নিশ্চয়ই হবে না। আল্লাহর নির্দেশক্রমে এরূপ চ্যালেঞ্জ শুধু হযরত মুহাম্মদই দিয়েছেন— কোরআন এর সাক্ষী।

"তুমি বল— হে সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের রীত্যানুসারে কার্য কর; নিশ্চয় আমিও করিতেছি; ফলতঃ তোমরা অচিরেই অবগত হইবে যে, পারলৌকিক নিকেতন কাহার জন্য? নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা সুফল পাইবে না।"[৪] (৬ : ১৩৫)

উক্ত সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে :

"তাহাঁর কোনই অংশী নাই এবং ইহাই আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান।"[৫] (৬ : ১৬৩)

মুসলিম জাতিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি এবং এ জাতিই যে পৃথিবীর সমগ্র জাতির প্রতিনিধি এ কথা কোরআনই ঘোষণা করেছে :

"তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছেন।"[১]

যে জাতি সর্বজাতির উপর প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে সে জাতির প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নন? অন্য কোন জাতির নেতাকে কি পৃথিবীর প্রতিনিধি বলা হয়েছে? কোন জাতির কোন ধর্মগ্রন্থই এ সাক্ষ্য বহন করে না। আর করবেই বা কিরূপে? পূর্ববর্তী

টীকা—১। কোরআন-সূরা মায়েদা। আয়াত ৬৮। সূরা আনআম। ১৪ আয়াতের শেষাংশ। সূরা আনআম। আয়াত ৫৭। সূরা আনআম। আয়াত ১৩৫। আয়াত ১৬৩।
টীকা—২, ৩, ৪ ও ৫। কোরআন সূরা মায়েদা। আয়াত ৬৮। সূরা আনআম। ১৪ আয়াতের শেষাংশ। সূরা আনআম। আয়াত ৫৭। সূরা আনআম। আয়াত ১৩৫। আয়াত ৬৩।
টীকা—১। কোরআন—সূরা আনআম। আয়াত ১৫৬ প্রথম অংশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিটি নবীই ত একবাক্যে স্বীকার করেছেন এই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মহাগমন, মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। নবীগণই যদি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকেন তবে তাঁদের অনুসারীদের স্বীকার না করা কি গোঁড়ামি নয়?

হযরত মুসা (আঃ) একাধারে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি নীরব সাধনায় আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ করেন এবং আল্লাহর 'নূর' (জ্যোতিঃ) দর্শন করেন। প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দর্শন তিনি লাভ করেন নি, অথচ এ দর্শনের ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর এক অবিরাম সাধনার সমাপ্তিপর্যায়ে। কিন্তু সে প্রার্থনা তাঁর কবুল হয় নি। হয় নি কেন সে কথা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বুঝতে অক্ষম। তবে আল্লাহর কোরআন থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মুসাকে (আঃ) ততটুকু শক্তি প্রদান করা হয় নি যে শক্তিবলে তিনি আল্লাহর দর্শন লাভ করে নিজকে সংযত ও স্থির রাখতে পারেন। এ কথা প্রমাণিতও হয়েছে। তুর পর্বতের উপর যখন আল্লাহ তাঁর মহান জ্যোতির অতি সামান্যতম অংশ নিপতিত করেন তখন সেই তীব্র জ্যোতিঃ দর্শনেই মুসা (আঃ) তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। এছাড়া তুর পর্বতের কঠিন প্রস্তর সমূহও ভস্মীভূত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এটা নিছক কোন ঘটনা নয়। ইহুদী সম্প্রদায় এ ঘটনাকে যেমন অলৌকিক বলে মনে করে, আমরাও ঠিক তাই মনে করি। হযরত মুসাকে তারা যেমন আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে আমরাও তাঁকে নবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং ভক্তি বিজড়িত চিত্তেই তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে আনন্দ অনুভব করি। **লা নুফাররেকো বাইনা আহাদেম্মের রছুলিহি**— কোরআনের এ বাণীর উপর ভক্তি রেখে আমরা কোন নবীদের মধ্যেই পার্থক্য সৃষ্টি করি না। হাতের প্রতিটি আঙ্গুলিই অপরিহার্য। কোন অঙ্গুলির দান কম নয়। প্রতিটি অঙ্গুলির সঙ্গেই প্রতিটির সুসমন্বয় রয়েছে এবং এই সুসমন্বয় ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করতেই হয়ত আল্লাহ একটিকে আর একটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তবুও 'মস্তিষ্ককে' দেহের রাজা বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে এ পার্থক্য। তামা, সীসা, লোহা, দস্তা, রাঙ্গ, এ্যলুমিনিয়াম কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়? কোন্‌টি মূল্যহীন? প্রয়োজন ও কার্যকারিতার দিক থেকে বিচার করলে এদের গুরুত্ব সোনা, রূপা, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতির চাইতে অনেক বেশি। তবু কেন লোহার চাইতে রূপা— রূপার চাইতে সোনা— সোনার চাইতে মুক্তা ও প্রবালের মান বেশি? এ মান কি মানুষ দিয়েছে? এ পার্থক্য কি মানুষ তৈরি করেছে? এর গুরুত্ব কি মানুষ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে? যারা বলবে এ পার্থক্য আমরা করেছি, এর দাম আমরা বাড়িয়েছি, এর মর্যাদা আমরা শিখিয়েছি, আমি বলব— না। কেননা আল্লাহর কোরআন থেকে দেখা যায় যে বেহেশতের নির্মাণকার্য লোহা, তামা, দস্তা দিয়ে হয় নি। হয়েছে মুক্তা, প্রবাল, হীরকচূর্ণ ও স্বর্ণ দিয়ে।

"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করাবেন যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মুক্তার কঙ্কন দ্বারা সুশোভিত করা হইবে এবং তথায় তাহাদের বস্ত্র রেশম নির্মিত হইবে।"

(সূরা হজ্ব, আয়াত ২৩)

'সূরা রহমানে' হুরীদের সৌন্দর্যের বিবরণের মাঝেও দেখা যায়, 'তাহারা পদ্মরাগমণি ও প্রবালসদৃশ'। হুরীদের পদ্মরাগমণি ও প্রবালের সঙ্গে তুলনা করে আল্লাহ-পাক নিশ্চয় এসব ধাতুর গুরুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। লোহা, তামা ও সীসার উপমা দিয়ে হুরীদের বর্ণনা

দেন নি। তাহলে দেখা যায় প্রসঙ্গক্রমে আমরাও মানুষের মহত্ত্বের বিকাশ করতে, তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য ধরে একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি। নবীরা সবাই মানুষ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য দেখিয়েই আমরা একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিতে পারি। এতে অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি না।

আমি বলেছি যে, হযরত মুসা (আঃ) ঐশী জ্যোতিঃ দর্শন করে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সে জ্যোতিকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ইহুদী সম্প্রদায় আমার এ কথার নিশ্চয় প্রতিবাদ জানাবেন। কেননা, তাঁরা এটাকে হয়ত অবমাননার উক্তি বলে ধরে নেবেন। এবারে দেখুন প্রমাণ ছাড়া এমন যুক্তি আমি দিয়েছি কিনা :—

"এবং যখন মুসা (আঃ) আমার প্রতিশ্রুত সময়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাহার প্রতিপালককে তৎসহ কথা বলিয়াছিল তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও যেন আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; তিনি (আল্লাহ) বলিয়াছিলেন, তুমি কখনই আমাকে দেখিতে পারিবে না কিন্তু পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর বস্তুত যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবেই তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে; অতঃপর যখন তাহার প্রতিপালক পর্বত উপরি জ্যোতিঃ বিকাশ করিলেন, তখন উহা বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং মুসা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল, যখন সে প্রকৃতস্থ হইয়াছিল তখন বলিয়াছিল তুমিই পবিত্র, আমি তোমার নিকট ক্ষমা করিতেছি এবং আমি সর্বপ্রথম বিশ্বাসস্থাপনকারী।"[১] (৭ : ১৪৩)

পূর্বে প্রেরিত কোন নবীই আল্লাহর জ্যোতিঃ দর্শন করেন নি। আল্লাহর বাণী তাঁদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন হযরত দাউদের উপর জবুর এবং হযরত ঈসার (আঃ) উপর ইঞ্জিল। ঐশী জ্যোতিঃ দর্শন করেছিলেন হযরত মুসা এবং শ্রবণ করেছিলেন আল্লাহর মহাবাণী— যা জবরদস্ত প্রস্তরফলকে খোদিত করা হয়েছিল এবং তওরাত নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম ঐশী বাণী শ্রবণ করেন "হে মুহাম্মদ!'— যখন তিনি নির্জন প্রান্তর অথবা কাননের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন (বয়হাকী এবং ওয়াহেদী বর্ণনা), ঐশী বাণীর মাধ্যমেই তাঁর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়— 'পড়'।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যেমন আল্লাহর ঐশী বাণী জিবরাইল কর্তৃক (কোরআনের ভাষায় যিনি অত্যধিক বিশ্বাসভাজন, শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন— সূরা তাকভীর) প্রাপ্ত হয়েছিলেন তেমনি এই জিবরাইলের সাহায্যেই আল্লাহর সন্নিকটে পৌঁছে তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন। আল্লাহর দর্শন লাভ করে, গৌরব অর্জন করবার কৃতিত্ব বিশ্বের আর কোন মহাপুরুষের ভাগ্যেই জোটে নি। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর জ্যোতির সামান্যতম অংশ দর্শন করে যেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন সেখানে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সপ্ত স্তর আকাশ অতিক্রম করে আল্লাহর সন্নিকটে হাজির হন সুস্থ শরীরে সম্পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক নিয়ে। তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি। আল্লাহর 'নূরে' ভস্মীভূত হয়ে যান নি ও লক্ষ কোটি মাইলের বাধা-বিঘ্ন তাঁকে শঙ্কিত করে তোলে নি। নিকট হতে তিনি আল্লাহর এমনি নিকটতর পৌঁছেন যে একটা পর্দার ব্যবধান ছাড়া আর কিছুই তাঁর মাঝখানে ছিল না। এ তত্ত্বমূলক অসম্ভব ঘটনাও যে সম্ভব হয়েছে আল্লাহর কোরআন তার সাক্ষ্য বহন করে নিম্নোক্ত বাণীতে :

টীকা-১। সূরা আরাফ, আয়াত ১৪৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তোমাদের সহচর বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয় নাই। এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি হইতে কিছু বলে না; কিন্তু উহা এই যে, সে প্রত্যাদেশযোগে প্রত্যাদিষ্ট হয়; সেই সুদৃঢ় শক্তিশালী তাহাকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। যিনি মহাশক্তির অধিকারী। তাহাতেই সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সে সমুন্নত গগনপ্রান্তে ছিল। তৎপর সে নিকট হইতে নিকটতর হইয়াছিল। এমন কি সে দুই ধনুকের জ্যা ব্যবধানে ছিল অথবা আরও সন্নিকটবর্তী হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার সেবকের প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার তাহাই প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। তখন যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তদীয় অন্তঃকরণ তাহা অসত্য ধারণা করে নাই। তবে কি তোমরা তদ্বিষয়ে বির্তক করিতেছ যাহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং নিশ্চিয় যে তাহাকে অন্যবারেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিল— সে সমুন্নত তরুর সন্নিকটে। উহারই সন্নিধানে স্বর্গধাম। যখন উহা সেই তরুকে যেরূপ আবৃত করিবার আবৃত করিয়াছিল। তখন তাহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত অথবা অতিক্রান্ত হয় নাই। নিশ্চয় সেই স্বীয় প্রতিপালকের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করিয়াছিল।"[১] (৫৩ : ২-১৮)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিরক্ষর ছিলেন বলে অনেকেরই ধারণা যে তিনি জগদ্‌গুরু উপাধি পেতে পারেন না। কোন নবী স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী নিয়েছিলেন কিনা বা কোন শিক্ষকের কাছে আদৌ হাতে-খড়ি নিয়েছিলেন কিনা, সেটা আমার জানা নেই। অথচ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তাঁরা মানবসমাজের শীর্ষপ্রান্তে ছিলেন। হযরত সোলায়মান ছিলেন ৭০০ ভাষায় পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। বায়ু তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। জীন পরী এবং মানুষের উপর তাঁর ছিল বিশেষ অধিকার। জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর ভাষা তিনি বুঝতে পারতেন। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও অগাধ পাণ্ডিত্যে ছিলেন তিনি শীর্ষে। এসব শিক্ষা কে তাঁকে দিয়েছিলেন? কোন্ শিক্ষাগুরু তাঁকে দিনের পর দিন এমন শিক্ষা দিয়ে তাঁকে সুশিক্ষিত করেছিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে না জানলেও অকপটচিত্তে হযরত সোলায়মানের পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কি শিক্ষা পেয়েছিলেন, কার নিকট হতে এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন্ পর্যায়ে তিনি পড়েছিলেন এ কথা আমরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে বিচার করতে চাই না। আল্লাহর বাণী নির্ভুল। তাই তাকেই সম্বল করে আমরা এ বিশ্লেষণ দিতে চাই।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের চরম উৎকর্ষ তখনই সাধিত হয় যখন কেউ পরম জ্ঞান লাভ করে সাধনা ও শিক্ষার মাধ্যমে। সাধনা রাসুল্লাহ (দঃ) করেছিলেন একদিন নয়, দু'দিন নয়, সমগ্র জীবনব্যাপী। জীবদ্দশায় তাঁর সাধনার পরিসমাপ্তি হয় নি। এমন সাধনা জীবনে কেউ কোনদিন করেছে বলে কারো জানা নেই। আধ্যাত্মিক, পারমাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাধনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তাই সুখের লাগি— যশঃ ও খ্যাতির লাগি, মান, সম্মান ও ধনের লাগি কোনদিন তিন আকৃষ্ট ছিলেন না। সাধনা দ্বারাই তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন— অনন্ত করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নি, ভুল পথ ধরেন নি এবং তাঁকে অন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাই সাধনার কথা বলতে গেলে বলতে হয় তিনি ছিলেন অতুলনীয় মহাসাধক।

টীকা—১। কোরআন-সূরা নজম। আয়াত ২ হইতে ১৮১।

এবারে বলা যাক তাঁর শিক্ষার কথা। কে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল? কোন মানুষ, কোন ফেরেশতা— না কোন অলৌকিক শক্তি? অনেকেই বলে থাকেন— জিবরাইল কর্তৃক তাঁর শিক্ষা লাভ হয়েছিল। জিবরাইল (আঃ) তাঁকে শিক্ষা দেন নি। জিবরাইলের শিক্ষাও হযরত মুহাম্মদ (দঃ) গ্রহণ করেন নি— করেছিলেন মহান আল্লাহর শিক্ষা। আর জিবরাইল ছিলেন এ শিক্ষার মাধ্যম।

তবে মেরাজের ঘটনা কোরআনে যা বিবৃত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন আল্লাহর অতি নিকটবর্তী হয়ে ছিলেন তখন আল্লাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার তাঁর বক্ষে তুলে দিয়েছিলেন।

"সেই সুদৃঢ় শক্তিশালী তাঁহাকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।" কোরআনের উদ্ধৃত ও গুরুত্বপূর্ণ বাণীও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিরক্ষর ছিলেন না। অপরিসীম জ্ঞানরাজ্যেই তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। মানবীয় কোন জ্ঞান তাঁর জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই এ মহাবিশ্বের কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁকে শিক্ষা দিয়ে তাঁর গুরু হতে পারেন নি। বরং তাঁর শিক্ষা নিয়েই জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে এবং জগতে অনেক গুরুর জন্ম হয়েছে। গুরু হয়ে যিনি জগতে অগণিত গুরুর সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জগদ্‌গুরু নন? দেখুন, এ জগদ্‌গুরুর শিক্ষা নিতে আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন কি না।

"তুমি বল— হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসুল (হযরত মুহাম্মদ দঃ)— যাহার জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য; তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই— তিনিই প্রেরিত মূল (নিরক্ষর) নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর— যে আল্লাহ ও তদীয় বাক্য বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাঁহাকেই অনুসরণ করে যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও।"[১] (৭ : ১৫৮)

অন্ধ যুগের এ মহান গুরু তাঁর মহান শিক্ষায় অন্ধকারের মাঝেই জ্বালালেন আলোর মশাল দিক-দিগন্তে— যে আলোর প্রভায় সবার হৃদয় হলো আলোকিত। ভুল শিক্ষা পেয়ে যুগ-যুগান্তর থেকে যারা সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে অংশীবাদিতা ও পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত, তাদের ধ্যানধারণার অবসান ঘটালেন তৌহিদের বাণী দিয়ে। এ বাণী পরশ পাথর হয়ে স্পর্শ করতে লাগল, বিশ্বের অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত ও অলীক সংস্কারবাদীদের। এ শিক্ষার মূলে ছিল আত্মার সংস্কার ও আল্লাহর একত্ববাদের ঝঙ্কার।

সাধারণ গুরু তিনি নন। সাধারণ শিক্ষাও তাঁর নয়। তিনি ছিলেন 'গুরুর গুরু'— অর্থাৎ গুরুশীর্ষ। তাই শিক্ষা দিতে তিনি শঙ্কিত হন নি, ভুল করেন নি এবং সাধারণ মানুষের কাছে মাথা নত করেন নি। অসাধারণ জ্ঞানের এই অসাধারণ শিক্ষকের প্রতি যারা তবুও ভ্রুকুটি করে বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ বলে প্রচার করত, তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতেই আল্লাহ কঠোর বাণীতে ঘোষণা করলেন :

"তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে— তাহাদের সহচর কোনরূপ বিকৃত চিত্ত নহে, বরং সে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। তাহারা কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব এবং আল্লাহ যে বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিতেছে না? এবং তাহাদের নির্দিষ্টকাল নিকটবর্তী— যাহা অচিরেই সম্পন্ন হইবে; অনন্তর ইহার পরে তাহারা কোন্ কথা বিশ্বাস করিবে? আল্লাহ

টীকা—১। কোরআন—সূরা আ'রাফ। আয়াত ১৫৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহাকে পথভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই; এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের অবাধ্যতায় অন্ধভাবে বিচরণার্থে পরিত্যাগ করেন।"[১] (৭ : ১৮৪-৮৬)

এ বাণী শুধু সে যুগের অবিশ্বাসীদের জন্যই অবতীর্ণ হয় নি— যারা পরবর্তী যুগেও এই মহান গুরুর শিক্ষা নিতে ভ্রুকুটি করে, তাদের জন্যও এক সুতীক্ষ্ণ তীর।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমাজ যারা এ মহান গুরুর আগমন বার্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব তওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল হতে সম্যক উপলব্ধি করেও তাঁর প্রতি আস্থাভাজন হতে পারে না তাদের উদ্দেশ্য করেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন :

'ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে যাহারা সংবাদ অবগত হইয়া আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিবে তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।"[২]

রাসুসুল্লার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কোরআন তার দু-একটি বাণীর মাধ্যমে নয়— অসংখ্য বাণীতেই ঘোষণা করেছে। সূরা আরাফের ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে :

"যাহারা ঐ নিরক্ষর (মূল) প্রেরিত নবীর অনুসরণ করিবে। [ইয়াত্তা-বিউনা রাসুলান্নাবিয়াল উম্মি] যাহার বিষয় তাহারা তাহাদের নিকটস্থ তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত প্রাপ্ত হইয়াছে— যিনি তাহাদিগকে সৎকার্যে আদেশ করিবেন ও তাহাদিগকে অসৎকার্যে নিষেধ করিবেন এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করিবেন ও তাহাদের অপবিত্রসমূহকে অবৈধ করিবেন এবং তাহাদের ভার ও তাহাদের যে নিগুঢ় আছে তাহা অপসৃত করিয়া দিবেন; অনন্তর যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাহাকে সম্মান করিবে এবং তাহার সহিত আমি যে জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিব তাহার অনুসরণ করিবে তাহারাই সুফল প্রাপ্ত হইবে।" (৭ : ১৫৭)

এখানে 'রাসুলান্নাবিয়াল উম্মি' কথাটার বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে চাই যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সত্যি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কিনা?

'রাসুলান্নাবি'— অর্থ নবী প্রতিনিধি বা নবী সম্রাট।

'আল্লাহ-পাক নিজেই যেখানে হযরতকে নবী প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছেন, সেখানে কার সাধ্য তাঁর এ ঘোষণাকে অমূলক বা পক্ষপাতিত্ব বলে বিবেচনা করে? এ শব্দের বিকল্প কোন অর্থ হয় কিনা জানি না; যদি হতো তাহলে নিশ্চয়ই বিজাতীয়রা তাদের কৃপাণ খড়্গ প্রয়োগ করত।

'উম্মি'— অর্থ নিরক্ষর বা মূল।

হযরত মুহাম্মদকে নিরক্ষর বলা চলে না কেননা সাধারণ মানুষের হাতে শিক্ষা লাভ না করলেও তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞান সমুদ্রের অধিকারী। নিজেও তিনি এ কথা বলেছেন :

"আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।"[১]

নবীকুলদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন নিরক্ষর। তাঁরা সাধারণত কোন মানুষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। আল্লাহ-পাক স্বয়ং প্রকৃতির মাধ্যমেই তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে গড়েছিলেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী তাঁরা

টীকা—১। কোরআন—সূরা আ'রাফ। আয়াত ১৮৪ হইতে ১৮৬।
টীকা—২। হাদিস সহীহ বুখারী। তর্জমা—পূর্বে বর্ণিত।
টীকা—১। হাদিস-মুসলিম।

অর্জন করেন নি অথচ তাঁদেরকে আল্লাহ কোথাও 'উম্মি নবী' বলে সম্বোধন করেন নি। যদি 'উম্মি' শব্দের প্রকৃত অর্থ নিরক্ষর হতো তবে এসবক্ষেত্রে তাঁদের নামের পূর্বে উম্মি মুসা, উম্মি ঈসা, উম্মি হারুন ইত্যাদি যোগ হত যেমন হয়েছে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) নামের পূর্বে। যেহেতু এ বিশেষণ তাঁহাদের নামের পূর্বে যোগ হয় নি, তাই নিঃসন্দেহে আমরা 'উম্মি-রাসুল' বলতে হযরত মুহাম্মদকে 'মূল রাসুল' বলে ধরে নিতে পারি। অর্থাৎ এখানে 'উম্মি' অর্থ নিরক্ষর নয় 'মূল'। মূল কথাটি হযরত মুহাম্মদের প্রতি প্রযোজ্য কিনা সেটা একবার বিচার করা উচিত।

মূল অর্থ গাছের প্রধান শিকড়। যার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয় কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা। মূল কেটে দিলে গাছের পরমায়ু শেষ হয়ে যায়। শাখা-প্রশাখা ও কাণ্ড যত উন্নতই হোক না কেন, মূলের অভাবে শুষ্ক বিশুষ্ক ও অকর্মণ্য হয়ে গাছটি মাটিতে নুইয়ে পড়ে। হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ মহাবিশ্ব। তাঁর আগমনবার্তা মুখে নিয়েই যুগে যুগে এসেছেন পূর্বের নবীগণ। শূন্যে বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা যেমন মূলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তেমনি দেশ-দেশান্তরের শান্তিবাহক নবীগণও 'রাসুলান্না-বিয়াল উম্মি' [হযরত মুহাম্মদের] আগমনের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি, প্রমাণ, আদেশ ও উপদেশ সকল যুগের সকল মানব সম্প্রদায়ের জন্যই ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

উম্মি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু আলোচনা করতে চাই। উম্মির অর্থ নিরক্ষর ধরে নিলে এ কথা আমরা বলব, যার মাত্রা জ্ঞান নেই, যার অক্ষর জ্ঞান বা শব্দ যোজনার কোন বুদ্ধি নেই তিনি প্রকৃত নিরক্ষর। অর্থাৎ যার পড়বার এবং লিখবার ক্ষমতা নেই তিনি উম্মি বা নিরক্ষর।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) লিখতে জানতেন না এ কথা সবাই বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। কেননা হোদায়বিয়ার সন্ধি পত্রে তিনি নিজ হস্তে তাঁর পবিত্র নাম সই করেছিলেন।[১] যিনি তাঁর নাম সই করতে জানেন তিনি নিরক্ষর বলে আখ্যায়িত হন কিরূপে এটা আমি বুঝতে অক্ষম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন তিনি পড়তে জানতেন কি না? সবাই বলবেন— না। কেননা কারো কাছেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং সে সুযোগও তিনি পান নি। আমি যদি বলি তিনি পড়তেও জানতেন, তাহলে সবাই একবাক্যে বলবেন, 'এ লেখক উন্মাদ'। উন্মাদনার ছোঁয়া নিয়েই আমি একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দেখুন এর মধ্যে চিন্তার কোন বিষয়বস্তু আছে কি না।

"পড় তোমার সেই মহান প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানুষকে ঘনীভূত শোণিত যোগে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি লেখনী দ্বারা শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না।"[২] (৯৬ : ১-৫)

হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন গভীর ধ্যানমগ্ন তখন অকস্মাৎ এক শুভ্র বেশধারী মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটল যিনি হযরতের সম্মুখে এসে বললেন, 'পড়!— তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন'। সচকিত হয়ে হযরত উত্তর দিলেন,

টীকা—১। হযরত 'মুহাম্মদ' নাম কেটে 'ইবনে আবদুল্লা' শব্দ লিখে দিলেন—সংগৃহীত সিরাতুন্নবী।
টীকা—২। সূরা আলাক—(১ হইতে ৫ আয়াত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আমি পড়তে লিখতে জানি না।" শুভ্রবেশধারী জিবরাইল তখন হযরতকে আপন বক্ষে নিয়ে কঠিনভাবে চাপ দিলেন এবং আবার বললেন, "পড়"। শঙ্কিত চিত্তে রাসুলল্লাহ (দঃ) পূর্বোক্ত ভাবেই উত্তর দিলেন। তখন জিবরাইল তাঁকে আবার বক্ষে আলিঙ্গন করলেন এবং পূর্বাপেক্ষা কটিন জোরে চাপ দিলেন। এ চাপে হযরত একেবারে অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। জিবরাইল বললেন, 'পড়'। হযরতের নিকট হতে একই উত্তর পেয়ে জিবরাইল আবার তাঁকে তৃতীয়বারের জন্য বক্ষে আলিঙ্গন করলেন। এবারের আলিঙ্গনে তাঁর দেহ নিষ্পেষিত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হলো। আতঙ্কে যখন তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল, তখন হযরত জিবরাইল উপর্যুক্ত পাঁচটি আয়াত পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাসুলুল্লাহর (দঃ) মুখ থেকে এ পবিত্র বাণী নিঃসৃত হলো এবং কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। এ অলৌকিক শক্তি বলে রাসুলুল্লাহর (দঃ) হৃদয় সম্প্রসারিত ও জ্ঞানালোকে ভর্তি হয়ে গেল। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর পাঠাভ্যাস। আর এ অভ্যাস চলল তাঁর সারা জীবনব্যাপী। সমগ্র কোরআন যা ছয় হাজার ছয় শত ছিষট্টি আয়াতমালা দিয়ে সঙ্কলিত সম্পূর্ণ জপেই তাঁর কণ্ঠস্থ হলো। শুধু তাই নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সার বাণী, বিশ্বের লুক্কায়িত জ্ঞান-ভাণ্ডার অজানা রইল না। তাঁর চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মত সব ঝলমল করে উদ্ভাসিত হলো। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই একথা ঘোষণা করে নিজের ব্যক্তিত্ব, গুরুত্ব ও অসাধারণত্বের বিকাশ করলেন আর নিরক্ষরতার (উম্মির) অপবাদ হতে নিজেকে মুক্ত করলেন। দেখুন কেমন জ্বলন্ত ঘোষণায় তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন।

"আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁহার অনুগ্রহের জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিলেন। আমি স্বীয় অন্তরে উহার অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করিলাম। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হইলাম।"[১]

জানি না এ বিশ্বের বুকে এমন কোন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল কি না যিনি আকাশ ভুবনের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান তত্ত্ব লাভ করেছিলেন। আমরা যারা মহাবৈজ্ঞানিক ও সুপণ্ডিত বলে নিজেকে আখ্যায়িত করি তারা এ বিশ্বের কতটুকু জানি? এ বিশ্ব সৃষ্টির কতটুকু স্বরূপ তাঁরা উদ্ঘাটন করেছেন? জ্ঞানতত্ত্ব এ দর্শনতত্ত্বের কতটুকু তাঁরা বিকাশ করেছেন। কোটি কোটি বছর চলে গেছে। কোটি কোটি মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মহামনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। লক্ষ লক্ষ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ধরার বুকে অমর হয়ে আছে কিন্তু কেউ কি এমন চ্যালেঞ্জ করেছে যে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্ব তাঁর জ্ঞান-সীমায় আবদ্ধ? শুধু একটি বাণী নয়, দেখুন, এরূপ কত অসংখ্য বাণীর মাধ্যমেই তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন।

"সমস্ত বিশ্ব জগৎকে আমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। তখন আমি উহার পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"[১]

কোন্ মহান শক্তিশালী গুরু তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন জানি না। কোন্ অদৃশ্য গুরুর প্রভাবে তাঁর হৃদয়রাজ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারে পূর্ণ হয়েছে জানি না। কোন্ মহাবৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান তত্ত্বে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে জানি না। তবু এ কথা জানি এবং বিশ্বাস করি যে তিনি নিরক্ষর নন। তিনি মূল— তিনি আদি। তিনি পণ্ডিত; তিনি সুপণ্ডিত। তিনি জ্ঞানী— তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি গুরু— তিনি গুরুর গুরু। তিনি জগদ্‌গুরু।

টীকা—১। মিশকাত। সংগৃহীত কোরআনের তর্জমা—আলী হাসান।
টীকা—১। সৃংগৃহীত কিমিয়ায়ে সা'দত, ১ম খণ্ড ও ৫ম খণ্ড।

আর একটি উদ্ধৃতি আমি এখানে পেশ করছি। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। "একদা ইহুদীরা রাসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল— তাহাদের মধ্যে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী যিনা করিয়াছে [অসঙ্গত মিলন]। রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তৌরাতে 'রজম' সম্বন্ধে কি পাও?" তাহারা বলিল, "আমরা যিনাকারীদের তিরস্কার করি এবং তাহাদের দোররা মারা হয়।" ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ বিন সালাম বলিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলিতেছ, উহাতে 'রজমের' কথা আছে।" তখন তৌরাত আনিয়া খোলা হইল। এবং তাহাদের এক ব্যক্তি 'রজমের' আয়াতের উপর হাত চাপা দিয়া, তাহার পূর্বের ও পরের কথা পড়িল। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার হাত ওঠাও ত। তখন সে হাত উঠাইল এবং দেখা গেল ঐ স্থানে 'রজমের' আয়াত রহিয়াছে। তখন ইহুদীরা বলিল— সে সত্য বলিয়াছে। হে মুহাম্মদ! উহাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে। তারপর রাসুলুল্লাহের (দঃ) আদেশ অনুযায়ী ঐ দুই ব্যক্তিকে 'রজম' করা হইল।"[২]

'রজম'— অর্থ প্রস্তরাঘাতে হত্যা।

কোরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের উপর যদি হযরতের কোন জ্ঞান না থাকত অথবা নিরক্ষর বলে যদি তিনি পরিচিত হতেন, তবে তৌরাতে 'রজম' কথার উল্লেখ আছে এটা তাঁর জানার কথা ছিল না। এর উত্তরে অবশ্য একটা কথা আমরা বলতে পারি যে রাসুলুল্লাহ (দঃ) পড়তে জানতেন না তবে কাউকে হয়ত তৌরাত পড়তে শুনেছেন এবং ঐ অংশটুকু স্মরণ করে রেখেছেন। একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি বাণী স্মরণ রাখা কি সম্ভব? যদি উত্তরে আমরা বলি যে তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী, অসাধরণ জ্ঞানী এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ তাই তাঁর পক্ষে স্মরণ রাখা সম্ভব। যদি এমন অসম্ভব তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় তবে এটাই বা অসম্ভব কেন যে তিনি এক মহাশক্তি বলে পড়তেও শিখেছেন— লিখতেও শিখেছেন।

কোরআন যে কথার সাক্ষ্য দেয়—যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে;

(সেই সুদৃঢ় শক্তিশালী তাহাকে শিক্ষা দান করিয়াছে— যিনি মহাশক্তির অধিকারী।)

বিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়ের নিকট হযরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব চিরকাল অজেয় হয়ে থাকবে কিন্তু অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তরে এ শ্রেষ্ঠত্ব দেবে এক নিদারুণ আঘাত। কেননা অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস করতে আনন্দ পায়। আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর ভালভাবে জানেন বলেই কোরআনে উল্লেখ করেছেন :

"যদিও ইহা অবিশ্বাসীদের অপ্রীতিকর"।

অবিশ্বাসী সম্প্রদায় চিরদিন অবিশ্বাসী হয়েই থাকবে। তারা তাদের নবীকেও যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে অবিশ্বাসী করেছে, তেমনি আল্লাহর বাণীকেও অবিশ্বাস করে হযরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি কুঠারাঘাত করেছে এবং করবে। তবু আমরা আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তাঁর বাণী ধরেই আলোচনা করব।

"তুমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক ও ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত নহ।"

(সূরা রাদ ১৩ : ৭)

উপর্যুক্ত কোরআনের বাণী সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছে। যারা স্বীয় গোত্রের নবী বা

টীকা—২। সহীহ বুখারী (তর্জমা আঃ রহমান খাঁ ৪৭/৩৩৯— কোরেশের মর্যাদা পরিচ্ছেদ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহাপুরুষের গৌরবে গৌরবান্বিত— যারা হযরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্বে ক্রোধান্বিত, যারা ইসলামের বিজয় মুকুটে সন্দেহাতীত তাদের অস্তিত্বহীন বাগ আড়ম্বরের অবসান ঘটিয়েছে এ বাণী। বিশ্বমানবের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করতে জন্ম নিয়েছিলেন এ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আসুন, এবারে তাই সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আমরা সেই জগৎগুরুর কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করি ও তাঁকে সালাম জানিয়ে ধন্য হই।

ইয়া নবী সালাম আলায় কা
ইয়া রাসুল সালাম আলায় কা
ইয়া হাবিব সালাম আলায় কা
সালাওয়া তুল্লা আলায় কা

হযরত দাউদের প্রতি জবুর—হযরত মুসার প্রতি তওরাত ও হযরত ঈসার প্রতি ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলো আল্লাহর বাণী। তাঁদের উপর বিশ্বাস প্রতিটি সম্প্রদায়েরই আছে। কেননা কোরআন এ কথা বহু স্থানেই ঘোষণা করেছে; যেমন :

(১) "এবং আমি দাউদকে জবুর দান করিয়াছি।"[১] (১৭ : ৫৫)

(২) "এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে গ্রন্থ তওরাত প্রদান করিয়াছিলাম।"[২] (২৩ : ৪৯)

(৩) "এবং তাহার পরে আমি মরিয়ম নন্দন ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান করিয়াছিলাম।"[৩] (৫৭ : ২৭)

যে সব মহাপুরুষ ধর্মগ্রন্থ পাবার উপযুক্ত বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা যে নিঃসন্দেহেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আদর্শে ও চরিত্রে, দর্শনে ও শাস্ত্রে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতায় ছিলেন সাধারণ মানুষের বহু উর্ধ্বে— এ কথা অনস্বীকার্য। এ সব মহাপুরুষের উর্ধ্বে ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তাই তাঁর উপরই অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরাআন। আল্লাহ এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে :—

"এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পুনরাবৃত্তিকারী সপ্ত আয়াত ও মহা কোরআন দান করিয়াছি।"[৪] (১৫ : ৮৭)

"নিদর্শনাবলী ও পুস্তিকাসহ; এবং আমি তোমার প্রতি স্মারক অবতীর্ণ করিয়াছি— যেন তুমি মানবমণ্ডলীর জন্য উহা বিবৃত কর— যাহা তাহাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যেন তাহারা অনুধাবন করে।"[৫] (১৬ : ৪৪)

"তিনি স্বীয় সেবকের প্রতি এরূপ সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছেন—যেন সে তোমাদিগকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বহির্গত করে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি স্নেহশীল করুণাময়।"[৬] (৫৭ : ৯)

"এবং এই কোরআন এরূপ নহে যে— আল্লাহর পরিবর্তে কেহ উহার অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু ইহা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালক হইতে গ্রন্থ বিশ্লেষণকারী।"[৭] (১ : ৩৭)

টীকা—১, ২, ৩। কোরান সূরা বনি ইসরাইল। সূরা মোমেনুন—আয়াত ৪৯। আয়াত ৫৫ সূরা হাদিস—আয়াত ২৭-এর অংশ।

টীকা—৪, ৫, ৬, ও ৭-কোরআন। সূরা হেজর—আয়াত ৮৭। সূরা নহল—আয়াত ৪৪। সূরা হাদিদ—আয়াত ৯। সূরা ইউনুস—আয়াত ৩৭।

"এবং তুমি যে অবস্থাতেই থাক এবং তদীয় কোরআন হইতে যাহাই পাঠ কর এবং তোমরা যে কার্যই কর না কেন— আমি তোমাদের উপর সাক্ষী ব্যতীত নহি— যখন তোমরা উহাতে লিপ্ত হও; আকাশ অথবা পৃথিবীতে তোমার প্রতিপালকের নিকট উহার বিন্দু পরিমাণও অপ্রকাশিত থাকে না এবং উহার ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয় প্রকাশ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত নহে।"[১] (১০ : ৬১)

"এবং তুমি বল সত্য আগমন করিল ও অসত্য অন্তর্হিত হইল, নিশ্চয় অসত্য অন্তর্হিত হইয়া থাকে।"[২] (১৭ : ৮১)

পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের সারকথা নিয়েই এসেছে কোরআন। এ কোরআনকে তাই গ্রন্থের জননী বলা হয়। This is the highest literature and complete code of life. এর অনুকরণে কোন গ্রন্থ মানব দানব কর্তৃক রচিত হতে পারে না। আল্লাহ পাক তাই চ্যালেঞ্জ দিয়ে অনেকবার বলেছেন যে, সমুদয় জীন ও ইনসান একত্রিত হয়েও কোরআনের এরূপ একটা বাণী রচনা করতে পারবে না। নিম্নোক্ত বাণী এ কথা প্রমাণ করে।

"তুমি বল—যদি মানব ও জীন এই কোরআনের সদৃশ্য আনয়ন করিতে একত্রিত হয়, তবু তাহারা ইহার সদৃশ্য আনয়ন করিতে পারিবে না—যদিও তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়। এবং নিশ্চয় আমি এ কোরআনকে সর্ববিধ উপমাযোগে সুবিবৃত করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাস ব্যতীত স্বীকার করে না।"[৩] (১৭ : ৮৮/৮৯)

"এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই—বরং উহা সমুজ্জ্বল গ্রন্থে রহিয়াছে।"[৪] (২৭ : ৭৫)

"তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তাঁহার নিকট নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত পরমাণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোন বিষয়ই লুক্কায়িত নাই বরং সমস্তই সমুজ্জ্বল গ্রন্থে রহিয়াছে।"[৫] (৩৪ : ৩)

এ বাণীর গুরুত্ব কত অপরিসীম— এ কোরআনের মর্যাদা কত সমুন্নত তা আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম। বিশ্বের পণ্ডিতবর্গ একত্রিত হয়ে যদি এর সদৃশ একটা বাক্যও সৃষ্টি করতে সমর্থ না হন, তবে বুঝতে হবে যে কোরআনের প্রতিটি শব্দের যে অর্থ সেটা রূপক নয় ব্যাপক, সাধারণ নয় অসাধারণ ও লঘুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ। এ বাণী অমর, অক্ষয়। এ বাণী মহাসত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করা মহামূল্যবান রচনা। জল, স্থল, আকাশ, ভূতল, জড়, চেতন, অণু-পরমাণু, জানা-অজানা, চেনা-অচেনা, শুনা, না শুনার ঘটনাবহুল তত্ত্বই, পরিবেশন করেছে এ মহাবাণী। অণু-পরমাণুর সন্ধান যেমন দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে বিশাল সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা। মূর্খ ও অবিশ্বাসীদের যেমন দিয়েছে ভীতি, জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিত ও সৎলোকদের দিয়েছে তেমনি প্রীতি। এ গভীর তত্ত্ব ভাবুককে করেছে আরও ভাবুক, জ্ঞানীকে করেছে বিজ্ঞানী, সাধুকে করেছে মহাপুরুষ আর মানীকে করেছে ধ্যানী। ছন্দ-রূপ, ভাষা-ভাব, আদেশ-উপদেশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-এ মহাগ্রন্থ কোরআন যার কোন তুলনা নেই।

টীকা—১ ও ২। কোরআন—সূরা ইউনুস—আয়াত ৬১। সূরা বনি ইসরাইল—আয়াত ৮১/৮৮, ৮৯। সূরা নমল-আয়াত ৭৫। সূরা সাবা-আয়াত ৩-এর শেষাংশ।

টীকা—৩ হইতে ৫। কোরআন—সূরা ইউনুস—আয়াত ৬১। সূরা বনি ইসরাইল—আয়াত ৮১/৮৮, ৮৯। সূরা নমল—আয়াত ৭৫। সূরা সাবা—আয়াত ৩-এর শেষাংশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ গুরুত্বপূর্ণ, তুলনাবিহীন, অবিকৃত, পবিত্র, সুন্দর, স্বচ্ছ ও সর্বশেষ গ্রন্থ, যে মহাপুরুষের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি কি অতুলনীয়, অসাধারণ, সর্বকৃতিত্বের অধিকারী, বিশ্ব সৃষ্টির এক সঠিক পথের দিশারী নন? কোরাআন যদি গ্রন্থের জননী হয় তবে তার বাহক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই মহা-পুরুষদের উর্ধ্বে মহাঅভিভাবক। এ মহাজ্ঞানী মহান অভিভাবককে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন তাঁর মহাবাণীতে :

"অতঃপর আমি ইহা তোমার ভাষায় সহজ ব্যতীত করি নাই— যেন তুমি এতদ্বারা ধর্মভীরুদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর এবং তদ্বারা কলহপরায়ণ সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন কর।"[১] (১৯ : ৯৭)

জগতের ধর্মভীরু, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কোরআন পবিত্র এক আলোকবর্তিকা। এ আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে যিনি আলোর পথ প্রদর্শন করলেন, তিনিই ত প্রকৃত শিক্ষাগুরু। যারা কলহপরায়ণ, অবিশ্বাসী ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা মানব মনে আগুন জ্বেলে দিয়ে বিভ্রান্ত করে ও সত্যের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়, বিশ্বের সেই কুটিলপরায়ণ অংশীবাদীদের ভয় প্রদর্শন করতেই ত এগিয়ে এলেন বিশ্বমানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। কঠোর হস্তে এ অশান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়কে দমন করতেই ত আল্লাহ নির্দেশ করলেন এ নির্ভীক মহামানবকে। অকৃতকার্য হয়ে পরাজয় বরণ করতে এ মহামানবের জন্ম হয় নি। আল্লাহর কোরআন যার বক্ষে, আল্লাহর ঐশীবাণী যার অন্তরে, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি যার দু-বাহুতে তিনি কি পরাজিত হতে পারেন? মৃত্যুর শত শত বছর পরেও যাঁর বাণীতে দিক-দিগন্ত মুখরিত, যাঁর ধ্যানে কোটি কোটি আত্মা মগ্ন, যাঁর সেবায় জ্ঞানী-বিজ্ঞানী সর্বদা রত, তিনি কি যুগ যুগের মনীষীদের আত্মার খোরাক নন? তিনি কি মৃত? তিনি কি অকৃতকার্য? না—তিনি মৃত নন—চিরজীবন্ত। অকৃতকার্য নন—কৃতকার্যের শীর্ষপ্রান্তে সমুন্নত আসনে সমাসীন। কোরান ঠিকই বলেছে :

"আমি তোমার প্রতি এ জন্য কোরআন অবতীর্ণ করি নাই যে—তুমি অকৃতকার্য হইবে।"[১] (২০ : ২)

অনেকের মুখেই শোনা যায় যে কোরআন আল্লাহর বাণী নয়। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারারই অভিব্যাক্তি। কেহ কেহ তাঁকে কবি, দার্শনিক ও মহাজ্ঞানী বলে স্বীকার করে বলে থাকেন যে এই কবির কল্পনাসমৃদ্ধ কথামালা দিয়েই রচনা করা হয়েছে এ কোরআন। তাই এটা তাঁর নিছক কল্পনা ব্যতীত নয়। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। এ সাধারণ মানুষের চিন্তাধারাকে আল্লাহর কথা বলে স্বীকার করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এরূপ চিন্তাধারা যে সত্যই হয়েছিল বা এখনও আছে তা বুঝা যায় কোরআনের বাণী হতেও।

"তাহারা বলিয়াছিল—ইহা তার অলীক কল্পনা বরং সে ত নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে বরং সে ত কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এমন কোন নিদর্শন আনয়ন করুক— যেরূপ প্রাথমিকেরা প্রেরিত হইয়াছিল।"[২] (২১ : ৫)

১। কোরআন। সূরা মরিয়ম—আয়াত ১৭।
টীকা ১। কোরআন। সূরা তা'হা। আয়াত ২।
টীকা ২। কোরআন। সূরা আম্বিয়া। আয়াত ৫।

এ ধরনের কথা শুধু আধুনিক যুগের, আধুনিক মানুষের মুখেই শোনা যায় না প্রতিটি নবীর যুগেই এ ধরনের কল্পনাবাদী ও খেয়ালী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষ যে অসাধারণ হতে পারে, 'দোলনার শিশু' যে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিতে পারে হাতের যষ্টি যে অজগর হয়ে যাদুকরের যাদুক্রিয়ার উপকরণকে গ্রাস করতে পারে মাছের পেটে ক্রমাগত তিনদিন ও তিনরাত্রি অতিবাহিত করেও যে কেহ জীবিত থাকতে পারে— এমন কথা তারা হয়ত জানে না। এসব কথাগুলো কি গাঁজাখোরী না বাপ-দাদার মিথ্যা ইতিহাস? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্য এসব যুক্তির কোন মূল্য নেই। কেননা প্রমাণ ছাড়া যা মেলে তা অবাস্তব, কল্পনার জাল বা ভিত্তিহীন রটনা—এটাই হলো বৈজ্ঞানিক ধারণা। বৈজ্ঞানিকদের এ ধারণাকে আবার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কোন কোন মহাশক্তি তাঁর অসীম বৈজ্ঞানিক কারিগরির পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির পর থেকে। যে সব ঘটনার কোন কারণ বা প্রমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে মেলে না। যেমন আত্মাকে অবাস্তব কল্পনা বা ভিত্তিহীন বলে কোন বৈজ্ঞানিক কি উড়িয়ে দিতে পারবে? হয়ত আত্মাকে 'soul' বা নফস নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে কিন্তু এই শক্তিটাকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারে না। আর পারে না বলেই বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মত লোকও বলতে বাধ্য হয়েছেন :

"হে আল্লাহ্! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আত্মা তোমার কাছে না পৌছে ততক্ষণ অশান্ত থাকে।"[১]

মনের স্থিতি কোথায়? এর ডাইমেনশন কি? কঠিন, তরল না বায়বীয় পদার্থ? পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন বিদ্যার কোন গবেষণাগারে কি এর কোন সন্ধান মেলে? এসিডের কোন Reaction-এ কি এমন অন্য কোন পদার্থের সৃষ্টি করে? বলতে হবে কিছুই করে না। এর না আছে ডাইমেনশন, না আছে স্থিতি, না আছে কোন উপাদান। অথচ এটা আছে এবং এর ক্রিয়াও আছে। যদি তাই থাকে তবে মনের সংজ্ঞাও আমরা দিতে পারি। 'বিজ্ঞান না কোরআন' পুস্তকে আমি মনের বিকাশ পরিচ্ছেদে এক জায়গায় লিখেছি :—

"স্পর্শ দ্বারা যা অনুভব করা যায় না, দর্শন দ্বারা যা উদ্ভাসিত হয় না, পরীক্ষার দ্বারা যার সত্যতা মেলে না, অথচ যার অস্তিত্ব আছে, যার বিকাশ আছে, যার কল্পনা আছে তাই আমাদের মন। এর শক্তি অসাধারণ। এর শক্তি আমাদের কল্পনার বহু উর্ধ্বে। একে ধরবার মত কোন কৌশলই আজ পর্যন্ত আমরা বের করতে পারি নি।" [লেখক]

বাতাসের উৎপত্তি স্থল কোথায়? জ্ঞানের উৎস কি? চিন্তার কেন্দ্রস্থল কোথায় এসব প্রশ্নের সমাধান কি বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে এবং প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করা হয় যে এদের স্থিতি আছে, ক্রিয়া আছে, গুণাগুণ আছে, বিকাশ করবারও ক্ষমতা আছে তবে অস্বীকার করে লাভ কি? এসব অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে এবং বিজ্ঞানীরা দিন দিন এগুলোর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে নবযুগ রচনা করছেন এবং তাঁদের মহা কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন এবং ধরাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। এবারে চলুন কোরআনের বাণীকে অলীক, কল্পনাপ্রসূত বা কবির কথামালা বলে ধরে না নিয়ে সর্বশক্তিমানের বাণী বলে বিশ্বাস করি এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করি। কোরআন স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে :

টীকা—১। চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর মতে আল্লাহর অস্তিত্ব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই। তুমি বল, আমি এতদ্ব্যতীত প্রত্যাদিষ্ট হই নাই যে সেই একমাত্র উপাস্যই তোমাদের উপাস্য; অতঃপর তোমরা কি মুসলমান হইবে?"[২] (২১ : ১০৭-১০৮)

সূরা আম্বিয়াতে নবীদের কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্যই সূরাটির নামকরণ হয়েছে 'আম্বিয়া' বা নবীগণ। উক্ত সূরায় হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান, হযরত জাকারিয়া, হযরত লুত, হযরত আয়ুব, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত ইউনুস, হযরত ইদ্রিস, হযরত জুলফিকর, হযরত মুসা, হযরত ঈসা (আঃ) প্রভৃতি নবীগণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের গৌরব, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এসব মহাপুরুষদের বর্ণনা প্রসঙ্গের শেষে কোরআন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করেছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় :

"ওয়ামা আরছালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আ'লামিন" (২১ : ১০৭)

'বিশ্ব জগতের প্রতি করুণা বলে কোন নবীকেই সম্বোধন করা হয় নি। সাইয়েদুল আম্বিয়া বা নবীকুল সম্রাট এবং খায়রুল বাশার—মানবকুল শিরোমণি এরূপ উপাধি শুধু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ভাগ্যেই জুটেছিল। আল্লাহর এ ঘোষণা সাধারণ ঘোষণা নয়। নবীদের পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) রেখে তাঁদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা এক অসাধারণ ঘোষণা। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আদর্শে ও মহাত্ম্যে, শিক্ষায় ও সাম্যবাদে, মানবপ্রেমে ও বিশ্বপ্রেমে, আধ্যাত্মিকতায় ও মানসিকতায়, একত্বে ও নির্ভীকত্বে তাঁর চাইতে উচ্চ আসন পাবার উপযুক্ত কেউ নয় বলেই তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণাতে কোন নবীকে হেয় করা হয় নি, কারো শ্রেষ্ঠত্বের পর আঘাত হানা হয় নি, কারো উপর কটাক্ষপাত করা হয় নি, কারো আসনের অমর্যাদা করা হয় নি— হয়েছে শুধু 'নবীকুল সম্রাট' বলে, 'আল্লাহর করুণা' বলে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) ঘোষণা করা। এমন ঘোষণার পরেও যদি কারো কোন কিছু সন্দেহ থাকে তবে কোরআনের এরূপ বাণী উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিন যাকে হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) উপর আসন দিতে পারেন। এরূপ একটি মাত্র মহাবাণী উদ্ধৃত করতে পারলে—যা অন্য যে কোন নবীর, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, তবে আপনাদের যুক্তি আমরাও মেনে নেব। স্বজাতির খাতিরে আমরা তখন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ দিতে অগ্রসর হব না। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় কেউ অগ্রসর হতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। কেননা কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে হযরতের প্রচারিত ধর্ম 'ইসলাম'—সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, মুসলমান জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্বে যে সমস্ত পয়গম্বর আগমন করেছিলেন তাঁরাও অবশ্য মুসলমান ছিলেন। কেননা সবাই আল্লাহর একাত্ববাদত ঘোষণা করেছেন। সবাই প্রতিমা পূজারও ছিলেন ঘোর বিরোধী। হযরত ইব্রাহিম স্বহস্তে প্রতিমাপুঞ্জ ধ্বংস করেছেন। হযরত মুসা, হযরত ঈসা অশোরা মূর্তি দেবপ্রতিমার ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ কথা কারোরই হয়ত অজানা নেই। তবুও বাইবেল ও কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

টীকা—২। কোরআন। সূরা আম্বিয়া আয়াত ১০৭, ১০৮।

"তোমরা তাহাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিবে; তাহাদের স্তম্ভসকল ভগ্ন করিবে, তাহাদের অশোরা মূর্তি সকল অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবে, তাহাদের খোদিত দেব প্রতিমাসকল ছেদন করিবে এবং সেই স্থান হইতে তাহাদের নাম লোপ করিবে।"[১]

"তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থিত স্বর্গে, নিচস্থ পৃথিবীতে এ পৃথিবীর নিম্নস্থ জলে যাহা আছে তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।"[২]

কোরআন :—"এবং যাহারা প্রতিমাপুঞ্জের পূজা হইতে প্রমুক্ত হয় এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহাদের জন্যই সুসংবাদ; অতএব আমার সেবকগণকে সুসংবাদ প্রদান কর, যাহারা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপর ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর বিষয়ের অনুসরণ করে তাহাদিগকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহারাই জ্ঞানের অধিকারী।"[৩]
(৩৯ : ১৭)

'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমাপুঞ্জের উপাসনা করিতেছ এবং অসত্য রচনা করিতেছ; নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের উপাসনা করিতেছ উহারা তোমাদের উপজীবিকার অধিকারী নহে—অতএব তোমরা আল্লাহর নিকটই উপজীবিকার অনুসন্ধান কর এবং তাহারই উপসনা কর এবং তাঁহারই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে।"[৪] (২৯ : ১৭)

"অতএব প্রতিমাপুঞ্জের অপবিত্রতা পরিহার কর এবং অসত্য বাক্যাবলী বর্জন কর।"[৫]
(২২ : ৩০)

অসাড় প্রতিমাপুঞ্জ যে শক্তিহীন, দেব-দেবতা যাদের মূর্তি দিয়ে যুগ যুগ ধরে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে হাজার হাজার মানুষ পূজা করে আসে, তারা যে সত্যিকারের ত্রাণকর্তা নয় কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছে।

"হে মানবগণ! একটি দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; অতএব উহা শ্রবণ কর; নিশ্চয় আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর—তাহারা একটি মক্ষিকাকেও সৃষ্টি করিতে পারে না, যদিও উহারা সকলে তৎনিমিত্ত একত্রিত হয়; এবং মক্ষিকা তাহাদিগ হইতে কিছু লইয়া যায়, তবে তাহারা উহা হইতেও তাহা ফিরিয়া লইতে পারিবে না; প্রার্থী ও প্রার্থনাকারী উভয়ই শক্তিহীন।"[১] (২২ : ৭৩)

মুসলিমের গৌরব, ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরাই আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর নির্দেশিত সুন্দর, সহজ ও সরল পথের অনুসন্ধান দেওয়া এবং এ পথের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা তাঁদের অন্তরে তুলে দেওয়া। আমার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে নয়—কোরআনের অমূল্য বাণীকে সম্বল করেই এ ধারণা সবাইকে দিতে চাই। কোন ধর্মের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। কারণ আমি পূর্বেই বলেছি যে প্রতিটি ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষই 'ইসলামের' ঝাণ্ডা হাতেই এসেছিলেন। সবাই নিজের আত্মাকে সমর্পণ করেছিলেন এক মহাশক্তির কাছে এবং সেই আদর্শ দিয়ে গেছেন তাঁর অনুবর্তীদের। কিন্তু কালচক্রে সে সব আদর্শ হতে তারা বিচ্যুত হয়ে নিজেদের সুবিধার্থে মনগড়া নীতি অবলম্বন করেছে। এসব নীতি ইসলামের পরিপন্থী।

টীকা—১। বাইবেল—দ্বিতীয় বিবরণ। ১২-৩)—২৮৯ পৃষ্ঠা
টীকা—২। বাইবেল—দ্বিতীয় বিবরণ। (৫-৮)—২৭৬ পৃষ্ঠা।
টীকা—৩, ৪, ৫। কোরআন—সূরা জোময়—আয়াত ১৭ ও ১৮; সূরা আনকাবুত—আয়াত ১৭। সূরা হজ্ব—আয়াত ৩০।
টীকা—১। কোরআন—সূরা হজ্ব। আয়াত ৭৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ ইসলাম পরিপন্থী নীতির সংস্কার সাধন করতেই জন্ম নিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ এ জন্যই ঘোষণা করেছেন :—

"ইন্নাকা লা' আলা হুদাম্মুসতাকিম" অর্থাৎ— "নিশ্চয়ই তুমি সরল, সুপথে রহিয়াছ।"[২] (২২ : ৬৭)

"এবং তোমরা আল্লাহরই উদ্দেশ্যে তদীয় সত্য সাধনায় সাধন কর; তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য ধর্মে কোনরূপ সংকীর্ণতা করেন নাই; উহাই তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্ম। তিনি তোমাদিগকে 'মুসলিম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার পূর্বে এবং ইহার মধ্যেও যেন রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষী হও; অতএব তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে ধারণ কর : তিনিই তোমাদের অভিভাবক; অতএব কেমন উত্তম অভিভাবক ও উৎকৃষ্টতর সাহায্যকারী।"[৩] (২২ : ৭৮)

যার মাহাত্ম্য ও গুণ-গরিমার বিকাশ করতে কলম ধরেছি, যার মহানুভবতার আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে আল্লাহর কোরআন অনুধাবন করছি— তিনি যে মানবকুল শিরোমণি—বিশ্বের কল্যাণ, সত্যের দিশারী, নবীকুল সম্রাট, বিশ্বজগতের ভয়প্রদর্শক এতে সন্দেহের তিলমাত্র ঠাঁই নেই। কারণ আল্লাহ এর সাক্ষ্য বহন করছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে :

"তিনি কল্যাণময়— যিনি স্বীয় সেবকের প্রতি ফোরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন— যেন সে বিশ্বজগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হয়।"[১]

এ মহামানব কি পূর্বের নবীদের মত শুধু স্ব-ধর্ম, স্ব-জাতি ও স্বদেশের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন? এ মহাপুরুষ কি শুধু আরবের অনাচারী সম্প্রদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? এ মহামনীষীর জ্ঞান-ভাণ্ডার কি শুধু কোরেশ বংশের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল? এ মহাজগতের সুসন্তান কি শুধু তিমিরাচ্ছন্ন আরববাসীর আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাতে এসেছিলেন? না—তিনি জন্ম লাভ করেছিলেন সমগ্র জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে, কলুষ-কালিমার অবসান করতে ও আল্লাহর মনোনীত ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা করতে। কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে।

"আল্লাহ্ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য করিবে, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিবেন যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন; এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্তিত করিবেন; তাহারা আমারই উপাসনা করিবে—আমার সহিত কোনই অংশী স্থির করিবে না; এবং ইহার উপর যে অবিশ্বাস করিবে ফলতঃ তাহারাই দুষ্কার্যকারী।"[২] (৪৪ : ৫৫)

আল্লাহর এ অঙ্গীকার ব্যর্থ হয় নি। ইসলামের ক্ষীণ প্রদীপ যখন মিটি মিটি জ্বলছিল— অবিশ্বাস পৌত্তলিকদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নির্মম উপদ্রবে যখন মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী সম্প্রদায় ঘোর তমসায় নিশা যাপন করছিল তখনই এ আশ্বাসবাণী হযরতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। স্বদেশের পবিত্র মাটিকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল সত্য কথা, পরিবার পরিজনের প্রিয়

টীকা—২। কোরআন-সূরা হজ্ব। আয়াত ৬৭-এর শেষাংশ।
টীকা—৩। কোরআন—সূরা হজ্ব—শেষ আয়াত-৭৮। সূরা ফোরাকানং—১ম আয়াত।
টীকা ১। কোরআন—সূরা হজ্ব—শেষ আয়াত—৭৮। সূরা ফোরাকান—১ম আয়াত।
২। কোরআন—সূরা নূর আয়াত ৫৫।

মুখমণ্ডল দর্শনে বিমুখ হতে হয়েছিল সত্য কথা, কিন্তু মুষ্টিমেয় পূত চরিত্রের বিশ্বাসী মানুষ নিয়ে কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সারা বিশ্বে সত্যের বাণী প্রচার করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং গোটা বিশ্বের বুকে আধিপত্য বিস্তার করে বিজয় কেতন উড়ালেন ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলাম আজও ডুবে যায় নি। ইসলামের জয় নিশান আজও দিকে দিকে শান্তির বাণী বহন করেই চলছে এবং চলবেও চিরদিন। একে রোধ করবার ক্ষমতা যেমন কারোরই হয় নি, তেমনি এর পথে বাধা দেবার শক্তিও কারো হবে না। কেননা এ ধর্ম আল্লাহরই মনোনীত ধর্ম। এ অঙ্গীকার আল্লাহরই অঙ্গীকার। এ বিধান আল্লাহরই এক মহাবিধান।

সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ (কোরআন) হাতে নিয়ে, পর্বতসম অটল বিশ্বাস নিয়ে মহাসাগরের মত প্রশান্তি নিয়ে, যে মহাপুরুষ তৌহিদের বাণী মানুষের কানে কানে দিয়ে গেছেন তিনি প্রকৃত সুসংবাদদাতা, সাম্যের বার্তাবাহক আর কলুষ চিত্তের ভয় প্রদর্শক। আল্লাহ নিজেই সে কথা ঘোষণা করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে ঃ

"এবং আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই।"[১] (২৫ : ৫৬)

"অতএব তুমি আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর, নিশ্চয়ই তুমি সমুজ্জ্বল সত্যের উপর অবস্থিত রহিয়াছ।"[২] (২৭ : ৭৯)

এ ছাড়া হযরত নিজেও বলেছেন :—

"আমি সমগ্র বিশ্বজগতের নবীরূপে প্রেরিত ও মনোনীত হইয়াছি।"[৩]

এবারে আমরা কোরআনের বাণী ধরে হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করব তাঁর আদর্শের মাপকাঠিতে। আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন :

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলই উত্তম আদর্শ—যে আল্লাহ এবং পরকালের আকাঙ্ক্ষা করে এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ করিয়া থাকে।"[৪] (৩৩ : ২১)

"হে নবী, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী ও সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি। এবং তুমি তাঁহারই আদেশে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও প্রদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ।"[৫] (৩৩ : ৪৫-৪৬)

সূরা আজহাবের ২১ নং এবং ৪৫ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) মানব জাতির আদর্শ মহাপুরুষ ও প্রদীপ্ত প্রদীপরূপে আখ্যায়িত করেছেন। অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ এ বাণী। যুগ যুগের ঐতিহাসিক ও মহাপুরুষগণ হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) আদর্শ মানব বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কথা আমরা অজস্র বই পুস্তকে পড়েছি এবং অসংখ্য পবিত্র মুখে শুনেছি। মনের কোণে তবুও যতটুকু সন্দেহ ছিল কোরআনের এ বাণী তা মুছে দিয়েছে। আরও মুছে দিয়েছে হিংসাপরায়ণ অবিশ্বাসীর শত্রুমনোভাবাপন্ন কল্পিত রচনা। যারা হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সৃষ্টির সেরা-শ্রেষ্ঠতম নেতা বলে অস্বীকার করতে মনের কোণে ফাঁদ পেতে রাখেন তারা দেখুন কোরআনের প্রকৃত বাণী এবং এর প্রকৃত অর্থ।

'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানা' তুল্লে মান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াওমাল আখেরা ওয়া জাকারাল্লাহা কাছিরান।"[১] (৩৩ : ২১)

টীকা ১, ২। কোরআন—সূরা ফোরকান—আয়াত ৫৬, সূরা নমল—আয়াত ৭৯।
৩। তঃ হক্কানী।
৪-৫। কোরআন—সূরা আজহাব—আয়াত ২১, সূরা আজহাব—আয়াত ৪৫, ৪৬।
টীকা—১। সূরা আজহাব। আয়াত—২১।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) আল্লাহ্ 'উসওয়াতুন হাসানা' এই বলে আখ্যায়িত করেছেন 'উসওয়াতুন হাসানা' এই আরবী শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন—উত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম নেতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, উৎকৃষ্টতর নীতি।

কোন্‌টি ধরে আমরা ব্যাখ্যা করব? আল্লাহর রাসুল সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সর্বোৎকৃষ্ট নীতির অধিকারী—না নিষ্কলুষ চরিত্রবান মহাপুরুষ। যে অর্থ সম্মুখে রেখেই তাঁকে বিচার করি না কেন প্রতিটি অর্থই যেন তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। এমন গুণাধিকারী মহাপুরুষ কি ধরার বুকে ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? সমাজ সংস্কার, অর্থনীতি সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, নীতিজ্ঞান সংস্কার, রাষ্ট্র সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার একসাথে কোন মনীষী করে গেছেন? সত্যপরায়ণ ও বিশ্বাসভাজন বলে কে শৈশবকালে সবার মুখ থেকেই 'আল-আমিন' উপাধি লাভ করেছিলেন? কলঙ্কের মুখে কালিমা লেপন না করে, বিশ্বাসে অটল পাহাড়ের মত অবিচল থেকে, জ্ঞান সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে কে ধরার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সংসারীরূপে, রাষ্ট্রনায়করূপে, জনহিতৈষীরূপে, মহামায়ার বাঁধনরূপে কে বিশ্বের কোলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? সমরক্ষেত্রে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে, রাজার আসনে মহাবিচারক হিসাবে, সাম্যের গায়ক হিসাবে কার সাথে তাঁর তুলনা চলে?

'আহম্মদ' ও 'মুহাম্মদ' আখ্যা কার ভাগ্যে জুটেছিল? 'জালাল' ও 'জামাল' বলে কে ধরার বুকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন? কোন্ মহাপুরুষ আল্লাহর দরবার থেকে অশ্রুর বন্যায় মানব জাতির মুক্তির পথ রচনা করেছিলেন? পাহাড়সম স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি পেয়েও কে পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করেছিলেন? **'দক্ষিণ হস্তে চন্দ্র এবং বাম হস্তে সূর্য এনে দিলেও আমার সংকল্প হতে বিচ্যুত হব না'**— এমন কঠোর বাণী কার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল? পাষাণ-চিত্তের অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হাসিমুখে কোন্ মহামানব ক্ষমার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন? সর্বজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে কার হৃদয় থেকে প্রেমের ঢেউ উথলে পড়েছিল? লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও পদদলিত, যুগ যুগের নারী সমাজকে কে মাতৃত্বের মহাসনে সমাসীন করেছিলেন? ক্ষমার আদর্শ, মহত্ত্বের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, গুরুর আদর্শ, প্রার্থনাকারীর আদর্শ, প্রশংসিতের আদর্শ, উদারতার আদর্শ, সহিষ্ণুতার আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, সর্বজাতির আদর্শ এই হায়াতুন্নবী— মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)— যিনি অমর, অক্ষয়, অপরাজেয়, অতুলনীয়। সুন্দর হতে তিনি অতিসুন্দর। উন্নত হতে তিনি মহাউন্নত, উৎকৃষ্ট হতে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট। তাই তাঁকে 'উসওয়াতুন হাসানা' বলা হয়েছে। এ বাণীর মধ্যে কোন ফাঁক নেই। এ বাণীর কোন অপব্যাখ্যা চলে না। এ বাণীতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশ্বের সেরা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সত্যই সর্বোত্তম আদর্শ—সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দেয় :—

"কিন্তু সে সত্যসহ আগমন করিয়াছে এবং প্রেরিত পুরুষগণের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছে।"[১] (৩৭ : ৩৭)

ন্যায়-নীতি এবং সত্যের পথে এক প্রদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এ বিশ্ব আলোকিত করেছিলেন। যে ধর্মের প্রতি তিনি মানব জাতিকে আকৃষ্ট করেছিলেন তা শাশ্বত সত্যের বিশুদ্ধ ধর্ম যা আল্লাহর মনোনীত। পূর্বের প্রেরিত নবীগণ এ ধর্মের প্রতিই তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ সব মহাপুরুষদের আবির্ভাব এবং তিরোধান কোন কল্পিত কাহিনী নয়। এর সত্যতা প্রতিপাদন করতেই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। প্রতিটি নবী ইসলামের

টীকা—১। কোরআন—সূরা সাফফাত—আয়াত ৩৭। সূরা জোমর—আয়াত ১১ ও ১২।

বাণী নিয়েই এসেছিলেন এবং মুসলমানরূপেই জন্মলাভ করেছিলেন অথচ হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) কেন সর্বপ্রথম মুসলমান বলা হয় এ কথা প্রতিটি মানুষের মনেই দোলা দেবার কথা। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সৃষ্টিই হয়েছে সর্বপ্রথম। তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়েছে এ মহাসৃষ্টির উদ্ভব। তাই তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। কোরআন এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

"তুমি বল—নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে তাঁহার ধর্মের জন্য বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহর উপাসনা করি। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে—**আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান।**"[২] (৩৯ : ১১ - ১২)

উপর্যুক্ত বাণী এ কথাই প্রমাণ করে যে হযরত মুহাম্মদই (দঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক তাঁর উপাসনার আদর্শ যুগ যুগের উপাসকদের মনে দেবে প্রেরণা ও অফুরন্ত শান্তি। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও প্রার্থনার নিদর্শন রেখে গেছেন তার নজির মেলে না। তাঁর নিষ্কলুষ চিত্তে বিশুদ্ধ উপাসনা আল্লাহর আরশ থেকে এনেছিল এক অপার শান্তি— যে শান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব মানবের ঘরে ঘরে। সত্যের বাহক, মহাসত্যের বাণী কণ্ঠে নিয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য যে পথ দেখিয়েছেন তা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণস্বরূপ। এমন উপহার পূর্বে কেউ দিতে পারে নি। কোরআন এ কথারও সাক্ষ্য দিয়ে হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে।

"নিশ্চয় আমি মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের প্রতি সত্যসহ এই গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি; অতঃপর যে সুপথ গ্রহণ করিবে ফলতঃ সে নিজের জন্য করিবে। এবং যে বিভ্রান্ত হইবে বস্তুতঃ সে নিজেরই জন্য ব্যতিত পথভ্রান্ত হইবে না; এবং তুমি তাহাদের প্রতিভু নহ।"[১] (৩৯ : ৪১)

অবিশ্বাসীদের নিকট আল্লাহর যেমন অস্তিত্ব নেই তেমনি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী কোরআন এবং আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাদের পথ বক্র। আল্লাহ্ স্পষ্টাক্ষরে তাদেরকে পথভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদও (দঃ) তাদের প্রতিভূ নহেন বলে ঘোষণা করেছেন।

মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উপর ঐশী জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ জ্যোতিঃ সঞ্জীবনী শক্তির ন্যায় শিরায় উপশিরায় এক তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করে। মনের উপর ক্রিয়া সম্পাদনকারী ও আরোগ্যকারী এমন শক্তিশালী জ্যোতিঃ ইতিপূর্বে মানব সম্প্রদায়ের জন্য প্রদান করা হয় নি। ঐশী জ্যোতিঃ আল্লাহর কোরআন—যার গুরুত্ব ও তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করবার শক্তিও দেওয়া হয়েছিল অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন হযরত মুহাম্মদকেই (দঃ)। ইতিপূর্বে কোন মানব বা ফেরেশতা এ শক্তি লাভের অধিকারী হন নি। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী হতে তা বুঝা যায়।

"এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি স্বীয় আদেশে সঞ্জীবনী শক্তি প্রত্যাদেশ করিয়াছি; তুমি কি জান যে গ্রন্থ অথবা বিশ্বাস কি? কিন্তু আমি উহাকে জ্যোতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি— তদ্বারা আমি স্বীয় সেবকগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি; এবং নিশ্চয় তুমিও সরলপথে পথ প্রদর্শন কর।"[২]

যে পথে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পা দিয়েছিলেন যে পথ সুন্দর, সহজ ও অনাবিল শান্তির

টীকা—২। কোরআন—সূরা সাফফাত—আয়াত ৩৭। সূরা জোমর—আয়াত ১১ ও ১২।
টীকা—১। কোরআন। আয়াত ৪১।
টীকা—২। কোরআন সূরা শূরা। আয়াত ৫২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পথ। সে পথ জ্ঞানালোকের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে পথ সুরম্য প্রাসাদের ঝকঝকে কারুকার্যখচিত সৌন্দর্যময় বিলাসের পথ। সে পথে কাঁটা নেই, সে পথে পূতি গন্ধ নেই, সে পথে নির্যাতিত ও ব্যথিতের কান্নার ধ্বনি নেই। আছে বিশ্বাসীর আত্মপ্রসাদের নর্তকী, আছে নয়নতৃপ্তিকর ভোগবিলাসের সামগ্রী, আছে হৃদয় মাতান সুরলহরির ঝংকার। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে এ পথে তুলে দিয়ে তাই বলেছেন :

"অতঃপর তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর রহিয়াছ।"[১] (৪৩ : ৪৩)

যুগ যুগের অন্ধবিশ্বাসী, পৌত্তলিকতাবাদ ও অংশীবাদিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে মহাপুরুষ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বুকে শান্তি স্থাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন—কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। কেননা আল্লাহ-পাক বিশেষভাবে 'মুহাম্মদ' (দঃ)-এর মত বিশ্বাসী মহাপুরুষের অনুগামী ও সৎকর্মশীল হতেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যারা তাঁর নির্দেশিত পথের অনুসারী হবে, নিঃসন্দেহেই তারা মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত হবে এবং বিশ্বের বুকে মান-মর্যাদায় সমুন্নত হবে। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে :

"এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকার্য করে এবং 'মুহাম্মদের' প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকে, এবং উহা তাহাদের প্রতিপালকের সত্য; তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপকৃষ্টতা সমূহ বিলুপ্ত করিবেন এবং তাহাদিগের ব্যবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন।"[২] (৪৭ : ২)

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; এবং তাঁহার সঙ্গে যাহারা আছে তাহারা অবিশ্বাসের জন্য কঠোরতর—নিজেদের মধ্যে সকরুণ; তুমি তাহাদিগকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনার রুকু-সেজদা করিতে দেখিবে।"[৩] (৪৮ : ২৯)

হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে প্রমাণ করতে আমাকে কোন মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে না। ইচ্ছা মাফিক শব্দের সংযোজনা করে তাঁর মহত্ত্বের বিকাশ করতে হচ্ছে না। তাঁর অনুগৃহীত ভক্তবৃন্দের বিবরণী দিয়ে পৃষ্ঠা ভরে তুলতে হচ্ছে না। আল্লাহর প্রত্যক্ষবাণীর উপর নির্ভর করেই আমি এ মহামানবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে হাত দিয়েছি। আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর অনুগ্রহভাণ্ডার এ মহাপুরুষের মাধ্যমেই অর্পিত হয়েছে। এ মহাবিজয়ীর ললাটে স্পষ্ট বিজয়ের ছাপ দিয়েই আল্লাহ তাঁকে এ মহাজগতের অধিকারী করে দিয়েছেন। এ মহাজ্ঞানীর অন্তরে এক মহাশক্তি নিক্ষেপ করেই তাঁকে শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহর মহাবাণী ধরে দেখুন আমার কথাগুলোর সার্থকতা আছে কিনা :

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয়ে বিজয় দান করিয়াছি। যেন আল্লাহ তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অপরাধসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেন, এবং তোমাকে সুপথে পথ প্রদর্শন করেন এবং যে আল্লাহ তোমাকে শক্তিশালী সাহায্যে সাহায্য দান করেন।"[১] (৪৮ : ১-৩)

অলিক উপাস্যের মাথায় কুঠারাঘাত করে, উপাসকের চিত্তে নতুন চেতনার উন্মেষ করে, এক মহাশক্তির সাক্ষ্য যিনি বহন করে চললেন তিনিই হলেন কালজয়ী হযরত মুহাম্মদ

টীকা ১। সূরা—জোখরোফ-আয়াত ৪৩।
টীকা ২। কোরআন—সূরা মুহাম্মদ আয়াত ২।
টীকা ৩। সূরা ফাৎহা। আয়াত ২৯-এর অংশ।
টীকা ১। সূরা ফাৎহা—আয়াত ১-৩

(দঃ)। বিভ্রান্ত মানবজাতির বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার অবসান করে, যিনি পাপ-পুণ্যের দাঁড়িপাল্লায় ন্যায়-অন্যায়ের পথ দেখালেন তিনিই কি প্রকৃত গুরু নন? ভক্তি, বিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও পুণ্যের দরজায় পা বাড়াতে যিনি নির্দেশ দিলেন তিনিই কি প্রকৃত সুসংবাদ-দাতা নন? এ সাক্ষ্য আমাদের দিবার প্রয়োজন নেই। দেখুন কোরআন কি সাক্ষ্য দেয় :

'নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি।'[২] (৪৮ : ৮)

"এবং যে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, ফলতঃ নিশ্চয় আমি সেই অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"[৩] (৪৮ : ১৩)

অবিশ্বাস করে বাঁচবার কোন উপায় নেই। কু-যুক্তির অবতারণা করে হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাঘাত করবার কোন পন্থা নেই। ধর্মদ্রোহিতার আশ্রয় নিয়ে পরকাল ঝরঝরে করবার কোন বুদ্ধি নেই। ধর্মনীতির অবতার, সম্রাট-কুল-শিরোমণি, সমাজহিতৈষণার মহাবিষ্কারক, কলুষ-কালিমা ও দুর্নীতির দুষমন এই মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যার পাক নাম আল্লাহর আরশের শোভা বর্ধন করছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের তপ্ত রবি যখন ধরার বুক পুড়ে নিঃশেষ করে দেবার পরিকল্পনা আঁটে, ঠিক তখনি আষাঢ়-শ্রাবণের বারিধারা তাকে সুশীতল করে প্রাণবন্ত করে দেয়। পৌষ-মাঘের কঠোর শীত যখন সৃষ্ট জীবকে হিম-সাগরের কঠিন উপাদানে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পায়, ঠিক তখনি ফাল্গুনের সমীরণ হেলিয়া দুলিয়া সুপ্ত প্রাণকে সজীব ও সরস করে তোলে।

প্রাণহীন, স্পন্দনহীন বিশ্ব যখন ডুবুডুবু, জীন-ইনসান যখন আত্মকলহে লিপ্ত, শাসিত যখন শাসকের বাণে অস্থির, শান্ত নারীজাতি যখন উগ্র নরের ছোবলে মৃতপ্রায়, প্রেমিক যখন উদভ্রান্তের হাতে উঠে পড়ে মার খায়, ঠিক তখনই নির্মম, অত্যাচারী ও পাষণ্ড সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করতে মেঘের বজ্র হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। কণ্ঠে তাঁর কঠোর বাণী :

"এবং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য স্থির করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।"[১] (৫১ : ৫০)

এ মহাপুরুষ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করেন নি। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছেই বশ্যতা স্বীকার করেন নি। সদাচার, সুবিচার, সত্যধর্ম ও সৎ-চিন্তাই ছিল তাঁর মহান ব্রত। এ শিক্ষা দিতে তিনি যেমন হয়েছিলেন কঠোর, তেমনি হয়েছিলেন বিনয়ী, ভদ্র, অমায়িক ও শান্ত। যেমন ছিলেন তিনি সুবিচারক, তেমনি ছিলেন সুশাসক ও সুনীতিপরায়ণ। যুগ যুগের অন্ধকারকে যেমন করেছিলেন দূরীভূত তেমনি যুগান্তরের আলোক-মশাল নিয়েও জ্বালিয়েছিলেন মহালোক। কোরআন কি এ সাক্ষ্য দেয় না?

'নিশ্চয় আমি আমার রাসুলকে প্রকাশ্য প্রমাণাবলীসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাঁদের সহিত গ্রন্থ ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি— যেন মানবগণ ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করে।"[২] (৫৭ : ২৫)

পরম জ্ঞানী, চরম মানী ও মনের ধনী ব্যক্তিরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও বিশ্বাস করে। নিজের আত্মাকে যারা কলুষমুক্ত করতে চায়, পরকালের চিরন্তন সত্য

টীকা ২। সূরা ফাৎহা—আয়াত ৮।
টীকা ৩। সূরা ফাৎহা—আয়াত ১৩।
টীকা ১। কোরআন সূরা জারিয়াত—আয়াত ৫০।
টীকা ২। সূরা হামিদ—আয়াত ২৫-এর প্রথমাংশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেহেশতের যারা অভিলাষী, হিংসা, বিদ্বেষ দূরে ঠেলে যারা মুহাম্মদের প্রেমে পাগল, তাদের কাছে আল্লাহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কি দিয়ে তাদের অভয় দেবেন, কি দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেবেন, কি দিয়ে তাদের সমুজ্জ্বল করবেন, দেখুন :—

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তদীয় রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে দ্বিগুণিত অংশ অর্পণ করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য এরূপ জ্যোতিঃ সৃষ্টি করবেন—যদ্বারা তোমরা পথ অতিক্রম করিবে এবং তিনি তোমাদিগকে মার্জনা করিবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১]

(৫৭ : ২৮)

এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় আল্লাহ কোথাও কোন জাতির প্রতি এরূপ আহ্বান জানিয়েছেন বলে আমি জানি না। যদি কোন দেবতা, কোন মহাপুরুষ বা কোন নবীর প্রতি এরূপ বাণী উচ্চারিত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এমন প্রমাণ আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে দিয়ে থাকেন তবে আমি সানন্দেই সে পুরুষকে জগৎশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেব এবং তার আদর্শের অনুকরণ করে মহাকালের বিচারে দ্বিগুণভাবে পুরস্কৃত হবার আশায় দিন গুনব। যতক্ষণ পর্যন্ত এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাণী কেউ দেখাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) জগদ্‌গুরু বলেই স্বীকার করব এবং দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকেই স্বীকার করতে অনুরোধ করব। কেননা অসীম ক্ষমতার অধিকারী এ মহাপুরুষ। মহাসম্মানে তিনি সম্মানিত—মহাপরীক্ষায় পরীক্ষিত। যারা তাঁকে ভুল বুঝবে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ-পাক তাঁর বিশাল ক্ষমতার যেমন পরিচয় দিয়েছেন তেমনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন—এ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অশেষ গুণাবলীর। কালজয়ী, অমর, অক্ষয়, অপরাজেয়—বিধাতার এ প্রেমিক সৃষ্টি। তাঁকে ভিন্ন কে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারবে? দেখুন :—

"নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা অবশ্যই অধঃপতিত হইবে। আল্লাহ ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে—নিশ্চয় আমি ও আমার রাসুল (হযরত মুহাম্মদ) পরাক্রান্ত হইবে।"[২]

আল্লাহ তাঁর পাশাপাশি যে মহামানবকে রেখে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন কার সাধ্য তাঁকে অতিক্রম করে নিজেকে ক্ষমতাশালী বলে আখ্যায়িত করে? যারা অহেতুক এ প্রচেষ্টায় রাতদিন পরিশ্রম করেন তাঁরা তাঁদের ধর্মগুরুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যে কি জবাব মেলে। জবাব দেবার কোন উপায় নেই। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ তাপস, মহাগৌরব নিয়ে ও মহাসৌন্দর্যশালী হয়েই তাঁর অদ্ভুত গুণের বিকাশ করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এ মহাপুরুষের আগমন বার্তা বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে 'আহম্মদ' নামে ভূষিত করেছেন। দেখুন এ কথা সত্য কি না:—

"এবং যখন মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলিয়াছেন, হে ইসরাইল বংশধরগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল-আমার পূর্বে 'তওরাত' হইতে যাহা আছে আমি তাহার সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং আমার পরে 'আহম্মদ' নামে যে রাসুল আগমন করিবেন আমি তাঁহার সুসংবাদ প্রদানকারী।"[১] (৬১ : ২)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উদার নীতি, একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতা

টীকা ১। সূরা হামিদ—আয়াত ২৮।
টীকা ২। কোরআন—সূরা মোজাম্মেল। আয়াত ২৩ ও ২১।
টীকা ১। কোরআন-সূরা ছাফফ। আয়াত-৬।

যুগ যুগের মনীষীদের কাছে আদরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। অংশীবাদীরা ও হিংসাবাদীরা সাময়িকভাবে তাঁর এ মহান নীতি অনুসরণ না করলেও এমন দিন আসবে যেদিন বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলামের বিজয় কেতন উড়বে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী প্রত্যেকেই প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে এ পবিত্র ধর্মকে আঁকড়িয়ে ধরবে। মনের জোরেই শুধু এ কথা বলছি না, অবিশ্বাসীদের চেতনা ও ধ্যান-ধারণার পরিসমাপ্তির জন্য শুধু আমি লিখছি না, ইসলামের গৌরবমাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের বিকাশ সাধনেই শুধু আমি কলম ধরছি না,—মহান সৃষ্টিকর্তার ভবিষ্যদ্বানীকে সম্বল করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ও শঙ্কাহীন চিত্তেই এ কথা ঘোষণা করছি, কেননা, কোরআনের নিম্নোক্ত বাণীকে আমি দৃঢ়তার সাথে ভক্তিভরে বিশ্বাস করি :—

"তিনি স্বীয় রাসুলকে (হযরত মুহাম্মদকে) সুপথ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর সুপ্রকাশিত করেন এবং যদিও ইহাতে অবিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট হয়।"[২] (৬১ : ৯ এবং ৯ : ৩৩)

সকল ধর্মের উপর যদি ইসলামের স্থান হয়ে থাকে, সকল অংশীবাদীতার উর্ধ্বে যদি ইসলামের একেশ্বরবাদ স্থান না পায়, সকল ধর্মের মূলমন্ত্র নিয়ে যদি ইসলামের আবির্ভাব হয়ে থাকে, তবে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কেন সবার উপরে স্থান পাবেন না?

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ, অধর্ম, অনাচার ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন—বিভ্রান্ত মানব জাতিকে সুপথে পরিচালিত করতেই হয়েছিল এ মহামানবের আবির্ভাব। ন্যায়ের বদলে অন্যায়, ধর্মের নামে অধর্ম, বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস করে যারা পশুর মত জীবন যাপন করছিল, তাদের প্রাণে মধু সিঞ্চন করে যিনি সুসমাজ গঠন করলেন তিনিই কি প্রকৃত মুক্তিদাতা নন? কালের সাক্ষ্য বহন করে, আরশের সুসংবাদ নিয়ে, মুক্তির পথে যিনি শক্তি নিয়োগ করলেন তিনি কি প্রকৃত পথপ্রদর্শক নন? সুপ্ত, ঘুমন্ত, নির্জীব বস্তুর অভ্যন্তরভাগে যিনি ব্যাকুলতা, সজীবতা, জাগ্রতার লক্ষণ দেখতে পেলেন তিনি কি মহা আবিষ্কারক, মহাজ্ঞানী নন? দেখুন আল্লাহ কি সাক্ষ্য দিয়ে এ বিজ্ঞানীর আগমনবার্তা দিয়েছেন :—

"তিনি তাহাদের অন্তর্গত নিরক্ষরগণের মধ্য হইতে এক রাসুল সমুদ্ভব করিয়াছেন—যে তাহাদের সমক্ষে তাঁহার নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাহাদিগকে নির্মল করে এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করে; এবং নিশ্চয় ইহার পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"[১] (৬২ :২)

উপর্যুক্ত বাণী এ কথাই প্রমাণ করে যে হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র মানবজাতি অজ্ঞানতার পঙ্কিল সলিলে হাবু-ডুবু খাচ্ছিল। মুক্তির কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। নিজেরা নিজেদের ধর্মকে তামাসা ও অবাস্তব মনে করে খেয়াল-খুশি মাফিক বাসনা চরিতার্থ করছিল। প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে যে তারা ছিল এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কেননা আমাদের ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহন করে।

এ মহা অন্ধকারের মাঝে আলোক জ্বালাতে, মহা অজ্ঞতার মাঝে শিক্ষার বীজ বপন করতে, মহা কুসংস্কারের মাথায় কুঠারাঘাত করতে আল্লাহ যাঁকে পাঠালেন তিনি ছিলেন বিপ্লবী বীর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। সুমহান চরিত্রের উপর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। কঠোরতা ও কোমলতা ছিল সে চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ উদীয়মান ভাস্করের তেজ ছিল প্রখর, গুণ ছিল অসাধারণ আর ক্ষমতা ছিল অসীম। পানিকে ফুটন্ত বাষ্পে পরিণত করবার পদ্ধতি যেমন

টীকা ২। সূরা তওবা—আয়াত ৩৩। এবং সূরা ছাফফ—আয়াত-৯।
টীকা ১। কোরআন—সূরা জোময়া। আয়াত ২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর জানা ছিল, তেমনি জানা ছিল ফুটন্ত পাগলা বাষ্পকে বরফে রূপান্তরিত করবার। নির্বাকের মুখে বাক ফুটাবার কৌশল যেমন তাঁর জানা ছিল, তেমনি জানা ছিল বাক্যবাগীশকে নির্বাক করে তাপসের আসনে বসিয়ে দেবার। সুশীতল মেঘের বুকে তাপ বিকিরণ করে ভেঙ্গে দেবার যেমন শক্তি তাঁর ছিল, তেমনি ছিল মহাসাগরের বুক চিরে পানির পরমাণু মহাশূন্যে ধরে রাখার। মেঘনাদের ন্যায় আড়াল থেকে যুদ্ধ করে বীর যোদ্ধা সাজেন নি, কলীর আসনে বসে মহাকালকেও মহাশ্মশানে পরিণত করেন নি। তৈমুর, নাদির, চেঙ্গিশ ও হিটলারের তরবারি ধরেও রক্তাক্ত বিপ্লব আনেন নি। এ সব উন্মাদনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। এসব তাণ্ডবলীলাও তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয় নি। কোরআন তাই বলেছে :

"নূন— সাক্ষী ঐ লেখনি এবং যাহা লিপিবদ্ধ করে। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ। এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য অকর্তিত প্রতিপাদন রহিয়াছে। **এবং নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।**[২] (৬৮ : ১-৪)

আল্লাহ যেখানে সাক্ষ্য দান করেন সেখানে কার সাধ্য হযরতের উক্তিকে প্রলাপোক্তি বলে, সদাচারকে কদাচার বলে, সত্যধর্মকে অসত্য বলে? কে বিপথগামী, কে উন্মাদ, কে অস্থির-মস্তিষ্ক, অসত্যপরায়ণ ও বিভ্রান্ত আল্লাহ তাঁর বাণীতে পরিষ্কার করে দিয়েছেন :

"অনন্তর অচিরেই তুমি প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহারাও প্রত্যক্ষ করিবে যে, তোমাদের মধ্যে কে উদভ্রান্ত? নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরিজ্ঞাত আছেন যে কে তাঁহার সুপথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনিই সুপথগামীদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। অতঃপর তুমি অসত্যবাদীদের অন্তর্গত হইও না।"[১] (৬৮ : ৫-৮)

বিশ্বের গৌরব, মানবজাতির গৌরব, আরশের গৌরব ও সৃষ্ট জীবের গৌরব এ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যিনি মহাসম্মানে সম্মানিত, মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত ও মহামহিমায় মহিমান্বিত। আল্লাহ যাকে অবশ্যম্ভাবী সত্যবাক্য কণ্ঠে দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাকে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন করেছেন, কার সাধ্য তাঁকে গণক, উন্মাদ বা কবি আখ্যা দিয়ে অহেতুক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন? এসব অবিশ্বাসী কল্পনাবাদীদের যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়েছে কোরআন :

"নিশ্চয় ইহা সম্মানিত রাসুলের বাক্য; এবং ইহা কোন কবির কথা নহে; তোমরা অত্যল্পই বিশ্বাস করিতেছ। এবং ইহা কোন গণকের কথাও নহে; তোমরা অত্যল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছ।"[২] (৬৯ : ৪০-৪২)

"নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত প্রেরিতের বাণী। যে শক্তিশালী আরশ-অধিপতির সমক্ষে মর্যাদাসম্পন্ন। আজ্ঞানুবর্তী, অধিকন্তু বিশ্বাসভাজন। এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নহে। এবং নিশ্চয়ই সে তাহাকে উন্মুক্ত গগণপ্রান্তে অবলোকন করিয়াছিল। এবং সে অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নহে। এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। অতঃপর তোমরা কোথায় যাইতেছ?"[৩] (৮১ : ১৯-২৬)

সূরা তকভীরের বর্ণিত কয়েকটি বাণী হতে আমরা আরও কিছু মূল্যবান তত্ত্ব পাচ্ছি। হযরতের অসাধারণ কৃতিত্ব, গৌরব, মহানুভবতা, পাণ্ডিত্য ও দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ের উপর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি এবং কোরআন-হাদিসের বাণী থেকে প্রমাণ করেছি। যার মনে

টীকা ২। কোরআন—সূরা কলম—আয়াত ১-৪।
টীকা—১। সূরা কলম-আয়াত ৫-৮।
টীকা—২। কোরআন-সূরা হাক্কা-আয়াত ৪০-৪২।
টীকা—৩। ঐ-তকভীর-আয়াত-১৯-২৬।

যতটুকু সন্দেহ ছিল হয়ত ততটুকু আর নেই। ইতিপূর্বে হযরতকে তাঁরা যে চোখে দেখেছেন এখন হয়ত তাঁরা সে চোখে আর দেখবেন না। শ্রদ্ধার চোখে মাথা নত করে সবাই আমরা কাঁদব এ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করতে ও তাঁরই আশ্রয় লাভ করে ধন্য হতে। তবুও যদি কেউ নিতান্ত হিংসার বশে অথবা নিজস্ব ধর্মের খাতিরে এ মহাপুরুষকে 'জগদ্‌গুরু' বলে মানতে অস্বিকার করেন তবে কোরআন, বাইবেল, গীতা, দীঘা নিকায়া বেদ, পুরাণ; উপনিষদ প্রভৃতি যে কোন ধর্মগ্রন্থ হতে যে কোন ধর্মপ্রণেতার সম্বন্ধে এমন একটি মাত্র চ্যালেঞ্জের বাণী উথাপন করুন যেমন করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে।

"আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ উন্মোচন করি নাই? আমি তোমা হইতে তোমার সেই ভার অপসারণ করিয়াছি; যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করিতেছিল। এবং আমি তোমার জন্য তোমার আলোচনা মহিমান্বিত করিয়াছি।"[১] (৯৪ : ১-৪)

বিশ্ব মনীষীদের জীবনচরিত নিয়ে যুগে যুগে গ্রন্থমালা রচিত হয়েছে। অদ্ভুত গুণাবলীরও বিকাশ সাধন করা হয়েছে কিন্তু কোথাও কারো জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিয়ে বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে এমন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয় নি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বক্ষঃচ্ছেদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে কোন মহাপুরুষের জীবনেই দেখা যায় নি। এ ঘটনা নিছক কোন ঘটনা নয়। কল্পনাপ্রসূত কোন অবাস্তব কাহিনী নয়। মুখরোচক কোন গল্পও নয়। এ ঘটনা প্রকৃত ঘটনা। এ ঘটনা হযরতের জীবনের বাস্তব ঘটনা।

ভ্রান্ত, অবিশ্বাসী অলীক উপাসকদের জ্ঞান-চক্ষু এবারে উন্মীলিত হবে বলে আশা করি। কোরআনে পুনঃ পুনঃ এরূপ অকাট্য প্রমাণ কোন মহাপুরুষের জন্যই দেওয়া হয় নি। বিশ্বাসী ও আজ্ঞানুবর্তী বলে আরশ অধিপতি মহান আল্লার কাছে যিনি অধিকতর প্রিয় তাঁর মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। উন্মুক্ত গগনপ্রান্তে যে মহাপুরুষ জিবরাইলের (আঃ) সান্নিধ্যে অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান-ভাণ্ডার লাভ করেছিলেন যার সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের প্রত্যেকটি বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল, যাকে আকাশ এবং পাতালের তত্ত্বজ্ঞান অবগত করান হয়েছিল তাঁকে যারা উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করে সাময়িক তৃপ্তি লাভ করতে চায় তারাই কি প্রকৃত উন্মাদ নয়?

আকাশ-বাতাস যার ধ্বনিতে মুখরিত, মরুর দিক-দিগন্ত যার বাণীতে প্রসারিত, সাগর-মহাসাগর যার তৌহিদ মন্ত্রে কল্লোলিত, সে মহাপুরুষ সর্বযুগের, সর্বশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী দ্বারাই স্বীকৃত ও সমাদৃত। অপার আনন্দ, অনন্ত কল্যাণ, অসীম সম্পদ, চিরশান্তি ও পরম তৃপ্তির সে বেহেশতের 'আবে কওসর' তাঁরই ভাগ্যে নির্ধারিত, অন্য কারো ভাগ্যে নয়। সর্বশেষে কোরআনও এ কথাই ঘোষণা করে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল—

"নিশ্চয় আমি তোমাকে 'কওসর' দান করিয়াছি। অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কোরবানী কর। নিশ্চয় যে তোমাকে ঈর্ষা করে সে-ই নিঃসন্তান।"[১]

—

টীকা ১। কোরআন—সূরা এনশেরাহ। আয়াত ১ হইতে ৪।
টীকা ১। কোরআন—সূরা কাওসার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিশিষ্ট

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর গুণাগুণ বর্ণনা করে কার সাধ্য? তাঁর স্বরূপ বিকাশ করে তাঁর মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলে কার সাহস? জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ যে নামে পাগল, বিশ্বের অগণিত সৃষ্টি জীব যাঁর সেবায় ধন্য, সে মহামানব কে? তাঁর পরিচয় তুলে ধরার ক্ষমতা আমার কলমে নেই। অসীমের সন্ধানে অভিযান করে যেমন সীমার কোন চিহ্ন মেলে না, মহাসাগরের অতল তলে ডুব দিয়ে ডুবুরী যেমন নিরাশ হয়, তেমনি নিরাশ হয়েই ফিরে এলাম আমার এ জীর্ণ কুটিরে। বোকা যেমন কিছুই না বুঝে হাসে ও কাঁদে, অন্ধ যেমন কিছুই না দেখে পাবার আশায় দুর্গম পথে পা বাড়ায়, আমিও তেমনি অপবিত্র আত্মা নিয়ে পবিত্র এক আত্মার সন্ধান করেছিলাম মরুভূমির মরীচিকায়। পারলাম না সে পবিত্র আত্মা ধরে তাঁর গুণাগুণ বিকাশ করতে। যদি কেউ ধরে থাকেন বা বুঝে থাকেন তবে তাঁর গুণ-মাহাত্ম্য আমাকে দয়া করে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে ইনশা-আল্লাহ রূপ দিতে চেষ্টা করব।

হে আল্লাহ! তুমি মাফ করো। তোমার প্রিয় বন্ধুর যদি কোন অমর্যাদা করে থাকি তবে ক্ষমা করো। জ্ঞান দিও, বুদ্ধি দিও,এ কলমে শক্তি দিও যেন সুন্দর করে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তোমাকে ও তাঁকে খুশি করতে পারি। আমিন!

— লেখক

Address :

Present :
Md. Nural Islam, B. Sc.
(T. E. & W. S)
BCS (Engg-Telecom)
Sub-Divisional Engineer
C & W Bogra
P. O. & Dt. BOGRA;
Bangladesh

Permanent :
C/O. Nazib Uddin Sirker
Vill—Marichtala
P. O. New-Sariakandi
Dist. Bogra
Bangladesh

উপহার বাণী

'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)-বইটি প্রকাশিত হবার পর জ্ঞানী-গুণী, ওলি-গাউস, ছাত্র-শিক্ষক ভাইদের তরফ থেকে যে সব প্রাণঢালা উপহার বাণী দেশ-বিদেশ হতে পেয়েছি তা এতদিন তুলে ধরি নি লজ্জায়। কেননা নিজের কোন কৃতিত্ব বা বাহাদুরী দেখাবার উদ্দেশ্যে এ কলম ধরি নি—ধরেছিলাম প্রাণের একান্ত আবেগে, উচ্ছ্বাসে অদৃশ্য শক্তির মহান নির্দেশে। ফলবতী কতটুকু হয়েছি সে বিচার পাঠকবৃন্দের ও আল্লাহ্ ও রাসুল (দঃ) প্রেম সাধকদের। এই পুণ্যাত্মা মনীষীদের বাণী কিরূপ হতে পারে, প্রেম নিদর্শনের কেমন সাক্ষ্য বহন করতে পারে, পরের তরে নিজেদের কৃতিত্বকে তুচ্ছ করে কেমন প্রেরণা দিতে পারে— সেটা দেখাতেই কয়েকটি উপহার বাণী তুলে ধরলাম—এ বাণীগুলো পরবর্তী বংশধরদের প্রেরণা যোগাবে, জগদ্‌গুরু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে ও আত্মগৌরবে শির উঁচু করবে এটাই বাসনা রাখি।

(১) ভারতের প্রখ্যাত লেখক, কবিরত্ন, সাহিত্যিক, গবেষক ও ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত জনাব আজিবুল হক, এম. এ. বি. এড্; বাঁকুড়া :—লিখেছেন :—(১৮-১০-৮২ ইং)

"জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)-৩য় মুদ্রণ পড়লাম। রুদ্ধশ্বাসে, আনন্দ-আবেগে উচ্ছাসে এক নাগাড়ে পড়ে গেলাম। কি সুন্দর! কি অপূর্ব! কি অনবদ্য আনন্দ-সুন্দর রচনাই না করেছেন আপনি। এ জন্য আপনাকে সালাম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেন শেষ করা যায় না। অত্যন্ত নিখুঁত বুনুনী, মজবুত গাঁথুনী—এ যেন স্বর্ণ-চূর্ণ, মণি-হীরা, পান্না-মতি খচিত বাণীর তাজমহল। বিশ্ব-নবী রচনার পরে যে কথা ভাবা যায় নি, যার অভাব বোধ করা যায় নি তারও যে কত পরিপূরক হতে পারে, যুগোপযোগী হতে পারে, প্রয়োজনীয় হতে পারে তা আপনার এই বইখানা না পড়ে বুঝা যায় না। আপনার এ অমর গ্রন্থখানি মুসলিম জাহানে শুধু নয়, বিশ্বজাহানের মানুষকেই উজ্জীবিত করবে, সত্যের আলোকে উচ্চকিত করবে। অন্ধকার পথে সত্যের আলো জ্বালবে ও পথ দেখাবে। এটা তাই চিরকালের পাথেয়স্বরূপ। পৃথিবীর সব ভাষাতে যদি এর অনুবাদ হতো তা হলে প্রয়োজন সিদ্ধ হতো। বিশ্বজগতেরই সারা জাহানের মানুষ তাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

(২) পশ্চিমবাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও কবিরত্ন শেখ ফজলুল হক লিখেছেন :—

জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ) প্রসঙ্গে

চিত্র বিচিত্রতায় ভরা দুনিয়া। আল্লাহ আশ্চর্যতম নিদর্শনের, সৃষ্টির লীলাভূমি। নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতার খোলা-দুয়ার। সৃষ্টির সেরা মানুষের বিবেক বুদ্ধিতে তা বারে বারে ধরা দেয়। সে যে স্রষ্টার সৃষ্টি সেরা। সমাজে যখনই দেখা দিয়েছে আঁধারের রূপ, আলোর প্লাবন এসেছে যুগে যুগে, দেশে দেশে কোন ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ সংস্কারক, মহাত্মা অবতারের রূপ ধরে পুরাতনকে ধুয়ে মুছে ধপধপে অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলতে।

আবার দুদিনের দুর্নীতিভরা ঘুণে ধরা সমাজের গ্লানি-কালিমায়-লজ্জায় আবৃত, অজ্ঞানতার ঘুম ঘোর মনে চমক মেরে জাগিয়ে দিতে, আলোকবর্তিকা হাতে নকীবের সাজে আমাদের মাঝে কখনো কখনো কোন মহান প্রাণ কবি, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী-গুণীজন আবির্ভূত হন। 'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'—পুস্তকের লেখক জনাব নূরল ইসলাম সাহেব তাঁদেরই একজন। খাতেমুন্‌নাবীন, রহমতুল্লিল আল-আমিন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে তিনি জগদ্‌গুরুর আসনে দেখাবার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে যে সব অমূল্য মণি-মুক্তা চয়ন করে পুস্তকে উপস্থাপন করেছেন তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। এই চিরসুন্দর অবিনশ্বর কীর্তির জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে প্রতি ঘরে ঘরে অভিনন্দিত হবেন। নিঃসন্দেহে তিনি এ বিষয়ে এক অভিনব নতুন দিগন্তদ্বারের আবিষ্কারক।

বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্ব প্রমাণে কোরআন-হাদিস, বেদ-পুরান, বাইবেল, বিশ্বমনীষী, ধর্মনেতা, ঐতিহাসিক, ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) প্রভৃতির বাণী, সুন্দর বাণীসমূহকে যেভাবে ছবির মত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং অভূতপূর্ব। পুস্তকেব ভূমিকায় অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রহমান আব্বাসী সাহেবের উক্তি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য— "ইহা তাঁর এক শান্তিময় সুমহান আবিষ্কার ব্যক্তি জীবনের প্রকৌশলী জনাব নুরল ইসলাম সাহেব শুধু বৈজ্ঞানিক মহাবিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চিরন্তন মহাসত্যের তিনি আবিষ্কারক।" সারা পুস্তক উদ্ধৃতি তথ্য ও তত্ত্বে দারুণ সমৃদ্ধ, সুষ্ঠু সমাবেশ ঠাঁসা-নিপুণ গাঁথুনী তবুও ভাব-ভাষার প্রাঞ্জলতায় পাহাড়ী ঝর্ণার মতই স্বচ্ছগতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুস্তকখানি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে দেশে দেশে প্রচারিত হলে মানব মনের সরল সঠিক গতির সাথে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান হবে।"

(৩) অশীতিবর্ষ বয়স্ক জ্ঞান-বৃদ্ধ তাপস, সুসাহিত্যিক, সমালোচক, ধর্মপরায়ণ ও কবিরত্ন জনাব রুস্তম আলী কর্ণপুরী (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), বগুড়া লিখেছেন :—

"প্রিয়তম বন্ধু, যে পরম শ্রদ্ধেয়া পুণ্যশ্লোকা মাতা ও ভাগ্যবান পিতা এ হেন সত্যিকারের নূরল ইসলামের (ইসলাম ধর্মের জ্যোতি বা আলো "Light of Islam") এর জন্ম দিয়েছেন—এবং যে মহান 'আল্লাহো নূরুস্-সামায়াতে ওয়াল আরদ (স্বর্গের মর্তের মহা জ্যোতিঃ বা স্বর্গীয় মহান আলোকাবর্ত, আলোক আধার 'নূরুম-মীন-নূরী"—বা "নূরুন আলা নূর"—'পূর নূর', সর্বনূরে ভরপূর আউয়ালো মা খালাকাল্লাহো নূরী—রূপে নূর মহাম্মদ সাল্লুলাআলায়হে ও সাল্লামের পবিত্র নূরে খালাক পয়দা মালাক, পয়দা চাঁদ-সূরুজ পয়দা করলেন সেই আদি নূর মুবারকের প্রতি জানাই অশেষ ও বিশেষ শ্রদ্ধা এবং নাৎ হাম্‌দ ও দরুদ সালাম। আর লাখ মুবারক সেই নূরে-ইসলামের—স্বর্গীয় মশালচী 'Light of Islam'—এই অনুজতুল্য **"নুরুল ইসলামের"** স্ব-ধর্মে স্বপ্রতিষ্ঠা 'ইল্‌মে লাদুন্নী'—জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রজ্ঞার সত্যিকারের খাদেম বা সেবাদাস এই নূর-ইসলামের। যিনি স্বকীয় গ্রন্থে নবী-নূরের সর্বদিকের প্রকাশনা চমৎকারভাবে করেছেন। খোদা তাঁহার নিরলস কর্মজীবন ও দীর্ঘায়ুদানে ব্যাপকতর সমাজ সেবার তাকৎ প্রদান করুন। স্তাবকতা নহে, সত্য কথা বলতে কি "জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)' ও বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)-এ গ্রন্থকারের জ্ঞানের প্রসারতা (Range of knowledge) গভীর পাণ্ডিত্য, নিপুণ অনুসন্ধিৎসা ও মূল্যবান চুলচেরা অতীব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণার ধারা-প্রবাহ এবং সর্বোপরি বিচারবোধ সহ মহানবীর বিশেষ চরিতাদর্শ (আখলাকুন্নবী বা সিরাত ও সূরাতের মুস্তফা (সঃ) ধর্মপ্রচার ও কর্মময় জীবনধারা এমনকি সমরপ্রান্তেও তাঁর যে ত্যাগ-তিতিক্ষার এবং মহান চরিতাদর্শ—বেদ, বাইবেল, কোরআন, পুরাণ, গীতা-ভগবৎ, ত্রিপিটক ও জরেন্দ্রিয় এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের নিরিখে যে এনালাইস্ বা বিচার বিশ্লেষন সহ কিশোর লেখক উপস্থাপিত করেছেন—**তদ্দৃষ্টে নিঃসন্দেহে তিনি ডঃ (ডক্টরেট), আল্লামা ও কাব্যনিধি এবং বিদ্যার্ণব পদবী** লাভের উপযুক্ত জ্ঞান-মনীষা সম্পন্ন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সত্তা। সমাজ ও সরকারের উচিত উপযুক্ত মূল্যায়নের দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করা, প্রেরণা দান করা। বিজ্ঞান-দর্শন কোরআন-হাদিস এবং বিশ্বধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের যে সব মূল্যবান রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি আহরণ করে গ্রন্থটিকে তিনি নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠতম হিসাবে প্রতিচিত্রিত করেছেন উহা সত্যই জাতির গর্বের বিষয়। ... ...।"

(১-১২-৮৭)

(৪) জনদরদী, নিঃস্বার্থ কর্মী, দেশপ্রেমিক ও পরহিতকাঙ্ক্ষী জনাব মুহাম্মদ হযরত আলী, বি. এ. (হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ অফিসার, মহাহিসাব রক্ষকের কার্য্যালয়, ঢাকা—২) লিখেছেন :—

"সশ্রদ্ধ সালাম নেবেন। আপনার বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) ও জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ) বই দুইখানা পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য যে তথ্যাদি আপনি উপর্যুক্ত পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন তা সত্যিই চমকপ্রদ ও আলোকবর্তিকার ন্যায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ইহকাল ও পরকালের পাথেয় হিসাবে সবাইকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে এই আশাই করি। পরম করুণাময় আল্লাহর দরগায় আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।"

(৫) জ্ঞান-তাপস, ওলি, ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব নূর মোহাম্মদ (গ্রাম—খশিরবন্দ, পোঃ—বৈরাগী বাজার, জেলা—সিলেট) লিখেছেন :—

"আপনার পবিত্র দরবারে আমার মত মানুষের পত্র দেওয়া দৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা আপনি—সেই মহাজন যাহার সুস্পষ্ট এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা প্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যে পরিপূর্ণ অমূল্য গ্রন্থ—**'জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)'**। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কোরআন, হাদিস অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অমিয়বাণী সম্বলিত এই পুস্তক যেই পড়িবে— সেই ইহার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে বিশ্বনবী (The great teacher of the world') হওয়ার এতসব প্রমাণাদি দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে—শ্রদ্ধায় তৎপ্রতি মস্তক অবনত করিবে। জাতির জন্য আপনি কত বড় কাজ করিলেন এজন্য জাতি আপনার কাছে ঋণী থাকিবে।" (৮-১১-৭৯ ইং)

ঃ সমাপ্ত ঃ